আমার পাওয়া শান্তিনিকেতন

শিশির কুমার ঘোষ

॥ প্রাপ্তিস্থান ॥
প্র কা শ নী
১৫/৭, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

Published by :
Ranjan Ghose
Sriniketan
Birbhum-731336

First Edition : October, 1962

Printed by ;
Jolly Art Press
7/1A, Justice Monmotha Mukherjee Row
Calcutta-700 009

লেখক পরিচিতি

আমাদের এই শান্তিনিকেতনে আমরা এমন কয়েক জন মানুষকে পেয়েছি— যাঁদের দেখে মনে হয়েছে : শান্তিনিকেতন আশ্রম যেন নিজের হাতে তিলে তিলে তাঁদের গড়ে তুলেছে। তাঁদের কাছ থেকে প্রাচীন শান্তিনিকেতন যে কেমন ছিল—তা স্পষ্ট করে বোঝা যায়। সে যুগের শান্তিনিকেতন তার সব কিছু নিয়ে চোখের সামনে ভেসে ওঠে। 'আমার পাওয়া শান্তিনিকেতন' গ্রন্থটির রচয়িতা শ্রীশিশির কুমার ঘোষ মহাশয় তাঁদেরই একজন।

শ্রীশিশির কুমার ঘোষ মহাশয় ১৯১৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈত্রিক নিবাস ছিল ঢাকা মানিকগঞ্জের বড়টিয়া গ্রামে। সে যুগের পূর্ব বাংলার মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে তিনি মানুষ হতে লাগলেন। তাঁর কৈশোরেই ধরা পড়েছিল যে, বিদ্যালয়ের বাঁধাধরা পড়াশুনার চেয়ে ছবি আঁকা এবং গান বাজনায় তাঁর অনুরাগ অনেক বেশি। সেই অল্প বয়সেই তাঁর মন খুঁজে বেড়াচ্ছিল—এমন একটি জায়গা—যেখানে তিনি অবাধে মনের আনন্দে ছবি আঁকবার আর মুক্তকণ্ঠে গান গাইতে গাইতে নিজেকে হারিয়ে ফেলবার অনুকূল পরিবেশ পাবেন। অবশেষে অন্তর্যামী যেন অলক্ষ্যে থেকে তাঁর এই ঐকান্তিক ইচ্ছাটি পূরণ করলেন। ১৯৩১ সালে তিনি শান্তিনিকেতনে এসে কলাভবনে তাঁর ছাত্রজীবন শুরু করলেন। পরম আনন্দের সঙ্গে তাঁর শিক্ষা চলতে লাগল। এখানকার উদার প্রকৃতি আর এখানকার মানুষের আন্তরিকতা তাঁর হৃদয়কে একেবারে কেড়ে নিল। অভিভূত হয়ে তিনি আশ্রম, আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথ এবং শিল্পাচার্য নন্দলালের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিবেদন করে দিলেন। পাঁচ বছর পর ১৯৩৬ সালে কলাভবনের শিক্ষা শেষ হল। এবার তো সব মায়া কাটিয়ে আশ্রম ছেড়ে চলে যেতে হবে। এ বড়ো নিষ্ঠুর বিধান। ছেড়ে যেতে মন না চাইলেও যাবার জন্য প্রস্তুতি চালাতে হচ্ছিল। এমন সময়ে এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটল। গুরুদেব একদিন স্বয়ং তাঁকে নিজের কাছে ডাকিয়ে এনে সঙ্গীতভবনে ভর্তি হয়ে তাঁর গান শিখতে নির্দেশ দিলেন। গুরুদেব স্বেচ্ছায় তাঁর নিজের ব্যক্তিগত স্কলারশিপের টাকা মঞ্জুর করে তাঁকে এই কাজে উৎসাহিত করলেন। এইভাবে ১৯৩৬ সাল থেকে তিন বছর তিনি সঙ্গীতভবনে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষা করলেন। এরপর গুরুদেবের অনুমোদনক্রমে তিনি শ্রীনিকেতন শিক্ষাসত্রে চারুশিল্প এবং সঙ্গীতের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হলেন। এর বছর ছয় পর বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তিনি বিনয় ভবন শিক্ষক শিক্ষণ বিভাগে অধ্যাপকের কাজে যোগদান করলেন। সেখানে দীর্ঘ আটাশ বছর একটানা কাজ করার পর ১৯৬৩ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

শ্রীশিশির কুমার ঘোষ মহাশয়কে খুব কাছ থেকে আমি দেখবার সুযোগ পেয়েছি। তাঁকে যতই দেখছি ততই প্রাচীন শান্তিনিকেতনের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি তাঁর গুরু নন্দলালের স্নেহধন্য ছাত্র এবং একজন সত্যিকারের শিল্প-সাধক। সঙ্গীত এবং অভিনয়ে তিনি প্রবীণ আশ্রমবাসিগণের কাছে আজও প্রবাদপুরুষ হয়ে আছেন।

শিক্ষকতা ছিল তাঁর কাছে একটি পবিত্র ব্রত—তপস্যার অন্য নাম। তিনি পরম নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর ব্রতটি পালন করেছেন। আজও তাঁর অগণিত গুণমুগ্ধ ছাত্রছাত্রী যেভাবে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁকে স্মরণ করেন—তা দেখে আমরা মুগ্ধ—অভিভূত।

শ্রীশিশির কুমার ঘোষ মহাশয়ের লেখা 'আমার পাওয়া শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে আমরা হারিয়ে যাওয়া শান্তিনিকেতনের বহু স্মরণীয় ঘটনা প্রত্যক্ষ করব। বাইরের সব কিছুর অন্তরালে শান্তিনিকেতনের যে একটি পরম রমণীয় রূপ আছে—আমরা সেটি দেখবার সুযোগ পাব।

বিনীত
শ্রীব্রজগোপাল গোস্বামী

ভূমিকা

শ্রীশিশির কুমার ঘোষ ১৯৩১ সনে বিশ্বভারতীর কলাভবনের ছাত্ররূপে যখন যোগ দেন, তখন কলাভবনের সঙ্গে সঙ্গীত বিভাগের আন্তরিক যোগাযোগ ছিল, শিল্পাচার্য নন্দলাল ও সুরেন্দ্রনাথ করের ঐকান্তিক আগ্রহে। উভয়েই পূজনীয় গুরুদেবের সঙ্গীত, নৃত্য ও নাটকের অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। সে যুগের বিশ্বভারতীর যাবতীয় সঙ্গীতানুষ্ঠান, নৃত্যানুষ্ঠান, নাটকের অভিনয় এবং নানাবিধ অন্যান্য অনুষ্ঠানের সঙ্গে তাঁরা নিজেরা যেমন ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকতেন, তেমনি কলাভবনের ছাত্রছাত্রী এবং অধ্যাপকদেরও ঐসব আনন্দানুষ্ঠানে যুক্ত হবার জন্য উৎসাহিত করতেন। এই কারণে দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি আন্তরিক যোগ স্থাপিত হয়েছিল। আমরা কলাভবনকে যেমন স্বতন্ত্র ভবন হিসেবে দেখতাম না, তেমনি কলাভবনও আমাদের মনে করত আমরা যেন সেই ভবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তারই জন্যে গান, নাচ, বাজনা ও অভিনয়প্রেমী কলাভবনের বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপক প্রবল উৎসাহে সঙ্গীতভবনের সহযোগিতায় সব কিছুরই শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পেত। শ্রীশিশির কুমার ঘোষ বিশ্বভারতীর নানাবিধ কলাচর্চার এরূপ এক প্রাণবান পরিবেশের কল্যাণে এখানে কলাভবনের চারুকলার ও কারুকলার চর্চার সময়ে সঙ্গীত ভবনের গীতবাদ্য ও অভিনয়ের চর্চার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন এবং এদিকেও তাঁর দক্ষতার পরিচয় তিনি দেন। সেই কারণে শিশির কুমারের কলাভবনের শিক্ষা শেষ হলে পর সঙ্গীতভবনের শিক্ষার জন্য শিল্পাচার্য নন্দলাল ও সুরেন্দ্রনাথ করের আগ্রহে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ গুরুদেবের সম্মতিক্রমে সঙ্গীতভবনের বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র হিসেবে তাঁকে ভর্তি করে নেন। কিছুকাল পরে তিনি স্থায়ী শিক্ষকরূপে ঐ ভবনের সঙ্গে যুক্ত হন এবং সঙ্গীতভবন কর্তৃক পরিচালিত যাবতীয় আনন্দানুষ্ঠানে তাঁকে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে হয়েছে। শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের সঙ্গে একটানা বহু বৎসর কার্যে যুক্ত থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মেশা তাঁর জীবনের যে চিত্র শিশিরকুমার তাঁর স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন তা মনোযোগ সহকারে পড়লাম। গ্রন্থটি পড়ে আমার এই বৃদ্ধ বয়সে ভুলে যাওয়া অনেক কথাই আজ আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সেদিনের শান্তিনিকেতনের আনন্দ ও বেদনাময় মেশা জীবনের নানাচিত্র তিনি সরল সহজভাবে প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছেন।

নিবেদন

দীর্ঘ আটাশ বছর বিশ্বভারতীর শিক্ষক শিক্ষণ বিভাগ বিনয়ভবনে কাজ করার সময় বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে বসে পুরানো শান্তিনিকেতনের কত গল্প উচ্ছাসভরে করতাম অবসর সময়ে। কত কত বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা, গুরুদেব, মাস্টারমশাই নন্দলাল এবং অন্যান্য গুরুদের সম্বন্ধে, কত সব উৎসব অনুষ্ঠান ইত্যাদির সমারোহে আশ্রমের প্রাণচঞ্চল রূপ ইত্যাদির গল্প, যার শেষ নেই। তন্ময় হয়ে অতি আগ্রহভরে ছাত্রছাত্রীরা শুনত সেই সব গল্প প্রতি বছর। তাদের মধ্যে অনেকেই শান্তিনিকেতনের স্মৃতিকথা লেখার জন্য বলত অতি উৎসাহে। তাদেরই আগ্রহ ও উৎসাহের ফল হিসেবে স্মৃতিকথা 'আমার পাওয়া শান্তিনিকেতন'। ছাত্রছাত্রীদের আন্তরিক ইচ্ছাই আমাকে প্রধানত উৎসাহিত করেছে। তাদের সকলকেই স্মরণ করি। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে অনেক ছাত্র বা ছাত্রীর সাহায্য ছাড়া এই বই প্রকাশ করা সম্ভবই ছিল না। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে তাদের অপ্রস্তুত করব না।

এই বইয়ের কিছুটা বিশেষ নির্বাচিত অংশ 'প্রতিক্ষণের' ১৩৬৩ সনের বৈশাখ মাসের সংস্কৃতি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে ছাত্রী সান্ত্বনা সেনগুপ্তের আন্তরিক প্রচেষ্টায়। তাকেও সাধুবাদ জানিয়ে অস্বস্তিতে ফেলব না। বন্ধুবর রাখালচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের অতি আন্তরিক সাহায্য ছাড়া এই বই প্রকাশ করা সম্ভবই ছিল না। বাচিক কৃতজ্ঞতা নিবেদনে সে ঋণের শোধ হবে না। শ্রদ্ধেয় শ্রীশান্তিদেব ঘোষ মহাশয় মুখবন্ধ লিখে দিয়ে শুভসূচনা করলেন। শুধু কৃতজ্ঞতা জানালেই প্রকৃত সে উপকারের কথা বলা সম্পূর্ণ হবে না। বন্ধুবর শ্রীব্রজগোপাল গোস্বামী পরিচিতি পত্র লিখে দিয়ে এবং নানাভাবে উৎসাহ দিয়ে প্রকৃত বন্ধুকৃত্য করেছেন। এঁর সহযোগিতা নানাভাবে ফলপ্রসূ হয়েছে।

এছাড়াও অনেকেই সক্রিয়ভাবে না হলেও অজ্ঞাতে তাঁদের মনোগত সদিচ্ছার জোরে এই বই প্রকাশে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন। এঁদের সকলের প্রতিই রইল আন্তরিক অভিনন্দন।

শিশির কুমার ঘোষ

বিজ্ঞপ্তি

পাঠকবর্গের অবগতির জন্য জানাই আজ থেকে বেশ কয়েক বছর আগে আমার শান্তিনিকেতন স্মৃতিকথা যখন লিখতে আরম্ভ করেছিলাম তখন যাঁরা বেঁচেছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই আজ আর বেঁচে নেই। 'আমার পাওয়া শান্তিনিকেতন' বইখানি প্রকাশ করতে নানা কারণে দেরি হওয়াতে স্বভাবতই ঐসব ব্যক্তিদের সম্বন্ধে লেখায় কিছু অসংগতি পরিলক্ষিত হবে। আশা করি পাঠকবর্গ সহজেই তার কারণ অনুমান ক'রে নিতে পারবেন।

ইতি
গ্রন্থকার



মাস্টারমশাই



বিশ্বরূপ বসু ও লেখকের সংগে মাস্টারমশাই



মাস্টারমশাইর করা লেখকের স্কেচ

শান্তিনিকেতনের স্মৃতিকথা লিখতে বসে বহুকাল পর প্রায় তিপান্ন চুয়ান্ন বছর আগেকার কত কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে সেই দিনের কথা যেদিন ১৯৩১ সনে কলাভবনে শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে শান্তিনিকেতনে আসি। পড়াশুনায় অমনোযোগী ছিলাম বলে কোনও রকমে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করার পর আমি কি করব এটা নিয়ে একটা সমস্যা দেখা দিল বাড়িতে। ছোটবেলা থেকেই পড়াশুনায় ভাল ছিলাম না, তাই বাড়ির সকলেরই আমার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি এবং অতিমাত্রায় দৃষ্টি এবং যত্নের ফলে ভাল না হয়ে ক্রমে খারাপই হতে লাগলাম। যত্নটা শেষ পর্যন্ত অত্যাচারেই দাঁড়াল। আমার এক ভগ্নীপতির উপর ভার পড়ল আমাকে বিশেষভাবে দেখাশুনা করার জন্য। সমস্তক্ষণ তাঁর নজর যাতে আমি পড়াশুনায় ভাল হই। আমি এক বড় পরিবারে মানুষ হয়েছি। অনেক ছেলে বাড়িতে। সব ছেলেরাই পড়াশুনায় মোটামুটি এবং তার মধ্যে অনেকেই খুবই ভাল, একমাত্র আমিই ব্যতিক্রম। একসঙ্গে খেতে বসত সব ছেলেরা। আমার সেই ভগ্নীপতিও আমাদের সাথে বসতেন। খাবার সময় চলত নানারকম পড়াশুনার কথা। আমাকে প্রথম প্রশ্ন করা হতো। আমি উত্তর দিতে না পারলে আমার থেকে ছোটদের দিয়ে সেই প্রশ্নের উত্তর বের করে নেওয়া হতো। বোধহয় তার একটা সৎ উদ্দেশ্য ছিল যে আমি তাতে লজ্জা পেয়ে ভাল করে পড়াশুনা করব। আমার অবস্থা সহজেই অনুমেয়। তারপর থেকে খাবার সময় আমি অন্য ছেলেদের সঙ্গে খেতে যাওয়া এড়িয়ে চলতাম যতটা সম্ভব এই কারণে। ক্লাসে অঙ্ক পারিনি। বিকেলে খেলতে নেমেছি হঠাৎ হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন অঙ্ক কষাতে। বলির পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে গেলাম। আমার কথা ছেড়েই দিলাম, ভাল ছেলেদেরও খেলার সময় পড়ায় মন বসত কিনা সন্দেহ। এইরকম নানাভাবে অত্যাচার সহ্য করতে করতে ক্রমেই নিজের উপর সব আস্থা হারিয়ে ফেলতে লাগলাম। এ যেন জেলখানায় শিক্ষা! সমস্তক্ষণ অস্বস্তি আর ভয়। একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেলাম ক্রমে। ছবি আঁকতে ভাল লাগে, লুকিয়ে আঁকি। গান

শিখতে যাই তাও লুকিয়ে। লুকিয়ে বাঁশি বাজাই। এ সবই যেন অপরাধ। যার পড়াশুনায় মন নেই তার এসব সহ্য করা যায় না এই ভাব সকলের। তারপর সব কিছুতেই সমালোচনা, এমনকি ছেলেদের কাছেও হাসি ঠাট্টার খোরাক হয়ে পড়লাম। আমি যা করি সব কিছুতেই ঠাট্টা। ক্রমে পাড়ার তথাকথিত খারাপ ছেলেরাই হয়ে উঠল আমার প্রধান বন্ধু। ওদের কাছে গিয়েই হাঁপ ছেড়ে বাঁচতাম। অন্যান্য ভাল ছেলেদের সাথে মিশতেই ভয়। আমি কিছুই পারি না, এমনকি খেলাধুলাতেও একই অবস্থা। সেখানেও সবাই ঠাট্টা করে। সেইজন্য সকলের কাছ থেকে সব সময় পালিয়ে থাকতে পারলেই বাঁচি এমনকি আমার বাবা অথবা অন্যান্য বড়দেরও যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলি, কারণ দেখা হলেই পড়াশুনা সম্বন্ধে জবাবদিহি করতে হবে। এই ত আমার তখনকার অবস্থা। এই অবস্থায় কোন রকমে আমি যখন ম্যাট্রিকুলেশন পাস করলাম তখন স্বভাবতই এক সমস্যা হয়ে দাঁড়াল কি করব আমি এর পর। কলেজে ভর্তি হওয়া অসম্ভব।

ছোটবেলা থেকেই ছবি আঁকার খুব ঝোঁক ছিল। এখন একমাত্র উপায় কোন আর্ট স্কুলে ছবি আঁকা শিখতে যাওয়া। কোলকাতা অথবা শান্তি-নিকেতনে। শান্তিনিকেতনেই যাওয়া ঠিক হ'ল তখন। কারণ আমার মতো বোকা ছেলে তো গাড়ি চাপা পড়েই মরবে কোলকাতার মত জায়গায়। শুনেছি তখনকার দিনে যে সব ছেলেদের কিছু হবার আশা থাকত না তাদেরই শান্তিনিকেতনে পাঠানো হতো। ছবি আঁকা শিখব এ আকাঙ্ক্ষা আমার একেবারে ছোটবেলা থেকে, তার উপর স্বয়ং নন্দলাল বসুর কাছে শিখতে পারব এই আনন্দে একেবারে অধীর হয়ে গেলাম। এ স্বপ্ন আমার ছোটবেলা থেকেই ছিল। 'প্রবাসী' ও 'বিচিত্রা' মাসিক পত্রিকায় শান্তিনিকেতনের আর্টিস্টদের আঁকা ছবি বের হতো। দেখে আমার খুব ভাল লাগত আর মনে মনে ভাবতাম যদি যেতে পারতাম শান্তিনিকেতনে। এ স্বপ্ন যে কোনদিন পূর্ণ হবে ভাবি নি কোনদিন।

আগে থেকেই চিঠি লিখলেন আমার সেই ভগ্নীপতি শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর কাছে। তাঁর সাথে আগেই পরিচয় ছিল নন্দবাবুর। ভগ্নীপতি আর্টিস্ট ছিলেন এবং মাঝে মাঝে ছুটিতে ছবি আঁকা শিখতে আসতেন নন্দবাবুর কাছে।

১৯৩১ সালে ১লা জুলাই সন্ধ্যার গাড়িতে বোলপুর স্টেশনে পেঁছুলাম। আমার এক বন্ধুও এসেছে আমার সাথে কলাভবনে ভর্তি হবে বলে। কিরণশশী দে নামে আমাদের ওখানকার একটি ছেলে কলেজে পড়ত শান্তিনিকেতনে। সেই আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। তখনকার দিনে বোলপুর স্টেশনে একমাত্র গোরুর গাড়ি ছাড়া আর কোনরকম গাড়ি পাওয়া যেত না। অনেক সময় কুলির মাথায় মাল দিয়ে হেঁটেই আসতে হতো। যতদূর মনে পড়ে আমরা হেঁটেই এসেছিলাম। তখন বোলপুরে ইলেকট্রিক লাইট ছিল না। কেরোসিনের ল্যাম্পপোস্ট ছিল।

আমরা গেস্টহাউসে উঠব। প্রমোদ গাঙ্গুলী মশাই তখনকার গেস্টহাউস ম্যানেজার। আমাদের স্থান হল না সেখানে, কারণ আগে থাকতে আমরা লিখি নি। পান্থশালায় পাঠিয়ে দিলেন। হঠাৎ খবর না দিয়ে কেউ এলে তাদের ওখানেই থাকতে দেওয়া হতো। রাত্রে রান্নাঘরে খেতে গেলাম। দেখলাম ছেলেমেয়েরা সব পরিবেশন করছে। সেখানে কয়েকটি কলেজের ছেলের সঙ্গে আলাপ হ'ল। খাবার পর নিয়ে গেল তাদের হস্টেলে। গল্পগুজবে অনেক রাত হয়ে গেছে। আলো নেই। আলো নিভে গেছে। তখন তো শান্তিনিকেতনের নিজস্ব একটি 'পাওয়ার হাউস' ছিল এবং শ্রীনিকেতনেও একটি আলাদা। রাত দশটায় তা বন্ধ হয়ে যেত। আমরা একেবারে নতুন, তার উপর এসে পেঁছেছি রাত্রে। পান্থশালায় ফিরে যেতে হবে। পথ চিনি না। অনেক ঘুরে ঘুরে এসে হাজির হওয়া গেল। তারপর তো মশার কামড়ে সারারাত ঘুম নেই, কারণ কোলকাতায় মাসীর বাড়িতে মশারি ফেলে এসেছি। পরের দিন বুধবার ছিল। খুব ভোরে উঠে গোয়ালপাড়ার সোজা রাস্তা ধরে খানিক বেড়িয়ে এলাম। ফিরে এসে দেখি সব ছেলেমেয়েরা হাসপাতালে যাচ্ছে দল বেঁধে পান্থশালার পাশ দিয়ে। পরে জানলাম প্রতি বুধবার সকলের ওজন নিতে যেতে হয়।

সকালবেলা শান্তিনিকেতন দেখতে পেলাম। এত খোলা জায়গা, এত বড় আকাশ তো কোথাও দেখি নি। উত্তর পশ্চিম দিকে অত বড় লাল খোয়াই। পান্থশালার পাশেই বেদী-বাঁধান মস্ত বড় বটগাছ আর তার কাছেই একটি টিলা, তার উপরেও মস্ত বটগাছ, সব ঝুরি নেমেছে তার থেকে। কাছেই মন্দির। প্রতি বুধবারে সকালে উপাসনা হয় সেখানে। এ বুধবারেও হয়েছে। আগে

খবর জানতে পারিনি। পরে দেখেছি গুরুদেব আশ্রমে থাকলে এবং সুস্থ থাকলে তিনিই মন্দির নিতেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে দেখতাম প্রধানতঃ ক্ষিতিমোহনবাবু অথবা অন্য কাউকে নিতে। আশ্রমের সবাই উপস্থিত থাকতেন। পাঠভবনের ছেলেমেয়েরা লাইন করে আসত। অন্যান্য সব ভবনের ছাত্র শিক্ষক সবাই প্রায় উপস্থিত থাকতেন। তখন ত এত লোকসংখ্যা ছিল না, এই মন্দিরেই সব কুলিয়ে যেত। এমনকি পৌষ উৎসবের মতো বিশেষ দিনেও মন্দিরে আজকালকার মতো এত বেশী লোক হতো না, মন্দির এবং চাতালেই কুলিয়ে যেত। সেই সব মন্দিরের গানের দলের মধ্যে বিশেষ ক'রে মনে পড়ে দিনুবাবুর কথা আর খোল বাজাতেন গোঁসাইজী। অন্যান্যদের কথা বিশেষ মনে নেই; কারণ নতুন এসেছি, সকলকে ত চিনতাম না।

॥ ২ ॥

কলাভবনে ভর্তি হতে গেলাম পরের দিন সকালবেলা। বৃহস্পতিবার; অনেক আশা নন্দবাবুর সাথে দেখা হবে। সত্যি কোনদিন শান্তিনিকেতনে আসতে পারব কল্পনাতেও আসেনি, তাই মনে এত আনন্দ!

শান্তিনিকেতনে সাধারণতঃ অধ্যাপকদের দাদা বলে ডাকা হতো। নামের পিছনে দাদা। বড় বড় অধ্যাপকদের যেমন ক্ষিতিমোহনবাবু (সেন), সুরেনবাবু (কর), হরিবাবু (বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিকে আমরা মাস্টারমশাই ব'লে সম্বোধন করতাম, তবে সাধারণভাবে মাস্টারমশাই বলতে নন্দবাবুকেই বোঝাত।

কলাভবনে গিয়ে দেখি মাস্টারমশাই নেই। তিনি তখন ভূপালে গিয়েছিলেন। সুরেনবাবু আমাকে ভর্তি করে নিলেন। আমি তো ভর্তির পর কাজের ঘরে একটি আসন পেলাম। এক এক ঘরে দুজন ক'রে বসার জায়গা। কয়েক দিন পর মাস্টারমশাই এলেন। আমি আগে কখনও তাঁকে দেখিনি। দেখলাম একজন ভদ্রলোক এলেন কাজের ঘরে, সঙ্গে অনেক সব ছেলেমেয়েরা। ঠিক বুঝতে পারলাম না কে, তবে বিশিষ্ট একজন কেউ। বুঝলাম নন্দবাবু নিশ্চয়ই নন কারণ তাঁর রং কালো। আমার মনে একটা ধারণা ছিল মাস্টারমশাইয়ের রং ফর্সা। পরে পরিচয় হ'ল তাঁর সঙ্গে। সেই দিন বিকেলে সঙ্গে করে বেড়াতে নিয়ে গেলেন। আশ্রম ঘুরিয়ে দেখালেন। খেলাধুলা

করি কিনা ; "রোজ খেলবে", "দুধ খাবে রোজ"—এই সব বললেন। ছবি আঁকার কথা কিছুই জিজ্ঞাসা করলেন না। পরের দিন দেখতে চাইলেন কিছু এঁকে এনেছি কিনা। আগেই বলেছি আমার ভগ্নীপতি আর্টিস্ট ছিলেন। তাঁর কাছে অসিতবাবুর আঁকা মাস্টারমশাই'র পোর্ট্রেট ছিল। আমি তাই দেখে এঁকে এনেছিলাম। সঙ্গে অন্যান্য আরও ছবিও ছিল। জিজ্ঞেস করলেন, "আমাকে তুমি পেলে কোথায় ?"

ছাত্রাবাসের অনেক ছেলেদের সঙ্গে পরিচয় হ'ল। তখন আমাদের ছাত্রাবাস ছিল 'গৈরিকে'। এটা ছিল আগেকার হাসপাতাল। এখন সে বাড়ী নেই। আমার সঙ্গে যে ছেলেটি এসেছিল সে ভর্তি হতে পারেনি কলাভবনে। শিক্ষাভবনে ভর্তি হ'ল। আমরা তখন কটি ছেলেই বা ছিলাম কলাভবনে। ছেলেমেয়ে নিয়ে সব মিলিয়ে আমরা খুব বেশী হ'লে কুড়িজনের বেশী ছিলাম না। তাও বাড়ীর থেকে কেউ কেউ আসত। সবাই ছাত্রাবাসে থাকত না। আমাদের ছাত্রাবাসের পেছন দিয়ে গোয়ালপাড়ার লাল কাঁকরের রাস্তা চলে গেছে। আমাকে যার ঘরে থাকতে দেওয়া হ'ল সে ছেলেটি জাভা থেকে এসেছিল। নাম সুতান হারাহাপ। বেশ কচি মুখখানা। অল্প কথা বলে, সব সময় হাসি মুখ। আমি আসার কিছুদিন পরেই অবশ্য সে চলে গিয়েছিল। তার 'ফেয়ারওয়েল পার্টি'র কথা কোনদিন ভুলব না। তখন কারো 'ফেয়ারওয়েলে'র সময় একটা পিকনিক হতো। বল্লভপুর গ্রামে 'আমার কুটীরে' পিকনিক। এই আমার প্রথম পিকনিকের অভিজ্ঞতা। কোপাই নদীর ধারে বালির উপর খেলাধুলো হচ্ছে। হঠাৎ মাস্টারমশাই মামাকে (শৈলেশ) চ্যালেঞ্জ করে বসলেন কুস্তিতে। মামার তো খুবই সংকোচ স্বভাবতই, আমরাও অবাক। কোনও মাস্টার কখনও ছাত্রের সঙ্গে কুস্তি লড়বেন এ তো কল্পনারও বাইরে, তার উপর মাস্টারমশাইর মতো লোকের সঙ্গে। আমরা সদ্য বাইরে থেকে এসেছি, এসব কখনও দেখিনি। কুস্তি চলেছে দুজনে আর আমরা চারদিক থেকে ব'সে বা দাঁড়িয়ে দেখছি কে হারে কে জেতে। এখানে মামা কে ছিল একটু বলা দরকার। মামার নাম শৈলেশ দেববর্মন। আগরতলার ছেলে। আমি ও মামা একই বছরে ভর্তি হয়েছিলাম কলাভবনে। শুনেছি ও ছোটবেলায়ও এখানে ছিল। ওর মামা ত্রিপুরার মিনিস্টার ছিলেন। সেই মামা মিনিস্টারের গল্প কথায় কথায় করত, তাই

প্রথমে আমরা 'মামা মিনিস্টার' বলেই ডাকতাম। পরে মিনিস্টার বাদ দিয়ে 'মামা' হয়েছিল। সকলেরই মামা এমনকি মাস্টারমশাইও মামাই ডাকতেন।

এখানে এই ছাত্র-শিক্ষকের সহজ সম্পর্ক দেখে অবাক হয়েছিলাম। সকলের সঙ্গেই দাদা-ভাই সম্পর্ক ও সবার ব্যবহারও সেই রকমই। আমরা তো মাস্টারকে ভয় করে চলতে হয় তাই জানি। এখন বুঝি শিক্ষক-ছাত্রের এই চমৎকার সহজ সম্পর্কই তো এখানকার প্রধান সম্পদ। সম্পর্কই যদি ভালভাবে গড়ে না উঠল তাহলে প্রকৃত শিক্ষা কি করে হবে? ভয়ে শিক্ষকের কাছ থেকে দূরে সরে থাকলে কি করে শিক্ষা লাভ হবে? যে শিক্ষক ছাত্রদের সঙ্গে সহজভাবে মিশতে পারেন না, তিনি শিক্ষক হবার উপযুক্তই নন। এখানে আমার একটা কথা মনে পড়ল। আমি যখন প্রথম শিক্ষাসত্রে চাকরি করতে যাই তখন মাস্টারমশাই আমাকে এই উপদেশটি দিয়েছিলেন, "আমি অনেক জানি, আমি যদি ছেলেদের আপন ভাইয়ের মতো ক'রে না নিতে পারি, যা শেখাব ছাই শেখাব। আর তুমি আমার থেকে অনেক কম জেনেও যদি তাদের ভাইয়ের মতো ভালবেসে শেখাও, যা শেখাবে সোনা শেখাবে।"

॥ ৩ ॥

কলাভবনের তখনকার প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর একটু ক'রে পরিচয় দিই এখন; কলাভবন একটা পরিবারের মতো ছিল কিনা কাজেই সেই পরিবারকে জানতে গেলে পরিবারের সকলকেই জানতে হয়। ছাত্রদের কথা বলতে প্রথমেই নিশিকান্তর (নিশিকান্ত রায় চৌধুরী কথা মনে পড়ে। নিশিকান্ত যে কি ছিল তার সঠিক পরিচয় দেওয়া সত্যিই কঠিন। আমি যখন কলাভবনে ভর্তি হলাম, প্রথমে ওর সাথেই আমার পরিচয় হয়। আমাকে সঙ্গে করে সব জায়গায় নিয়ে যাওয়া, শান্তিনিকেতনের সমস্ত কিছুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া নিশিকান্তই করেছিল। তখনকার দিনে কোনও নতুন ছাত্র এলেই সকলে তাকে আপন ক'রে নিত, ফলে নতুনরা পুরানোদের সঙ্গে খুব সহজেই মিশে যেতে পারত। নিশিকান্ত ছবি আঁকত। দেখেছি যখন সে আঁকতে বসতো তখন আর কাজের ঘর থেকে বড় একটা বের হতো না। খাওয়াদাওয়াও প্রায় ভুলে যেত। নিশিকান্ত যেমন খুব খেতে পারত, খেতে ভালওবাসত তেমনি। মাঝে মাঝে কোন অধ্যাপকের বাড়ি চড়াও হয়ে খাওয়া আদায় ক'রে নিত।

তা মুড়ি হলেও আপত্তি নেই। তখন কলাভবনের ছেলেদের নিজেদের রান্নাঘর ছিল। ছেলেরাই তা চালাত। নিশিকান্ত কিন্তু ছোট্ট একটা ঘরে স্টোভে নিজেই রান্না করে খেত। বেশির ভাগ সময়ে খিচুড়ি আর তার মধ্যে ডিম ভেঙ্গে ছেড়ে দিয়ে নামিয়ে নিত। ও যে কি খেত আর কি না খেত! কাকের মাংস, ইঁদুরের মাংস, বাদুড়, চড়াই কিছুই বাদ দেয়নি। ওর কাছেই শুনেছি একবার চড়াইর মাংস খেয়ে নাকি তিনরাত ঘুমায়নি। খুব গরম নাকি চড়াইয়ের মাংস। নিশিকান্ত ভাল কবিতা লিখতে পারত। পরে কবি বলেই পরিচিত ছিল এখান থেকে পণ্ডিচেরী চলে যাবার পর। নানা সময়ে নানারকম মজার কবিতা লিখত আর তাতে সুর দিতেন শান্তিদা (শ্রীশান্তিদেব ঘোষ)। আর আমরা যারা কিছু কিছু গাইতে পারতাম, সেই সব গান গাইতাম প্রাণভরে। পুজার ছুটির আগে গৌরপ্রাঙ্গণে একটা মেলা হতো। সেই মেলার নাম ছিল আনন্দবাজার। এখনও সে মেলা হয়। সব বিভাগের ছেলেমেয়েরা সেই দিন সকাল থেকে নানারকম দোকান সাজাতে ব্যস্ত। সাধারণতঃ এক এক বিভাগের এক এক দোকান। কোনও বিভাগ খাবারের দোকান, কোনও বিভাগ চায়ের দোকান ইত্যাদি। আবার কেউ কেউ একলাও কিছু করত। একবার দেখেছিলাম পাঠভবনের বড় ছেলেরা একটা গাধার গাড়ি করেছিল। ধোপাদের গাধা ধরে এনে একটা ছোট আবর্জনা ফেলার গাড়ির সঙ্গে জুড়ে দিয়ে তাতে এক একজনকে চড়িয়ে একবার ক'রে ঘুরিয়ে এনে পয়সা আদায় করছিল। কেউবা গাছতলায় বসে হাত দেখে ভবিষ্যৎ ব'লে পয়সা নিচ্ছে। কেউ আবার ফুলের মালা, কেউ পান—এই সব বিক্রি করছে। এই মেলার উদ্দেশ্য হলো লাভের টাকাটা 'পুয়োর ফান্ডে' দেওয়া। আনন্দবাজারের মেলা সত্যিই আনন্দমেলা। নানা রঙের শাড়ি, লতাপাতা দিয়ে সাজান সব দোকান আলোতে ঝকমক করছে সন্ধ্যেবেলা। ছেলেমেয়েরা, মাস্টারমশাইরাও আশ্রমের অন্যান্যরা মিলে কেনাবেচা করছে। কোন দল বসে গান গাইছে। সানাই, ঢাক বা ঢোলের শব্দে চারদিক মুখরিত। এ এক নির্মল আনন্দের ফোয়ারা। আমরা একবার নিশিকান্তের লেখা গান গেয়ে ঘুরে ঘুরে বেশ কিছু টাকা আদায় করেছিলাম। দুজনে একটা চাদর ধ'রে দলের সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে আর গান শুনে তাতে সব পয়সা ফেলছে। গানটার সবটা এখন আর মনে নেই, তবুও যা মনে আছে তুলে দিলাম।

তাঁর ঘরে গেলে দেখতে পাবে ছোট ছেলে চারজনা
আমি ভেবে পাইনে কেন তাদের ইস্কুলেতে পাঠান না ।।
সুন্দরদিদি তার পিছুতে
কুলের আচার দেন শুকোতে
ছোট ছেলেমেয়ে খেতে গেলে করেন তাদের তাড়না ।।
পরে প্রমোদবাবু রন
আশ্রম সচিব তিনি হন
তিনি অফিস ঘরে বইসে ঘোরান ঘোরনচৌকি চেয়ারখানা ।।
তারপরেতে বাবু হরি
আছেন সদাই কলম ধরি
লেখেন তিনি ডেস্কধারি সারাজীবন সাধনা ।।
তারপরেতে বাবু ক্ষিতি
দেখলে তারে লাগে ভীতি
তিনি খোয়াই বেড়ান নিতি নিতি পেছুতে যান তিনজনা ।।
দাদামশাই দাদা নেপাল
চকচকে তাঁর মাথা কপাল
ফুলো ফুলো তাঁর দুটো গাল ভলিবল বদনা ।।
তারপরেতে মামা প্রতাপ
উত্তরলাইনে তাঁরই প্রতাপ
বেঁটেখাটো লোকটি তিনি গোঁফ জোড়াটি মন্দ না ।।
তারপরেতে দিদি লাবণ্য
বাড়িখানা তাঁর ছিল জঘন্য
তিনি কোনায় কানায় সাফ করিছেন ভাড়া দেবার বাসনা ।।

আমরা কলাভবনের ছেলেমেয়েরা ভলিবল খেলতাম। বিকেলবেলা মাস্টারমশাই, সুরেনবাবু, মৌলানা জিয়াউদ্দিন সাহেব প্রভৃতি রোজ উপস্থিত থাকতেন খেলার সময়। সুরেনবাবু হাতে একতাড়া বিড়ি নিয়ে বসতেন। সেই ভলিবলের গান বেঁধেছিল নিশিকান্ত।

হে মোর হস্ত খেলাতে মত্ত কি উল্লাসে
কলাভবনের মিউজিয়ামের মাঠের পাশে—কি উল্লাসে ।।

কলাভবনের খুলিয়াছে দ্বার
চলে ছেলেমেয়ে কাতারে কাতার
দিবে আর নিবে 'সার্ভিস' করিবে মনের আশে
কলাভবনের মিউজিয়ামের মাঠের পাশে—কি উল্লাসে ॥
ঐ যে গো লাল নেটের বাহার
লোহার ডাণ্ডা দুই পাশে তার
ঐ যে গো দাগা চূণ দিয়ে আঁকা সবুজ ঘাসে
কলাভবনের মিউজিয়ামের মাঠের পাশে—কি উল্লাসে ॥
ওপাড়া হইতে ভলি খেলিবারে এসেছিল দুইজনে
দুইদিন খেলি আঁখি ছলছলি চলি গেল কি কারণে ?
এসেছিল দুইজনে।
ভলিবলে যদি দোষ হয় তবে টেনিসে কেননা হবে গো
এপাড়া ছাড়িয়া ও পাড়ায় গেলে কি নীতি বজায় রবে গো ?
ওগো সাবিত্রী সাজো সাজো সাজো
নিবেদিতা তুমি কোনখানে আছ
যমুনা আসিয়া বলটি মারিয়া তোল আকাশে।
কলাভবনের মিউজিয়ামের মাঠের পাশে—কি উল্লাসে ॥
আজকের খেলা হলে অবসান
সবাই করিবে সরবত পান
নির্ভয়ে যেন প্রাণখোলা হাসি সকলে হাসে
কলাভবনের মিউজিয়ামের মাঠের পাশে—কি উল্লাসে ॥

এই ধরনের আরও কিছু গান নিশিকান্তের ছিল, তার দুই এক লাইন ছাড়া মনে নেই। মাস্টারমশাই'র বাড়িতে নিমন্ত্রণ হয়েছে আমাদের, সেই খাবারের তালিকা নিয়ে গান বেঁধেছিল—

মাস্টারমশাইর বাড়িতে আজ হইল নেমন্তন্ন
জানি না কেন।
প্রথমেতে ঘৃতভাত গুটাইয়া লও হাত
নইলে জামার হাতায় লাগবে ঘৃত মাখা অন্ন
জানি না কেন

লবঙ্গলতিকায় যাদের যাদের মতি নাই
তারা আমায় দিতে পার, আমি নই সামান্য।
জানি না কেন ॥
ইত্যাদি—

আরেকটি গানের প্রথম দু'লাইন—

এ সংসারে কেমন করে কিসে কি হয় যায় না বলা
সুখে থাকতে ভূতে কিলোয় দুখে থাকলে আরও জ্বালা ॥

এই সব গান সর্বদাই আমরা গাইতাম। এখানে স্বভাবতই শান্তিদার (শ্রীশান্তিদেব ঘোষ) কথা এসে পড়ে। এই সমস্ত গানের সুর দিতেন শান্তিদা এবং তাঁরই নেতৃত্বে আমরা নানা জায়গায় এই সব গান বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গেয়ে জমিয়ে রাখতাম। আমাদের কলাভবনের জীবন শান্তিদাকে ছাড়া ভাবাই যায় না। তিনি সর্বদাই আমাদের মধ্যে থাকতেন।

কলাভবন ছাত্রাবাসের জীবনে যে কি দান ছিল নিশিকান্তের তা আমরা তখন ততটা বুঝতে না পারলেও এখন খুব ভালোভাবে অনুভব করি। তার নানা কাণ্ডের কথা এখনও মনে পড়ে। শ্রীনিকেতনে যাবার রাস্তার ধারে একটা মস্ত বড় শরঝোপ ছিল। এখন যেখানে ক্ষিতিমোহনবাবুর বাড়ি তার কাছাকাছি। তখন ওখানে কোনও বাড়ি ছিল না। ওখান দিয়ে বেড়াতে যাবার সময় একদিন বলল, "কাল বেলা তিনটের আগে এই শরঝোপটা পুড়ে যাবে। কিন্তু আমি নিজে পোড়াব না অথবা কাউকে পোড়াতেও বলব না।" সেইদিন রাত্রে লাইব্রেরীর বারান্দায় একটি নোটিস ঝুলিয়ে দিল, —"অমুক জায়গার অমুক শরঝোপ যখন কাল বেলা তিনটের সময়ে পুড়ে যাবে তখন বুঝবে কারো মনোবাসনা পূর্ণ হলো।" পরের দিন বেলা তিনটের আগেই কেউ শরঝোপটায় আগুন লাগিয়ে দিল। আসলে কেউ নোটিস প'ড়ে মনে মনে ঠিক করল, "দাঁড়াও তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করাচ্ছি, তার আগে আমিই পুড়িয়ে দেব।" তখনকার দিনে কারো কিছু বিজ্ঞপ্তি দিতে হলে লাইব্রেরীর বারান্দায় টাঙ্গিয়ে দিত। রাঘবেন্দ্র নামে দক্ষিণ ভারতের একজন শিক্ষাভবনের ছেলে ছিল। তার প্রতিদিনের একটা কাজই ছিল আশ্রমের সব নানা খবর 'টাইপ' ক'রে রাত্রে লাইব্রেরীর বারান্দায় ঝুলিয়ে দেওয়া। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে জেগে ঐ কাজ করা নেশার মতো ছিল তার।

আর একটা ঘটনা। উত্তরায়ণে কিসের একটা গানের মহড়া হচ্ছে। গুরুদেব, দিনুবাবু উপস্থিত আছেন, আর আছেন অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরাও। যদিও নিশিকান্ত গাইতে পারত না তবুও সে উপস্থিত আছে। তখনকার দিনে কোন কিছু মহড়ার সময় অনেকেই থাকতেন অংশগ্রহণ না করলেও। গানের দলের মধ্যে ব'সে নিশিকান্ত। মণি (রায় চৌধুরী) নিশিকান্তকে বলল, "তুই যদি গানের মাঝখানে দুই হাত তুলে 'বলিহারি যাই' 'বলিহারি যাই' ব'লে উঠতে পারিস তাহলে তোকে চার পয়সার রসগোল্লা খাওয়াব।" খাইয়ে লোক, তার উপর চার পয়সার রসগোল্লা, এ লোভ কি সামলানো যায়! দুই হাত তুলে 'বলিহারি যাই, বলিহারি যাই গো' ব'লে চিৎকার করে উঠল। সব গান থেমে গেছে। গুরুদেব কট্‌কট্‌ ক'রে তাকাচ্ছেন, দিনুবাবু গম্ভীর, একটা থমথমে ভাব। নিশিকান্ত নির্বিকার, যেন কিছুই হয়নি। স্বভাবমত পা দোলাতে লাগল। পরের দিন সকালে গুরুদেব ডেকে পাঠিয়ে বেশ বকুনি দিয়ে বললেন, "এসব পাগলামি চলবে না।" নিশিকান্ত বলল, "আমি কি করব গুরুদেব, মণি আমাকে চার পয়সার রসগোল্লা খাওয়াবে বলেছে।" "কেউ যদি ওরকম বলে তুই আমার কাছে চলে আসিস, আমি তোকে চার পয়সা থেকে অনেক বেশি রসগোল্লা খাইয়ে দেব", গুরুদেব এই ব'লে অনেক খাইয়ে দিয়েছিলেন ওকে।

একদিন কোন এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে ভুট্টা চুরি করতে গেছে উত্তরায়ণের বাগানে। ওর বুদ্ধিতেই দুজনের গায়েই চাদর। গোটা দুই ক'রে ভুট্টা যখন তুলে চাদরের তলায় ঢোকানো হয়েছে তখন মালী এসে ডেকে নিয়ে গেল, "বৌঠান ডাকছেন।" "দেখি কটা তুলেছ? দাও ওগুলি" বৌঠান বললেন। তারপর এ গল্প সে গল্প; ভুট্টাচুরির সম্বন্ধে কোনও কথাই হলো না। সঙ্গের ছেলেটির অবস্থা সহজেই অনুমেয়। নিশিকান্তের যেন কিছুই হয়নি এই ভাব। একটু পরে ভুট্টা ভাজা এবং সঙ্গে নানারকম মিষ্টি এলো। কি খুশী নিশি! বলে, "এরকম হ'লে রোজ চুরি করতে আসব।" বৌঠান বললেন, "আর যাতে চুরি না কর তাই খাওয়ালাম।"

নিশিকান্ত যেমন খেতে পারত আগেই বলেছি তেমনি আবার না খেয়েও কাটিয়ে দিত অনেক সময়। আমি, নিশিকান্ত আর বনবিহারীদা প্রায়ই একসঙ্গে থাকতাম। নুটুদি'র মা তাঁর বাড়িতে মাঠের মধ্যে একলা থাকতেন ব'লে

আমরা তাঁকে পাহারা দেবার জন্য কিছুদিন ঐ বাড়িতে ঘুমোতাম। রাত দুপুরে একদিন দেখি নিশিকান্ত বিড় বিড় ক'রে কি বলছে আর পা নাচাচ্ছে। ঘুম ভেঙ্গে গেল, বিরক্তিভরে জিজ্ঞেস করলাম, কি করছ হে, ঘুমোতে দেবে না নাকি?" উত্তর হ'ল, "কিছু মনে কোরো না ভাই ছন্দ জেগেছে।" সেই থেকে রাতদিন চলল কবিতা লেখা স্নান খাওয়া ভুলে। রাতেও ঘুম নেই। ছোট একটা চৌকো মশারি ছিল, রাত্রে তার নীচে বসে লিখত।

একবার ওর মাথায় এলো অন্ধকার রাতে পিক্‌নিক্ করতে হবে। তখন গৈরিকে থাকি আমরা। সন্ধ্যার সময় লন্ঠন, স্টোভ, হাঁড়ি প্রভৃতি নিয়ে রওয়ানা হলাম চারজন—নিশিকান্ত, রামকিঙ্করদা, সোমেন ও আমি। রেল-লাইন পেরিয়ে পারুলডাঙ্গার শালবনে যাওয়া হ'ল। শালগাছের ডালে লন্ঠন ঝুলিয়ে পিক্‌নিক্ খুব জমেছিল। মনে পড়ে আরও কথা। আমি ও নিশিকান্ত মাঝে মাঝেই 'স্কেচ্' করতে সকালবেলাতেই বেরিয়ে পড়তাম গ্রামের দিকে। বল্লভপুর, "আমার কুটীর", গোয়ালপাড়া, সাঁওতালগ্রাম প্রভৃতি জায়গায়। সমস্ত দিন ধরে চলত গ্রামের অনেক কিছুর 'স্কেচ্'। দুপুরে কোপাই নদীর জলে স্নান করে গ্রামেরই কোনও দোকান থেকে মুড়ি আর আলুর চপ্ কিনে খেয়ে নিতাম। একবার কাকাতুয়া স্কেচ করতে 'আমার কুটীরে' গেছি। তখন হরিণ, ময়ূর, বাঁদর, কাকাতুয়া প্রভৃতি অনেক রকম পশুপাখী ছিল ওখানে। সেই প্রথম আমাদের সঙ্গে 'আমার কুটীরের' প্রতিষ্ঠাতা ৺সুষেণ মুখোপাধ্যায়ের পরিচয়। তিনি আমাদের খুব আদরযত্ন করেছিলেন। কোপাই নদীতে জাল ফেলে চুনো মাছ ধরিয়ে তার ঝোল আর ভাত খাইয়েছিলেন। তিনি আমাদের বলেছিলেন, সবাই নিজের বাড়ি মনে ক'রে এখানে আসবে তাই এর নাম দিয়েছি 'আমার কুটীর।' বল্লভপুর গ্রামে এই 'আমার কুটীর'।

একবার আমি আর নিশিকান্ত দিন দশেকের জন্য বোলপুরে ছিলাম উকিল পট্টিতে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে। সেবার রবীন্দ্রজয়ন্তীর সময় আশ্রম প্রায় খালি হয়ে গেছে। অনেকেই চলে গেছেন কোলকাতায়। ছাত্রাবাস প্রায় ফাঁকা। তখনই আমরা ঠিক করলাম এই সময় কিছুদিন বোলপুরে থাকব। জায়গাও জুটে গেল। রোজ হাটে বাজারে গিয়ে 'ফিগার স্টাডি' করতাম। গ্রামের লোকেরা তাই দেখে বলত, "ইয়ারাই কবি বটে, কিরকম হচ্যাম্ হচ্যাম্ কইরে

খারচে (আঁকছে) দেখছিস ?" আমাদের রান্না ক'রে দিত যোগীন নামে একটি লোক। এই যোগীনই পরে শান্তিনিকেতনে চায়ের দোকান দিয়েছিল যেখানে এখন সেবাপল্লী, গোয়ালপাড়া যাবার লাল কাঁকরের রাস্তার ধারে, জামবনের মাঝে। চারদিকে ছোটবড় গাছের জামবন। তারই পেছনে একমাত্র বাড়ি ছিল ৺সন্তোষ মজুমদার মহাশয়ের। তখনকার সকলে একমাত্র যোগীনের দোকানই জানত। পরে তার পাশে আরও দুই একটা দোকানও হয়েছিল।

যখন ঐ সময়ে বোলপুরে ছিলাম তখন রোজই বিকেলে একবার করে শান্তিনিকেতন ঘুরে যেতাম। একদিন ঠিক করলাম, দুজনে বোলপুরে কোনও হোটেলে দুপুরের খাওয়াটা সেরে নেব। একটি হোটেলে গিয়েছি। বারান্দায় বসে একটি লোক মশলা বাটছে। জিজ্ঞেস করলাম, খেতে কত পড়বে। লোকটি নাক ঝেড়ে মশলা বাটতে বাটতে বলল, 'বসুন বলছি।' আর সেখানে খাওয়া হল না বলাই বাহুল্য।

কয়েক বছর পর নিশিকান্ত এখান থেকে পণ্ডিচেরী আশ্রমে চলে গেল। কবি বলেই ওখানে পরিচিত ছিল, আগেই বোধহয় বলেছি। চিঠিপত্র বড়ো একটা কাউকেই লিখত না। তবু দুই-একবার আমাকে ওখানে ঘুরে আসার জন্য লিখেছিল। যাওয়া হয়ে ওঠেনি কখনও। নানারকম কঠিন ব্যাধিতে বহুকাল ভুগে সে মারা যায়। একেবারে ছোটবেলা থেকেই এখানে মানুষ হয়েছে এবং ওর সহজ সরল স্বভাবের জন্য স্বয়ং গুরুদেব থেকে আরম্ভ ক'রে আশ্রমের ছোটবড় সকলেরই খুব প্রিয় ছিল।

বনবিহারী ঘোষ—বনবিহারীদা বয়সে আমাদের অনেকের চাইতেই বড় ছিলেন। বালিতে বাড়ি। অর্নামেন্টাল ডিজাইনে হাত ভালো ছিল। ভালো এস্রাজ বাজাতেন এবং এখানকার অনেক অনুষ্ঠানে ও বাইরেও কোন কোন নৃত্যাভিনয়ে যোগ দিয়েছেন। খুব প্রাণবন্ত লোক এবং রসিয়ে গল্প বলতে পারতেন। পরে আমেদাবাদে ডিজাইনের কাজ নিয়ে 'লাল মিলে' চলে যান, তারপর 'ক্যালিকো মিলে' এবং সব শেষে দিল্লী 'পলিটেক্‌নিকে' চাকরি করতেন। এখন অবসর গ্রহণ ক রে দিল্লীতে বসবাস করছেন।

৺হীরেন ঘোষ—নানারকম সেলাই-এর কাজে ঝোঁক ছিল এবং ছেলেদের মধ্যে ওই একমাত্র তখন বাটিক করত। সেলাইএর একটা বই বার করেছিল।

'কিচেন', 'পিক্‌নিক্‌', 'এক্সকারশন' ইত্যাদিতে ওর একটা বিরাট ভূমিকা ছিল, কারণ ও হিসেবে খুব পাকা ছিল। ওর উপরই সাধারণতঃ এই সবের ব্যবস্থাপনার এবং টাকাপয়সার ভার থাকত। গোয়ালিয়রে চাকরি নিয়ে চলে যায়। এখন আর বেঁচে নেই।

টৌরিকেরা হানুজি রুদ্রাপ্পা—মডেলিংএ ভাল হাত ছিল। রামকিংকরদার প্রিয় ছাত্র, মহীশূরের ছেলে। সম্প্রতি মারা গেছে।

নারায়ণ সঙ্গম—এও মহীশূরের ছেলে। ছবিতে ভাল হাত ছিল। নানারকম যোগাসন করত। অল্পদিন পরেই চলে যায়।

৺মণি রায় চৌধুরী--বহরমপুরের লোক। ভাল ছবি আঁকতেন। গানও গাইতে পারতেন ভালো এবং এখানকার রোজকার বৈতালিকে নিয়মিত গান গাইতেন। পরে চাকরি নিয়ে করাচীর ওদিকে চলে যান। শেষে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। কিছুদিন আগে মারা গেছেন।

বদু—ছেলেটি বোবা ছিল, বাড়ি দেওঘর। কথায় কথায় খুব রেগে যেত এবং কারো ওপর রেগে গেলেই সোজা মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি গিয়ে তাঁর কাছে নালিশ করত। একবার কোন কারণে আমার উপর খুব চটে গিয়ে নালিশ করেছিল। মাস্টারমশাই যতই বোঝান কিছুতেই বোঝে না। সারাদিন ওখানেই থেকে খাওয়াদাওয়া করল। শেষ পর্যন্ত মাস্টারমশাই একটা স্কেচ্‌ করে দিলেন কার্ডে, শিশিরের খুব করে কান মলে দিচ্ছেন। তাতে খুব খুশী হয়ে হস্টেলে ফিরে এসে সবাইকে সেটা দেখাতে লাগল, একমাত্র আমি ছাড়া। এই রকম সরল ছিল। ছবি বিশেষ আঁকত না। ওর নেশা ছিল পেন্সিলে সকলের 'পোর্ট্রেট' করা। কিছুদিন পর চলে গেল, আর কোনদিন আসে নি, কোন খবরও পাওয়া যায় নি আর।

রামকিংকর বেইজ (কিংকরদা)—বাঁকুড়ায় বাড়ি। আমি যখন কলাভবনে ভর্তি হই তখনও রামকিংকরদা অধ্যাপক হন নি। আমাদের ছাত্রাবাসেই থাকেন। সমস্তক্ষণ ছবি আঁকেন অথবা সারাদিন বাইরে বাইরে ঘুরে স্কেচ্‌ ক'রে সন্ধ্যাবেলা ছাত্রাবাসে ফেরেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে ঘন্টার পর ঘন্টা একটা গানই গেয়ে চলেছেন। একটা গান প্রায়ই ওঁকে গাইতে শুনতাম— "সকরুণ বেণু বাজায়ে কে যায়।" কেমন যেন বিলিতি গানের ঢংএ টেনে টেনে গাইতেন। চমৎকার ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ। কখনও মেজাজ খারাপ করতে

অথবা রাগ করতে দেখিনি। আপন মনেই থাকতেন। কিছুদিন পরে রামকিংকরদা মড্‌লিংএর শিক্ষক হয়ে এখানেই থেকে যান। মাস্টারমশাইর ছাত্রদের মধ্যে ও'র মত বড় শিল্পী আর হয়েছে কিনা জানি না। সবরকম মিডিয়ামে এত পাকা কাজ করতে আর কাউকে দেখিনি। ওয়াটার কালার-এ ওয়াশ ও টেমপারা, 'অয়েল', 'প্যাসটেল'—এই সব কিছুতেই বহু কাজ করেছেন। 'হিউম্যান ফিগার' থেকে 'নেচারের' সব কিছুরই 'ড্রইং'এ অফুরন্ত জ্ঞান ছিল। রামকিংকরদা যদিও আমাদের ক্লাস-শিক্ষক ছিলেন না তবুও ও'র কাছ থেকে অনেক শিখেছি। তিনি যখন কাজ করতেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো দেখতাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা। মুগ্ধ হতাম তাঁর 'বোল্‌ড' তুলির টান দেখে। 'পেন্সিলে' 'ড্রইং' ক'রে নিয়ে রং লাগাতে বড়ো একটা দেখিনি। একেবারেই রং-তুলি দিয়ে আঁকতেন। ও'র ছোট বড় অনেক ছবিই এখনও মনে দাগ কেটে আছে। ও'র অনেক বড় বড় কাজ আশ্রমময় ছড়িয়ে আছে।

সন্তোন হারাহাপ্—জাভার ছেলে। পান্থশালায় এই ছেলেটির হাতের ফ্রেস্কো ছিল। অনেক 'লিনোকাটের' কাজ করেছিল। শান্ত প্রকৃতির। আমি আসার কিছুদিন পরই চলে যায়, আগে বলেছি।

মার্তণ্ড যোশী এর বাড়ী কোথায় ছিল মনে নেই। একটু মাথার দোষ ছিল। একা একাই থাকত বেশির ভাগ সময়। কারো সাথে বড়ো একটা মিশত না। ছিল বছর দুই আন্দাজ। তারপর তার আর কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি।

৺শৈলেশ দেববর্মণ (মামা)—শৈলেশ আগরতলার লোক এবং একই বছরে আমরা ভর্তি হই কলাভবনে, আগে বলেছি। অত্যন্ত ভালমানুষ ধরনের সৎ মানুষ ছিল। ছোট ছোট ছবি আঁকত 'ওয়াশে'। খুব যত্ন করে অনেক দিন ধরে এক একটা ছবি করত। একবার একটা মজার ঘটনা হয়েছিল। আমাদের কাজের ঘরে, যার যার আসনেই অসমাপ্ত ছবি থাকত। কাজের ঘরে তখন তালা দেওয়া থাকত না। একদিন দেখা গেল মামা'র প্রায় শেষ করা একটা ছবি নেই। আমরা ভাবলাম, চুরি হয়ে গেছে। মামা'র ত বটেই আমাদেরও খুব মন খারাপ। তারপর অনেক দিন চলে গেছে। ছবি হারানোর কথা আমরা প্রায় ভুলেই গেছি। ১০ই মার্চ, গান্ধীপুণ্যাহের দিন আমরা একদল ছেলে কাজের ঘর পরিষ্কার করছি। একটা বড় 'ডেস্ক্' ছিল অনেকগুলি ড্রয়ারওয়ালা,

ছেলেদের ব্যবহারের জন্য। সেটা সরিয়ে ঝাঁট দেবার সময় পাওয়া গেল মামা'র ছবি। ছুঁচোতে টেনে নিয়ে কেটে নষ্ট করে ফেলেছে। তখন সেই ছবি কাঁধে নিয়ে শোকযাত্রা হয়েছিল হস্টেলের চারদিক ঘুরে ঘুরে হরি ধ্বনি দিয়ে।

কলাভবনের আলাদা রান্নাঘর ছিল। আমরা নিজেরাই সব ব্যবস্থা করতাম। প্রত্যেক মাসে একজন করে ম্যানেজার হতো ছাত্রদের মধ্য থেকে। মামা'র উপর যখন ভার পড়ত তখন দেখতাম ঐ মাসটা তার ছবি আঁকা একেবারে বন্ধ হয়ে যেত। সমস্ত দিন 'কীচেন' নিয়ে ব্যস্ত। অনেক রাত পর্যন্ত দেখেছি হিসেব করছে বসে বসে পাছে হিসেবের গণ্ডগোল হয়।

এখানকার পড়া শেষ করে মামা আগরতলাতেই চলে যায় ওখানকার কোন স্কুলে কাজ নিয়ে। কিছুদিন আগে মারা গেছে। ঠিক তার আগেই এখানে এসে সকলের সঙ্গে দেখা করে গেল।

৺সোমেন রায় (লেদু)—ছোটোখাটো মানুষ। আমাদের একই বছরের ছাত্র। তখনকার শান্তিনিকেতনের বিখ্যাত নেপালচন্দ্র রায়ের ভাইপো। বেশিদিন ছবি আঁকে নি, পরে রথীবাবুর কাছে চামড়ার কাজ শিখত আর 'ফটো' তুলত। জাপানে গিয়েছিল একবার কি শিখতে মনে নেই। এখানেই খুব ভালো যুযুৎসু শিখেছিল। পরে বাইরে কোন কোন জায়গায় চাকরি করে শেষে শ্রীনিকেতনের শিক্ষাচর্চায় হাতের কাজ শেখাত। কিছুদিন আগে মারা গেছে।

নরেন্দ্র—গুজরাটের ছেলে নরেন্দ্র। পদবীটা মনে নেই। খুব অল্পদিন ছিল। ভাল গান গাইত। তার করা একটা ফ্রেস্কো শিশুবিভাগের বারান্দায় আছে। মশাল হাতে একটি মেয়ে।

কানাই সামন্ত—কানাইবাবু বোলপুর থেকে যাতায়াত করতেন। ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়ে পরে লেখকই হয়েছিলেন। মাস্টারমশাই'র ছবি সম্বন্ধে অনেক কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। অনেক বই লিখেছেন বিশেষ করে আর্টের ওপর। খুব সরল প্রকৃতির মানুষ। কানাইবাবুর বিকট হাসি মনে রাখার মত। মাস্টার-মশাই বলতেন, "কানাই'র হাসি শুনে ঝোপের পাখীগুলি ফড় ফড় করে উড়ে পালায়।" কানাইবাবু পরে কোলকাতায় বিশ্বভারতী'র প্রকাশনা বিভাগে কাজ করতেন এবং তারপর শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রসদনে। এখন অবসর গ্রহণ করেও রবীন্দ্রসদনের সঙ্গে যুক্ত আছেন।

সত্যেন জানা—সত্যেন জানা মেদিনীপুরের লোক। আমি এসে বছরখানেক পেয়েছি। সবাই জানামশাই ব'লে ডাকত। কালো বেঁটেখাটো। পিকনিকে জান মশাই'র "ঝরা পাতাগো" গানের সঙ্গে বালি ছড়িয়ে ছড়িয়ে নাচ অনেকেরই মনে আছে। নাচতে উঠে জানামশাই বলেন, "ঝরাপাতা পাব কোথায়?" মাসোজী পকেট ভর্তি করে বালি দিয়ে দিলেন। তাই ছড়িয়ে ছড়িয়ে জানা-মশাই নাচলেন, "ঝরা পাতা গো আমি তোমারি দলে"। সেই দৃশ্যের কথা ভাবলে এখনও হাসি পায়। জানামশাই'র আর একটি ঘটনা। রাজগীরে সেবার 'এক্সকাশন'। মাসোজীর একটা ছোট বন্দুক (বোধ হয় পাখী মারা) ছিল। সেটা নিয়ে একদিন শিকারে গেছেন মাসোজী, জানামশাইও তাঁর সাথী হলেন। সকালে বের হয়ে সন্ধ্যাবেলা ফিরলেন দুজনে। আমরা সব 'ক্যাম্পফায়ারে' ব্যস্ত। হঠাৎ দেখা গেল, মাসোজী কম্বলে মোড়া পিঠে ক'রে কি একটা বয়ে আনছেন। নিশ্চয়ই কিছু একটা শিকার ক'রে এনেছেন। আমরা ত হৈ হৈ ক'রে উঠেছি। ধপাস করে ফেললেন পাথরের উপরে। "উঃ বড্ড লাগল যে!" ব'লে লাফিয়ে বের হলেন কম্বলের ভেতর থেকে কোঁকাতে কোঁকাতে জানামশাই। আমরা হেসে অস্থির।

যদুপতি বসু—যদুপতিবাবু আমাদের অনেক আগেই এসেছেন। ছবির হাত ভালো ছিল। কথা খুব কম বলতেন। খুব গম্ভীর প্রকৃতির। সকলের কাছ থেকে একটু দূরে সবে থাকতেই যেন ভালবাসতেন। একটা ঘটনা মনে পড়ে। একবার সত্যনারায়ণ নামে একটি ছেলে কুয়োর থেকে জল তুলে স্নানের সময় যদুপতিবাবুর গায়ে এক বালতি জল ছুঁড়ে দিয়েছিল। যদুপতিবাবু রেগে গিয়ে বলেছিলেন, "এবার থেকে গম্ভীর হতে হবে"। আমরা সবাই খুব হেসেছিলাম।

শিয়ার্সন পল্লীর পেছনের মাঠে একবার ক্যাম্প করা হয়েছিল। সব ছেলেরা আছি তাঁবুতে যদুপতিবাবু ছাড়া। তিনি যাননি। একদিন সকালে দেখা গেল দূর থেকে আসছেন যদুবাবু, আবার একটুক্ষণ পরেই দেখা গেল মাঝ-রাস্তা থেকেই ফিরে চলে যাচ্ছেন। তাই দেখে মাস্টারমশাই একটা কার্ড এঁকেছিলেন। তলায় লিখে দিয়েছিলেন 'যদুর পলায়ন'! যদুপতিবাবু বিশ্বভারতীতেই পাঠভবনে এবং পরে শিক্ষাসত্রে ড্রইং-শিক্ষক ছিলেন। এখন অবসর গ্রহণ করে এখানেই বসবাস করছেন।

গোবর্ধন পাণ্চাল—গুজরাটের ছেলে। নাচের দিকে বিশেষ ঝোঁক ছিল। চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যে অংশ গ্রহণ করেছিল এবং শান্তিনিকেতন পার্টির সঙ্গে কোন কোন জায়গায় গিয়েছিল। এখানকার পাঠ শেষ করে দিল্লীতে ভালো কাজ নিয়ে চলে যায়।

এ. পেরুমল—পেরুমল ছবি আঁকত ভাল। জীব-জন্তু এবং ফুলের 'স্টাডি' খুব ভাল। খেলার মাঠের পাশে পুকুরের ধারে ওর হাতের করা একটা হাতী আছে সিমেন্টের। সেই থেকে ঐ পুকুরের নাম হয়েছে হাতী-পুকুর। তাছাড়াও কলাভবনের কালোবাড়ির হস্টেলে এবং অন্যান্য জায়গায়ও অনেক কাজ আছে। পেরুমলের তোলা এখানকার নানারকম ফুল, গাছ এবং পাখীর রঙ্গীন 'ফিল্ম' দেখবার মত জিনিস। এখানকার পাঠ শেষ করে কলাভবনেই অধ্যাপনা করতেন। সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করেছেন।

৺রামেশ্বর প্রসাদ শুক্লা—শুক্লা বলেই ডাকতাম সবাই। খুব লম্বা চওড়া স্বাস্থ্যবান ছেলে। বাড়ি উত্তরপ্রদেশ। প'চাত্তরখানা থেকে একশখানা রুটি খেত মেলায়। আমাদের কলাভবনের ছোট রান্নাঘরে অত রুটি দেওয়া সম্ভব ছিল না বলে পরে 'জেনারেল কিচেনে' খেত। সেখানে অত খেতে গেলে বেশি পয়সা দিতে হবে বলায় রথীবাবুর কাছে গিয়ে বলেছিল, "শিশুবিভাগের ছেলেরা কম খায় তার জন্য কি তাদের কাছ থেকে কম টাকা নেওয়া হয়? আমার স্বাভাবিক খাওয়া এই। আমার কাছ থেকে কেন বেশি টাকা নেওয়া হবে?" তারপর অবশ্য আর বেশি টাকা নেওয়া হয়নি। একবার 'এক্সকার্শনে' বড় বড় খুব মোটা করে লুচি করা হয়েছিল। আমরা নাম দিয়েছিলাম 'লোচা'। আমাদের মধ্যে একমাত্র শিবুই জোর করে বারোখানা খেয়েছিল। তাছাড়া অন্য সবাই দুতিনখানার বেশি খেতে পারে নি। শুক্লা খেয়েছিল ছত্রিশখানা, আরও চেয়েছিল কিন্তু আর ছিল না বলে দেওয়া যায় নি।

এক 'মি স্টবুড়ো' রোজ বিকেলে দুটো বড় বড় লাল ও সাদা টিনের চোঙ্গা করে দুরকম মিষ্টি নিয়ে আমাদের হস্টেলে আসত। রসগোল্লা আর পানতুয়া। এক একদিন শুক্লা একাই তা শেষ করে দিত। যেমন খেতে পারত গায়ে শক্তিও ছিল তেমনি। এক্সকার্শনের সময় বড় বড় তাঁবু একাই বয়ে নিয়ে যেত 'ওভার ব্রীজ' পেরিয়ে। ট্রেনে অন্য যাত্রীরা জায়গা নিয়ে গোলমাল করলে বলত, "বাহার ফেক্ দেগা"। ভয়ে আর কেউ কথা বলত না ঐ চেহারা দেখে।

একবারের একটা বেশ মজার ঘটনা বলি। খেলার মাঠের ওপর দিয়ে যাতায়াত বন্ধ করার জন্য খুঁটির উপর একটা করে বাঁশ বেঁধে দেওয়া হয়েছে পায়ে চলা পথের দু' ধারে। একদিন শুক্লা সেটা লাফিয়ে পেরিয়ে যাবার সময় তনয়দা (৺তনয়েন্দ্রনাথ ঘোষ) দেখে বললেন, "এই শুক্লা, দেখতে পাচ্ছ না বাঁশ বাঁধা আছে, ওখান দিয়ে যাচ্ছ কেন?" শুক্লা উত্তর দিয়েছিল, "আরে মসাই (মশাই) ওটা গোরুর জন্য, মানুষের জন্য নয়। মানুষের জন্য হলে লিখে দিলেই হয়, বাঁশ বাঁধবার দরকার হয় না।"

কয়েক বছর থাকার পর যতদূর মনে পড়ে শুক্লা লখনৌতে চলে যায় কোনও স্কুলে 'ড্রইং' শেখাবার কাজ নিয়ে। এর অনেক পরে দুই একবার এসেছিল এখানে। খুব রোগা হয়ে গিয়েছিল আর খেতেও পারত না একেবারেই। কিছুদিন আগে মারা গেছে।

আবদুল গনি খাঁ—আবদুল গনি খাঁ সীমান্ত গান্ধীর ছেলে। 'উড্ কার্ভিং' শিখতে এসেছিল মাস্টারমশাইর কাছে। খুব প্রাণবন্ত ছিল। সব সময় জমিয়ে রাখতে পারত। আসবার সময় একটা খুব সুন্দর বড় কুকুর নিয়ে এসেছিল। কুকুরটি ওর ভাষা বুঝত। রুটি সামনে দিয়ে বলত, "মা", কুকুরটা খেত না, চুপ করে বসে থাকত রুটির দিকে তাকিয়ে। কিছুক্ষণ পরে বলত, "ওয়ালা" তখন কুকুরটা রুটি খেয়ে ফেলত। আমি গনিকে বলতাম, "ও আমার কথাও শুনবে।" খেতে দিয়ে বললাম, "না"। কুকুরটা খেল না। কিছুক্ষণ পরে বললাম সীলেটি ভাষায়, 'খাইলা' (আমার বাবা সীলেটে চাকরি করতেন ব'লে আমার সীলেটের ভাষা জানা ছিল)। কুকুরটা ওমনি খেয়ে নিল। কুকুরটার নাম ছিল 'সীন'। পরে সীনকে আর যত্ন করত না বলে রাস্তার কুকুর হয়ে গিয়েছিল।

এক জার্মান সাহেব 'এপিডায়াস্কোপের' সাহায্যে আর্টের উপর কয়েকটা 'লেকচার' দেবেন পরপর কলাভবন মিউজিয়ামে। প্রথমদিন মিউজিয়ামে ঢোকার সময় তখনকার প্রথামত ওঁকে বলা হ'ল জুতো খুলে ঢুকতে, কিন্তু তিনি তা শুনলেন না। পরের দিন আমরা সবাই মিলে ঠিক করলাম, এর প্রতিবাদে 'লেকচার' আরম্ভ হবার আগে আমরা সবাই বেরিয়ে আসব 'হল' থেকে। তার আগে আমাদের সবার হয়ে প্রতিবাদ করবে গনি খাঁ কারণ ও ভাল ইংরেজী বলতে পারত। বলা সত্ত্বেও সেদিন জুতো খুললেন না ভদ্রলোক; কথামত তাই হ'ল। 'লেকচার'

আরম্ভ হবার আগে গনি উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানাল আর আমরা সঙ্গে সঙ্গে সবাই বেরিয়ে এলাম। শুনেছি সাহেব রেগেমেগে গুরুদেবের কাছে গিয়ে নালিশ করেছিলেন কিন্তু কোন ফল হয়নি। সাহেব সেই যে রাগ করে চলে গিয়েছিলেন শান্তিনিকেতন থেকে আর আসেন নি কোন দিন।

শিবকুমার দত্ত (শিবু)—শিবু ছবি বিশেষ কিছু আঁকত না। নানারকম হাতের কাজের উপর ঝোঁক ছিল। খুব ঠান্ডা মেজাজের এবং ছেলেমানুষ বলে শিবু সকলেরই খুব প্রিয় ছিল। এস্রাজ বাজাত এবং শান্তিনিকেতন পার্টির সঙ্গেও অনেক জায়গায় গেছে। এখন বম্বেতে আছে।

শান্ত বসু—ছবির হাত ভালো ছিল। বেশ প্রাণবন্ত ছেলে। কাশীতে ছিল কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে। সম্প্রতি মারা গেছে।

শান্তি গুহ—শান্তি গুহ মইমনসিংএর ছেলে। ঠান্ডা প্রকৃতির। এখন কোথায় আছে জানা নেই।

ইদ্রিসিং—সিংহলের ছেলে ইদ্রিসিং। এখানে সেতার শিখবে বলে এসেছিল। সদা হাসি মুখ। বেলা ন'টার আগে ঘুম থেকে উঠত না। গুরুদেবের সাথে দেখা করতে যাবে। আমাকে বলল দু'একটা বাংলা কথা শিখিয়ে দিতে। আমি একটা কথাই শিখিয়ে দিয়েছিলাম অতি কষ্টে। "খুব ভালো" গুরুদেব ওকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তোমার শরীর এখানে কেমন আছে?" "কুব বাল"। "এখানে তোমার কেমন লাগছে?" "কুব বাল"। ও কিন্তু গুরুদেবের কোনও কথারই অর্থ না বুঝেই উত্তর দিয়েছিল কারণ মাত্র কয়েক-দিন হয় ও এসেছে। গুরুদেব খুব খুশি। এর মধ্যেই বেশ বাংলা শিখে গেছে! কিছুদিন পর এখান থেকে চলে যায় লখনৌ 'ম্যারিস' কলেজে। সেখানকার শিক্ষা সমাপ্ত করে ৺ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের কাছে চলে যায় মাইহারে। খাঁ সাহেব ওকে খুব স্নেহ করতেন। কয়েক বছর তাঁর কাছে শিক্ষা লাভ করে দেশে ফিরে যায়। মাঝে বার দুই এসে সকলের সঙ্গে দেখা করে গেছে।

মন্মথ রায়—মইমনসিং-এর ছেলে। খুবই লাজুক প্রকৃতির। সহজে সকলের সামনে বের হত না। কেউ ঠাট্টা করলে খুবই অস্বস্তি বোধ করত। এখন কাশীতে আছে কোনও স্কুলে।

তখন এইরকম আরও অনেকে এসেছিল ক্রমে ক্রমে। কৃষ্ণ কাকর (পাঞ্জাবের) সুজিত (মইমনসিং-এর), দেবব্রত সোম, বোধহয় ঢাকার। ভালো ফুটবল খেলত।

বিখ্যাত 'ফুটবল প্লেয়ার' বাঘা সোমের ভাইপো। দেবরাজ শেঠি মোক্ষদা বড়ুয়া, সত্যনারায়ণ। সত্যনারায়ণ খুব ব্যায়াম করত এবং স্বাস্থ্য খুব ভাল ছিল। রোজ সকালে কুয়োর জল তুলে ব্যায়াম করা ওর একটা নিয়ম ছিল, আগে বলেছি। আমরাও সুযোগ বুঝে সেই সময় স্নানে যেতাম আরও ও জল তুলে আমাদের গায়ে ঢেলে দিত। জল তোলায় পরিশ্রমটা আমাদের বেঁচে গেল।

মাকি সান—জাপানী ছেলে। নাচ শিখতে এসেছিল। একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। দুই একজন যারা সঙ্গীত শিখতে আসত কলাভবন হস্টেলেই থাকত তারা। গুরুদেবের শ্রাদ্ধের সময় যে 'বাল্মীকি প্রতিভা' হয়েছিল তাতে সে প্রধান দস্যুর ভূমিকায় অভিনয় করেছিল আর ওর গানগুলি আমি গেয়েছিলাম। অভিনয় খুব ভাল হয়েছিল ওর। খুব পরিশ্রমী ছেলে ছিল। সমস্ত দিন ধরে এটা ওটা করছে। কখনও বসে থাকতে দেখিনি। যুদ্ধের সময় ওকে ধরে নিয়ে গেল একদিন।

যমুনা বসু (সেন)—মাস্টারমশাইর ছোট মেয়ে। আমরা প্রায় একই সময় ভর্তি হই। ছবির হাত যেমন ভালো তেমনি নাচে খুব নাম করেছিল। চিত্রাঙ্গদা যখন প্রথম হয় কুরূপা চিত্রাঙ্গদার ভূমিকায় যমুনাই অভিনয় করেছিল। "রোদন ভরা এ বসন্ত" গানের সঙ্গে অত সুন্দর নাচ ওর মত নাচতে আর কাউকে দেখলাম না। বসন্ত সিং নামে একজন মণিপুরী নাচের শিক্ষক খুব অল্প-দিনের জন্য এসেছিলেন। তিনিই শিখিয়েছিলেন ঐ নাচটি। নাচের ভেতর দিয়ে অমন 'এক্সপ্রেশন' আর কারও দেখিনি। ছবি ছাড়াও নানারকম হাতের কাজেও অতি পাকা। কলাভবনে হাতের কাজের শিক্ষিকা ছিল। সংপ্রতি অবসর গ্রহণ করেছে। এখনও বাড়িতে বসে নানারকম হাতের কাজ করে বিশেষ করে সুতো দিয়ে হাতে বুনে নানা রঙের পুঁতি বসিয়ে অপূর্ব গয়নার কাজ, দেখবার মত।

সাবিত্রী গোবিন্দ (কৃষ্ণান)—কলাভবনের ছাত্রী হিসেবেই ছিলেন। ছবি বড়ো একটা আঁকতে দেখিনি। গানই ছিল ওঁর প্রধান। গানের অপূর্ব গলা শুনেই অ্যাডায়ার থেকে গুরুদেব নিয়ে এসেছিলেন শুনেছি। অবাঙালী হ'লেও ভালো বাংলা বলতে শিখেছিলেন। গুরুদেবের অনেক কঠিন কঠিন গান তাঁর গলায় খুবই ভালো লাগত। সাবিত্রীদির অনেক কর্ণাটকী গানের সুর নিয়ে গান বেঁধেছিলেন গুরুদেব। যেমন—"তুমি কিছু দিয়ে যাও",

"বেদনা কি ভাষায়রে", "বাসন্তী হে ভুবনমোহিনী", "বাজে করুণ সুরে" প্রভৃতি গান। একেবারে গান পাগল ছিলেন। একবার আরম্ভ করলে একটার পর একটা গেয়ে যেতেন। এখন ক্যানাডায় মেয়ের কাছে আছেন।

গীতা রায়—ভাল ছবি আঁকতেন গীতাদি। এঁরও গানের গলা ছিল, তবে গাইয়ে বলে পরিচিতা ছিলেন না নানারকম হাতের কাজ খুব ভালো ছিল বিশেষ করে খুব সুন্দর পুতুল তৈরিতে একেবারে ওস্তাদ ছিলেন। আজকাল অনেকেই এই ধরনের কাজ করেন কিন্তু এঁর কাজ যেন একেবারে অন্যরকম ছিল। বিদেশী কোন ছাপই গীতাদির পুতুলে ছিল না। সম্পূর্ণ দেশী ঢং। গীতাদির প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে স্বভাবতই তাঁর স্বামী প্রশান্তদা'র কথা এসে পড়ে। প্রশান্তদা উঁচুদরের শিল্পী ছিলেন। প্রধানতঃ ৺অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে শিখেছেন ওঁর সব ছবিই প্রায় 'ওয়াশ' টেকনিকে এবং বহু ছবি এঁকেছেন। প্রশান্তদাও নানারকম সব খেলনা তৈরি করতেন। বিশেষ করে মনে পড়ে ওঁর একটা রেলগাড়ির কথা। ইলেকট্রিকে চলত। সংপ্রতি একবছর অন্তর দুজনেই মারা গেছেন। বলার কথা, এসব হাতের কাজ কারও কাছ থেকেই শেখেন নি এঁরা।

মন্দিরাদি—মন্দিরাদি কলাভবনেই ছিলেন তবে ছবি আঁকতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। এঁরও সাবিত্রীদির মত গানই ছিল প্রধান। খুবই ভালো গাইতেন। কিছুদিন পর চলে যান।

নিবেদিতা ঘোষ (বসু)—এখানকার প্রখ্যাত শিক্ষক ৺তনয়েন্দ্রনাথ ঘোষের মেয়ে এবং মাস্টারমশাইর পুত্রবধূ নিবেদিতা। ছবির হাত ভালো। ভালো নাচতে পারতো। চিত্রাঙ্গদা যখন প্রথম মঞ্চস্থ হলো তখন অর্জুনের ভূমিকায় ছিল নিবেদিতা এবং দলের সঙ্গে অনেক জায়গায় গেছে। নিবেদিতার নানারকম কাজের মধ্যে বাটিক এবং পোরসিলিনের কাজ উল্লেখযোগ্য।

নিভাদি নাম চিত্রনিভা চৌধুরী। খুব ভালো আঁকতেন। ছবি করতেন খুব যত্ন করে। কথা কম বলতেন এবং লাজুক প্রকৃতির ছিলেন। বিবাহিতা ছিলেন বলে আমরা অনেকেই নিভাবৌদি বলে ডাকতাম।

মণিকা সেন—ছবি আঁকা ছাড়াও গান গাইতেন এবং শান্তিনিকেতন পার্টির সঙ্গে কোন কোন জায়গাতেও গেছেন। পরে গোয়ালিয়রে কাজ নিয়ে চলে যান।

ইন্দুলেখা ঘোষ—ইন্দুদি কলাভবনেই ছিলেন তবে ছবি আঁকতে দেখিনি কখনও। প্রধানতঃ গান শেখার জন্যই এসেছিলেন এবং তখনকার নৃত্যাভিনয়ের সব দলেই যোগ দিয়েছেন। গুরুদেবের গান ছাড়াও মীরার ভজন ভালো গাইতেন। এক সময় ইন্দুদি আর আমি খেলার ঘণ্টার সময় রোজ গুরুদেবের কাছে গান শিখতে যেতাম গুরুদেবেরই নির্দেশে। ইন্দুদি মাস্টারমশাইর খুব প্রিয় ছিলেন এবং মাস্টারমশাইর কাজের ঘরেই ওঁর বসবার জায়গা করে দিয়েছিলেন। খেতেন আমাদের কলাভবনের রান্নাঘরেই। ইন্দুদির সঙ্গে সকলেরই খুবমধুর সম্পর্ক ছিল। এখন যাদবপুরে আছেন এবং প্রায়ই অসুস্থ থাকেন কিন্তু এই অসুস্থ অবস্থাতেও পাড়ার মেয়েদের নিয়ে গানের দল করেছেন এবং মাঝে মাঝেই বৈঠক করা তাঁর নিয়মিত কাজ। অসুস্থতা সত্ত্বেও উৎসাহের অন্ত নেই।

তখনকার কলাভবনের বা অন্য ভবনেরও অনেক ছেলেমেয়ের কথা সব ঠিক মনে নেই এতদিন পরে তবুও যে কয়টি নাম আপাততঃ মনে পড়ছে তাই লিখছি। রেণুকা কর, সোনা বেন, শান্তা বেন, সুশীলা বেন, বিনোদিনী, পিনাকীন (গুজরাটী, শিক্ষাভবনের) অতি সুন্দর গুরুদেবের গান গাইতেন। ছেলেদের গলায় এত ভালো গুরুদেবের গান খুব কম শুনেছি। শরদিন্দু সিংহ—নাচতে পারত। একবার 'তাসের দেশে' সওদাগরের ভূমিকায় অভিনয় করেছিল। শ্রীমতী রাজেশ্বরী বাসুদেব (দত্ত)—নামকরা গায়িকা হয়েছিলেন। এখন আর বেঁচে নেই।

॥ ৪ ॥

মাস্টারমশাই (শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু) ১৯১৯ সনে কলাভবনের অধ্যক্ষ হয়ে শান্তিনিকেতনে আসেন। আশ্রমের অনেক অধ্যাপকদের আমরা মাস্টারমশাই বলে সম্বোধন করলেও মাস্টারমশাই বলতে নন্দবাবুকেই বোঝাত একথা আগেই বলেছি।

মাস্টারমশাই সম্বন্ধে বলে শেষ করা যায় না। শুধু ছবি আঁকার শিক্ষক নন, জীবনের সবচেয়ে বড় নানারকম শিক্ষা পেয়েছি তাঁর কাছ থেকে। কলাভবনে আমরা শুধু ছবি আঁকাই শিখিনি। ছবি আঁকার ভেতর দিয়ে প্রকৃত শিক্ষা পেয়েছি কিন্তু কি আনন্দের মধ্য দিয়ে! এখানে একটা কথা বলা

প্রয়োজন। আমার এখানকার শিক্ষাজীবনে কলাভবনের অন্যান্য শিক্ষকদের অবদানও বিরাট। এইসঙ্গে স্মরণ করি আশ্রমের অন্যান্য গুরুজনদেরও। তাঁদের কাছ থেকেও কম শিখিনি কম পাইনি। আর শিখেছি সহপাঠী ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে। কি শিখেছি ঠিক বলতে পারব না কারণ নিয়মিত ক্লাসের শিক্ষা একরকম আর নিয়মিত ক্লাসের বাইরের শিক্ষা একরকম। আমার ধারণা নিয়মিত ক্লাসের বাইরের যে শিক্ষা সেটা অনেক বেশী স্থায়ী। নিয়মিত ক্লাসের বাইরের শিক্ষা বলতে পিকনিক, এক্সকার্শন, নাটক, অভিনয়, নানা উৎসব অনুষ্ঠান ইত্যাদির যে কত বড় অবদান তা বলে বোঝান যায় না। যাঁরা এইসবের ভিতর দিয়ে শিক্ষালাভ করেছেন একমাত্র তাঁরাই এর মূল্য উপলব্ধি করতে পারবেন। আর একটা প্রধান জিনিস এখানকার সম্পদ সেটা হল, এখানে সকলের সঙ্গেই একটা সহজ আত্মীয়তার সম্পর্ক যেটা শুধু নিয়মিত ক্লাসেই স্থাপিত হ'তে পারে না। এখানকার আলো-বাতাস, আকাশ, গাছপালা ইত্যাদির মধ্যে এমন একটা জিনিস আছে যার এই সব কিছুর মধ্যেই একটা বড় অবদান আছে। এই সবের জন্যই একবার যাঁরা শান্তিনিকেতনে শিক্ষালাভ করে যান, দেখেছি এখানকার এক অদৃশ্য টানে তাঁদের বারবার এখানে আসতে। হয়তো এই জীবনকে তাঁরা কখনও বিস্মৃত হন না। কোনও দিন পুরানো হয় না। এখনও দেখতে পাই বহু বৃদ্ধকে এখানে আসতে পৌষ উৎসবের সময় বা দোলের সময় অথবা কোন উৎসব অনুষ্ঠান ছাড়াই। কতদিন আগে তাঁরা এখানে ছাত্র ছিলেন! এই প্রসঙ্গে শান্তিনিকেতনের এক প্রাক্তন অবাঙালী ছাত্রীর উক্তি মনে পড়ল। সে এখানকার সম্বন্ধে বলেছিল, "There is something devil charm in this placc."

তখনকার শান্তিনিকেতনের নানা উৎসবের যেমন বৃক্ষরোপণ, বসন্তোৎসব, হলকর্ষণ এবং নাটক অভিনয়ের সাজসজ্জার পরিকল্পনা সবই মাস্টারমশাইর। এখানকার নাটকের নানারকম সাজসজ্জায় প্রতিমাদেবীরও অবদান আছে অনেক। উৎসবের আগে একটা যেন প্রাণসঞ্চার হ'ত শান্তিনিকেতনের জীবনে। উৎসবে যোগ দেবার প্রস্তুতি চলেছে প্রত্যেক ছেলেমেয়ের। মেয়েরা বাসন্তী রঙে শাড়ি ছোপাচ্ছে, ছেলেরা ছোপাচ্ছে চাদর। মালা গাঁথছে মেয়েরা, একদল আলপনা দিচ্ছে। ছেলের দল ফুল তুলছে; পদ্ম সংগ্রহ করতে সেই কোন সকালে বেরিয়ে গেছে একদল কোন দূর গ্রামে। সবাই সব উৎসবেই অতি উৎসাহভরে যোগ দিচ্ছে।

দোলের আলপনা এক ধরনের আবার বৃক্ষরোপণ, হলকর্ষণের অন্যরকম। উৎসব প্রাঙ্গণ সাজান হচ্ছে। আবার এক একটা উৎসবের আলাদা আয়োজন। বৃক্ষরোপণের জন্য শিশুবৃক্ষকে বয়ে নিয়ে যাবার জন্য দোলা সাজান, শিশু-বৃক্ষের মাথার উপরের জন্য ছাতা সাজান, যেখানে বৃক্ষরোপণ হবে সেই জায়গায় আলপনা, পঞ্চভূতের বসবাস স্থান, যাঁরা পাঠ করবেন ও যিনি বৃক্ষরোপণ করবেন তাঁদের বসবার জায়গা—এসব সাজান, প্রধান অতিথিকে মালাচন্দন দেওয়া, তারও একটা মার্জিত নিয়ম আছে। এই রকমই হলকর্ষণ অথবা বসন্তোৎসবে সাজাবার আলাদা পরিকল্পনা। এই সবের ভেতর দিয়ে যে ধরনের শিক্ষা, তা কখনও একমাত্র নিয়মিত ক্লাস করে সম্ভব? এর ভেতর দিয়ে যে রুচি তৈরী হয় তা হল নিয়মিত ক্লাসের বাইরের শিক্ষায়, যা জীবনে কখনও ভোলা যাবে না। যার সুমধুর দাগ চিরকাল মনের মধ্যে থেকে যায়। শুধু তাই নয়, আজীবন যখনই মনে পড়বে, আনন্দে ভরে উঠবে মন। এই সমস্তের পিছনেই মাস্টারমশাইর অবদান কতখানি তা বলে শেষ করা যাবে না।

নানা নাটক অভিনয়ের পোষাক পরিচ্ছদ, মঞ্চ সাজান প্রভৃতিতেও মাস্টার-মশাই ছিলেন প্রধান, এই ব্যাপারেও প্রতিমাদেবীর অবদান কম ছিল না। চিত্রাঙ্গদা, শ্যামা, তাসের দেশ, শারদোৎসব, বাল্মীকি প্রতিভা প্রভৃতি সবকিছুরই পোষাকের পরিকল্পনা প্রধানতঃ মাস্টারমশাই'র। তাসের দেশ যখন প্রথম মঞ্চস্থ হ'ল, তখনকার কথা মনে পড়ে। একদিকে মহড়া চলেছে উত্তরায়ণে আর কলাভবনে আমরা মাস্টারমশাইয়ে নির্দেশ অনুযায়ী রাজা, রাণী, ছক্কা, পঞ্জা প্রভৃতির পোষাক তৈরি করছি সীমাহীন উৎসাহে। এসবই তো ক্লাসের বাইরের কাজ। 'তাসের দেশে'র কথা বললাম এইজন্য যে এটা একটা বিশেষ ধরনের কাজ ছিল। অন্যান্য নাটকের পোষাক এইভাবে ঠিক তৈরি না হলেও সাজিয়ে যখন দিতেন এক একজনকে তার থেকেও অনেক শিখতে পারতাম আমরা। এই রকম কত বলব! বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানের সাজানর পরিকল্পনা মাস্টারমশাই'র মাথায় আসত আর আমরা তারই রূপ দিতাম তাঁর নির্দেশমত। মাস্টারমশাই যে সব পোষাক গহনা ইত্যাদি তৈরি করতেন তা অতি সাধারণ জিনিস দিয়ে। তাসের দেশে'র যে পোষাক দেখে উদয়শংকর থেকে আরম্ভ করে সবাই অবাক হ'য়ে গিয়েছিলেন তা অতি সাধারণ জিনিস দিয়েই তৈরী।

একবারের কথা মনে আছে। ভুবনডাঙ্গার বাঁধ নতুন করে কাটান হ'ল। তার উদ্বোধন অনুষ্ঠান। অত বড় বাঁধ সাজান হবে। অনেক ছোট ছোট লাল, নীল, হলুদ কাগজের নিশান তৈরী করা হ'ল। মাটির ছোট ছোট হাঁড়ি প্রচুর। তার মধ্যে কাঁকর দিয়ে নিশানগুলি পু'তে দেওয়া হ'ল আর সেই হাঁড়িগুলি দাঁড় দিয়ে বে'ধে লম্বালম্বি বাঁধের এধার থেকে ওধার তিন চার সারি খু'টির সাথে বে'ধে দেওয়া হয়েছিল। কাজটা সমাধা করা মোটেই সহজ ছিল না। রাত দু'টো আড়াইটে পর্যন্ত অন্ধকারের মধ্যে লন্ঠন জেবলে কাজ করতে খুবই কষ্ট হয়েছিল ঐ জলের মধ্যে সাঁতার কেটে কেটে। পরের দিন সকালবেলা দেখা গেল বাঁধটা যেন ঝলমল করছে। মাস্টারমশাই'র প্রেরণা ও উৎসাহ ছাড়া এই সব কাজ করা সম্ভবই হ'ত না।

আর একবার শ্রীনিকেতনের কালিসায়র নতুন করে কাটান হ'ল। তার উদ্বোধন হবে। আমি তখন শ্রীনিকেতনে কাজে ঢুকেছি। সাজাবার ভার পড়ল আমার উপর। কি করে সাজাব জানি না। গেলাম মাস্টারমশাই'র কাছে। আলপনার চারপাশে কোদাল আর ঝুড়ি দিয়ে অপূর্ব সাজান হয়েছিল অনুষ্ঠানের জায়গা তাঁরই নির্দেশে।

কালিসায়রের পাশ দিয়ে শ্রীনিকেতনে ঢোকবার নতুন রাস্তা তৈরী হল। রাস্তার উদ্বোধন হবে। এও আমার উপর ভার। আবার গেলাম মাস্টারমশাই'র কাছে। এবারের পরিকল্পনা একেবারে অন্য রকমের। সব রাস্তার প্রতীক দিয়ে সাজান হল। পায়ে হে'টে নানারকম মানুষ যাচ্ছে। কেউবা চাষী—গোরু লাঙ্গল নিয়ে; কেউবা বাউল সেজেছে; গোরুর গাড়ি বা সাইকেলে পর পর অনেকে গেল; ডাকপিওন চিঠি বিলি করতে করতে যাচ্ছে; খাবারের দোকান, পানের দোকান প্রভৃতি বসান হয়েছে রাস্তার ধারে। সবশেষে বর বিয়ে করে ফিরছে। আগে ঘোড়ার পিঠে বর, পাইক, বরকন্দাজ; কনে যাচ্ছে পালকিতে। পালকির সঙ্গে দুই ঝি, গালে পানের টিপুলি। সঙ্গে অনেকে মালপত্র বয়ে নিয়ে যাচ্ছে আর সব শেষে বাজনদাররা সানাই, ঢোল, কাঁসি বাজাতে বাজাতে যাচ্ছে। বর হয়েছিল নরেশ দেববর্মণ, কনে পরেশ সিংহ, দুর্গা ও সুজিত—দুই ঝি, এরা সবাই কলাভবনের ছেলে, শ্রীনিকেতন থেকে শুধু বাজনদারদের ভাড়া করে আনা হয়েছিল। সে যা জমেছিল!

তখন ৺সন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় শ্রীনিকেতনের সচিব ছিলেন। এই রকম নতুন নতুন পরিকল্পনা মাস্টারমশাই'র মাথায় আসত।

ক্লাসের নিয়মিত কাজের বাইরেও নানা কাজ আমরা নিজেরাও করেছি। এর মধ্যে একটা মস্ত বড় কাজের কথা বলি। হরিপুরা কংগ্রেসে সাজাবার জন্য ডাক এসেছে মাস্টারমশাই'র। কংগ্রেসের তোরণ সাজাবার জন্য বহু ছবি এঁকেছিলেন পটের আদলে এখানেই। সে কি চমৎকার কাজ! ফোয়ারার মত একটার পর একটা ছবি বেরোচ্ছে।

আমাদের, অর্থাৎ ছাত্রছাত্রীদের মনে হ'ল, মাস্টারমশাই'র নিজের হাতের এই অমূল্য কাজগুলি নষ্ট হতে দেওয়া উচিত নয়। আমরা পরামর্শ করে ঠিক করলাম, এইসব ছবি আমরা অনুকরণ করে পাঠিয়ে দেব মাস্টারমশাই'র মূল ছবিগুলি রেখে দিয়ে। সময় বেশী নেই। মাস্টারমশাই'র অনুমতি মিলল। দিবারাত্র কাজ চলেছে। সবাই আমরা কাজ ভাগ করে নিলাম। একদল কাগজ মাউন্ট করছে মেঝেতে; অনুকরণ করে ড্রইং করছে অন্য দল; কোন দল রং ভরছে আবার এক দল লাইন দিয়ে শেষ করছে। এই রকমভাবে সবার মিলিত প্রয়াসে খুব অল্পদিনের মধ্যেই সব ছবিগুলি শেষ করা গেল। মূল কাজগুলি রেখে দেওয়া সম্ভব হ'ল।

অনেক সময় নাটকের মঞ্চসজ্জা উৎসবের স্থান সাজান ইত্যাদির ভার পড়ত এক একজন ছাত্রের উপর। অন্যরা তারই নির্দেশমত সাহায্য করত মাত্র। সবশেষে কি হ'লে আরও ভালো হ'ত সেই নিয়ে আলোচনা চলত। কাজের সময় অন্য কারুর সমালোচনা মাস্টারমশাই পছন্দ করতেন না, বলতেন যে তাতে কাজের ব্যাঘাত হয়।

পরে যখন 'টেগোর পার্টি', যার নাম হয়েছিল শেষে শান্তিনিকেতন পার্টি' 'বাইরে কোন অভিনয় করার জন্য যেত তখন প্রধানতঃ মঞ্চসজ্জার নির্দেশনায় থাকতেন সুরেনবাবু (৺সুরেন কর মশাই)। মাসোজীও ছিলেন একজন প্রধান কর্মী আমরা ছেলেরা দলের সাহায্যকারী। প্রথমদিকে মাস্টারমশাই দলের সঙ্গে যেতেন। শ্রীলঙ্কা যাওয়ার সময় মাস্টারমশাই ছিলেন আমাদের সঙ্গে। একবার বোম্বাই শহরে 'বাল্মীকি প্রতিভা' হবে। প্রতিমা দেবী অনেক খরচ করে দস্যুদের পোষাক তৈরী করালেন। সেগুলি পছন্দ হল না মাস্টারমশাই'র।

কোন খরচ না করে কি করে সাজতে হবে আমাদের দেখিয়ে দিয়েছিলেন। অতি সাধারণ উপকরণ দিয়ে সে কি অপূর্ব সাজ হয়েছিল। মাস্টারমশাই যাননি সেবার। প্রতিমাদেবী ছিলেন আমাদের সঙ্গে। তাই বলছিলাম যে, নন্দলাল বসু শান্তিনিকেতনে না থাকলে যেমন পুরোপুরি নন্দলাল বসু হ'তে পারতেন না, তেমনি সেই আমলের শান্তিনিকেতনও পুরোপুরি শান্তিনিকেতন হ তে পারত না নন্দলাল না থাকলে। শান্তিনিকেতনের তখনকার যা কিছু উৎসব, অনুষ্ঠান, অভিনয় ইত্যাদি সবকিছুর ভূমিকায় কলাভবনই প্রধান, কলাভবনই তো আশ্রমের প্রাণকেন্দ্র ছিল যার উৎস মাস্টারমশাই।

এখানে একটা কথা মনে পড়ল। একবার ডাক এলো লখণৌ সরকারী আর্ট কলেজ থেকে মাস্টারমশাই'র প্রিন্সিপালের কাজের জন্য। জিজ্ঞেস করলেন বৌদিকে, "খড়ের ঘরে থাকবে, না প্রাসাদে?" বৌদি উত্তরে বলে-ছিলেন, "খড়ের ঘরই ভালো।" এ গল্প আমরা পরে শুনেছি।

তখনকার সময়ের প্রতিটি পিক্‌নিক্‌ এবং এক্সকারশনের কথা খুব আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করি এখনও। এখনকার মত এত বড় দল তো ছিল না তখন। কিন্তু ঐ অল্প লোক নিয়েই যা জমত! একবারের পিক্‌নিকের কথাই বলি। আমরা তখন গৌরিকে থাকি। হঠাৎ একদিন সকালবেলায় মাস্টারমশাই এসে বললেন, "চল, আজ অজয় ব্রীজের তলায় পিক্‌নিক্‌ হবে।" আমরা তো অবাক, বললাম, "সে কি কথা? কোনো জিনিসপত্রের যোগাড় নেই, কি করে হবে?" মাস্টারমশাইব উক্তি হ'ল, ' তোমরা আজ খাবে না? সেই সব চালডাল আর কিছু কাঠ নিয়ে গোবুর গাড়ি করে চলে এসো, আমি মেয়েদের আর বিনোদকে (বিনোদদা) নিয়ে চলে যাচ্ছি।" তিনি এই বলে চলে গেলেন। আমরা তাঁর কথামতো গোরুর গাড়িতে সব জিনিসপত্র নিয়ে গেলাম। সেই পিক্‌নিক্‌ যা জমেছিল! গানের পর গান আর নানারকম খেলা বালির উপর। মেয়েরা বালি দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে মস্তবড় দুর্গ তৈরি করছে। দুজন জার্মান সাহেব আমাদের সঙ্গে গিয়েছিলেন, তাঁরা এদিকে একেবারে নদীর ধার থেকে বালি খুঁড়ে খুঁড়ে সুড়ঙ্গ তৈরি করছেন। মতলব, নদীর জল ঐ সুড়ঙ্গ দিয়ে চালিয়ে এসে দুর্গটি ভেঙ্গে দেবে। কেউ জানে না সে কথা। অত দূর থেকে স ড়ঙ্গ তৈবি কবতে অ ক সময় লাগছে। এদিকে এত বড় সুন্দর দুর্গ তৈরি শেষ। হঠাৎ মাসোজী ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মেয়েদের বলে দিলেন।

এবং তখন মেয়েরা সাবধান হয়ে গিয়ে মস্ত বড় বাঁধ দিয়ে দিল দুর্গের সামনে। সাহেবদের মতলব ভেস্তে গেল।

ব্রীজের উপর দিয়ে বেড়াতে যাবার সময় শরদিন্দুর চটি পড়ে গিয়েছিল ব্রীজের থামের উপরে। কি করে তা উদ্ধার করা যায়? মাসোজীর বুদ্ধিতে থামের ধারে যারা বেশী লম্বা সেই রকম পাঁচজন বসল প্রথম, তার উপর তিন-জন, আবার তার উপর দুজন আর সবার উপর মিঃ কোঠারে। সমস্ত দলটাই দাঁড়াল থাম ধরে মিঃ কোঠারে যখন কোনরকমে থামের ধার ধরে চটি পাড়তে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময় নীচের সমস্ত দলটি বসে পড়ল আর মিস্টার কোঠারে দুই হাতে ধরে ঝুলছেন আর চিৎকার করছেন। সে এক দৃশ্য! পরে অবশ্য সবাই দাঁড়িয়ে উঠে উদ্ধার করল মিঃ কোঠারেকে। এই সবই মাসোজীর মাথার থেকে বেরোল। হেসে গড়াগড়ি সবাই।

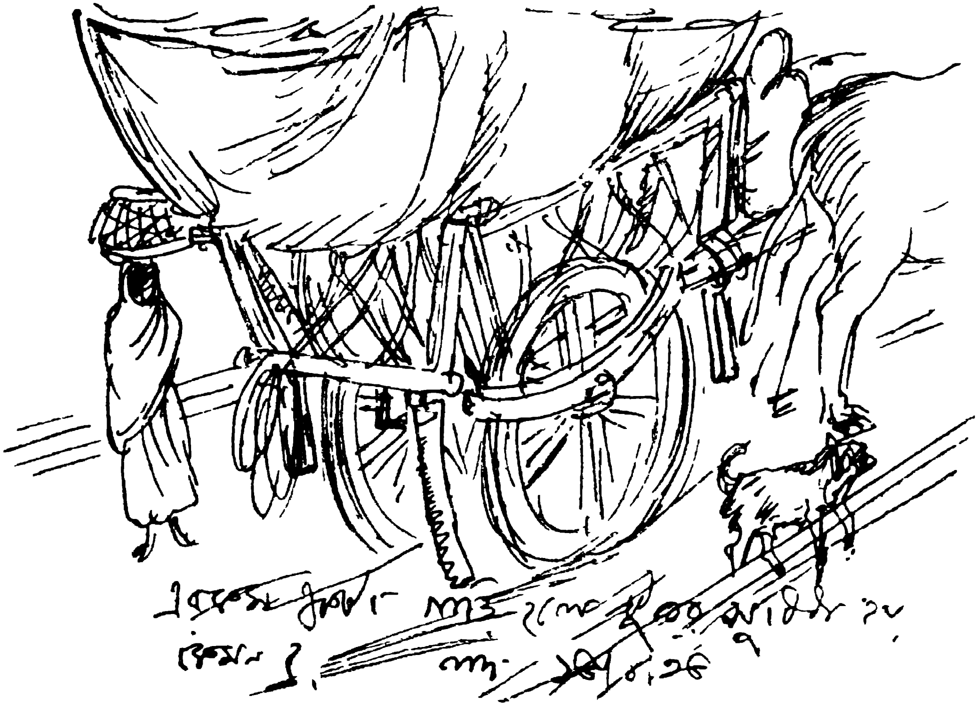
এই মিঃ কোঠারের একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। ছোটখাট মানুষ, গেরুয়াধারী শিল্পী মিঃ কোঠারে এসেছিলেন কলাভবনে আমাদের 'পার্সপেক্টিভ্' শেখাতে। তিনি নাকি ইটালিতে বহু বছর ছিলেন ও সেখানে ছবি আঁকা শিখেছেন। তাঁর কথা কেউ বিশ্বাস করত না, কারণ নিজে কখনও আঁকতেন না। ওঁর মৌখিক নির্দেশ অনুসারে সকলকে ছবি আঁকতে হবে। নিজের হাতে কাউকে কিছু দেখাবেন না। ওঁর শিক্ষা দেবার পদ্ধতি হল, বোর্ডের সামনে কোনো ছেলেকে দাঁড় করিয়ে নিজে মৌখিক নির্দেশ দিতেন—ছেলেটি সেই নির্দেশ অনুযায়ী এঁকে যেত। এইভাবে কোনও একটা ছবি দাঁড়িয়ে যেত। ছেলেটির নিজের ভাবনার কোন বালাই থাকত না ছবি সম্বন্ধে। কলের মত এঁকে যেত মাত্র। এই নিয়ে একটা ঘটনা ঘটল। মাস্টারমশাই মিঃ কোঠারেকে বললেন, "এটা ম্যাজিক। তুমি আর্টিস্ট হলে এটা করতে না, আসলে তুমি আর্টিস্টই নও।" ভীষণ চটে গেলেন ভদ্রলোক। বললেন মাস্টারমশাইকে, "তুমি কুয়োর ব্যাঙ। শান্তিনিকেতনে থেকে ভাবছ সব কিছু জানো।" গৌরিকের কাছে যে ছোট্ট খড়ের ঘরটিতে থাকতেন, সেখানে অনশন আরম্ভ করলেন। আমরা গেলেই চিৎকার করে উঠতেন, "রাইফেল নিয়ে এসে গুলি কর আমাকে।" পরে অতি কষ্টে তাঁকে খাওয়াতে পারা গিয়েছিল। তারপরই শান্তিনিকেতন থেকে চলে গিয়েছিলেন। আর কোনোদিন আসেন নি।

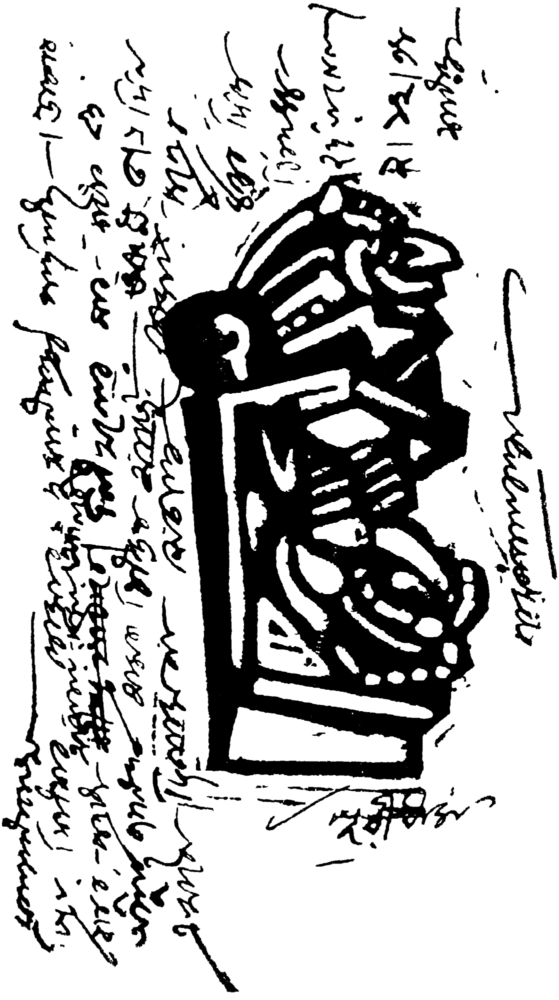
সেই অজয়ের ধারে পিক্‌নিকে সব চাইতে মনে রাখার মত ঘটনা, নদীর একেবারে জলের ধারে ভিজে বালি দিয়ে মাস্টারমশাই'র তৈরী বিরাট আকারের শোয়া বুদ্ধমূর্তি। আমরা সব বালি জড় করে দিচ্ছিলাম। সে কি আশ্চর্য সুন্দর কাজ। এখনও মনে দাগ কেটে আছে। ফেলে আসতে কষ্ট হচ্ছিল। নিয়মিত ক্লাসে এসব কাজ বা শিক্ষা কি সম্ভব ?

এই রকম প্রায় প্রতিটা পিক্‌নিকের কিছু কিছু ঘটনা মনে গেঁথে আছে আজও। গোয়ালপাড়ায় কোপাই নদীর ধারে, অজয় ব্রীজের নীচে, সেমাইদহে, চাঁদের আলোয় খোয়াইতে, সব পিক্‌নিকের কথা কখনও ভুলব ? একদল রান্না করছে, কোনদল তরকারী কুটছে, গানের পর গান চলেছে এক দলের মাসোজী আর শান্তিদার এস্রাজের সঙ্গে। খেলাতে মেতেছে অনেকে, কোন কোন ছেলে বা মেয়ে স্কেচ্ করছে গাছের তলায় বসে। মাস্টারমশাইর কার্ড আঁকা ত সব সময়েই চলেছে। কোন পিক্‌নিকেই খাওয়ার আড়ম্বর থাকত না। সাধারণত: খিচুড়ি, একটা ভাজা ও চাটনি। সকালে মুড়ি ও আলুর চপ্ এবং সঙ্গে চা। বিকেলে আবার চা খেয়ে দল বেঁধে সবাই একসঙ্গে ফিরে আসা গান গাইতে গাইতে। অধ্যাপকরাও সবাই সঙ্গেই থাকতেন। সেই গোয়ালপাড়া বা অন্যান্য পিকনিকের জায়গা থেকে "আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল গানের সঙ্গে নাচতে নাচতে একেবারে উত্তরায়ণের সামনে এসে থামা। এত আনন্দের কথা কখনও ভোলা যায় !

এক্সকার্শনে আমরা অনেক জায়গায় গেছি, এই এক্সকার্শন হতো প্রতি বছর পৌষমেলার পর। রাজগীরে যাওয়া হয়েছে অনেক বার। এছাড়া আমরা গেছি কাহাল গাঁ, বিক্রমশীলা, রাজমহল, ভীমবাঁধ, হেভেলি খড়্গপুরের হ্রদের ধারে, সামাইদহ প্রভৃতি জায়গায়। সব জায়গাতেই ক্যাম্পে সব কাজের ভার নিজেদের মধ্যে ভাগ ক'রে নেওয়া হতো। কলাভবনের নিজস্ব একটা তাঁবু ছিল। তাছাড়া আরও তাঁবু যা দরকার হতো তা চেয়ে নিয়ে যাওয়া হতো অন্য জায়গা থেকে। তাঁবুর তলায় খড় বিছিয়ে দেওয়া হতো। বেশির ভাগ জায়গায় তাঁবুতেই থাকা হ'ত।

কলাভবনের এই নিজস্ব তাঁবুর একটা ইতিহাস আছে। তখনকার দিনে পৌষমেলার সময় আমরা কলাভবনের ছাত্রছাত্রীরা কার্ডে এঁকে একটা ছবির দোকান দিতাম। তখন মেলা হতো উত্তরায়ণের পূর্বদিকের মাঠে আর আমাদের





লেখকের কাছে মাস্টারমশায়ের লেখা চিঠি

দোকান হতো মন্দিরে ঢোকার গেটের বাইরে। তালপাতার বেড়া আর টিনের চাল। কার্ডের দাম হতো চার ছ'আনা করে। প্রতি বছরই মেলার বেশ কিছুদিন আগে থেকে এই কার্ড আঁকা চলত। একবার বাচ্চুভাই শুক্লা নামে এখানকারই এক গুজরাটী ভদ্রলোক সমস্ত কার্ড কিনে নিলেন। টাকার অংকটা মনে নেই তবে ঐ টাকা দিয়েই এই তাঁবু কেনা হয়েছিল।

মাস্টারমশাইর উপর ভার ক্যাম্প পরিদর্শনের। প্রতিদিন ঝাঁটপাট দিয়ে ক্যাম্প পরিষ্কার রাখার ভার এক দলের উপর। হিসেবপত্রের ভার সাধারণতঃ হীরেণের উপরেই থাকত। আমরা স্টেশনে কখনও কুলি ভাড়া করতাম না, নিজেরাই মালপত্র ট্রেনে ওঠান নামান করতাম। তাঁবু খাটান এবং খুলে বাঁধাছাঁদা করার ভার কয়েকজনের উপর। বাজার করা বাসন মাজা, রান্না প্রভৃতি কাজের ভার বিভিন্ন দলের উপর। রান্নার ভার সাধারণতঃ মেয়েদের উপর থাকতো। খাওয়া-দাওয়া হতো খুব সাধারণ এবং বাহুল্যবর্জিত। আমিষ কখনও হতো না। দিন দশ বারো সব মিলিয়ে থাকা হতো। যাতায়াত খাওয়া খরচ নিয়ে একজনের দশ বারো টাকার বেশী পড়ত না। যে বার কিছু বেশী পড়ত সেবার ফাইন করে টাকাটা পুরিয়ে নেওয়া হতো। অমুক বেশী ফরসা জামাকাপড় ব্যবহার করেছে—চার আনা ফাইন। মাসীমার চটি ছিঁড়ে গিয়েছিল পাহাড়ে উঠতে গিয়ে আট আনা ফাইন, ইত্যাদি মজার 'ফাইন' করে সকলের ফাইনের কারণটা জানিয়ে দেওয়া হতো 'ক্যাম্প ফায়ারে'। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় 'ক্যাম্প ফায়ার' একটা প্রধান আকর্ষণ ছিল সকলের। গানের পর গান, নানারকম খেলা, কেউবা কোনদিন ভাল্লুকওয়ালা সেজে আর একজনকে কম্বল দিয়ে মুড়ে ভাল্লুক সাজিয়ে নাচাচ্ছে, ইত্যাদি। এই রকম রোজই নতুন নতুন কিছু হতো।

প্রতিদিনই সকলের কার্ড আঁকা অথবা স্কেচ চলতো বিশেষ করে মাস্টারমশাইর। প্রতি বছর সকলেই একটা করে মাস্টারমশাইর কার্ড পেতাম। সকলেরই এটার প্রতি বিশেষ লোভ ছিল।

সব জায়গাতেই চারদিক ঘুরে বেড়ান তো রোজকার একটা প্রধান কাজ। এক এক জায়গার দৃশ্য এক এক রকম। সব জায়গারই বৈশিষ্ট্য আছে। এইসব জায়গার নানারকম ছবি আঁকতেন সবাই। আশ্রমে ফিরে এসে সকলেরই কার্ডে

আঁকা ছবি 'এপিডায়াস্কোপে' দেখানো হতো এবং আশ্রমের ছোট-বড় সবাই উপস্থিত থাকতেন।

একবার একটা খুব মজার ঘটনা ঘটেছিল। সেবার হরিদাসবাবু (মিত্র) আমাদের সাথে রাজগীরে গিয়েছিলেন। কলাভবনের যে নিজস্ব ছোট তাঁবু তার দুটো ভাগ ছিল। মাঝে একটা পর্দা। সামনের অংশে থাকতেন মাস্টারমশাই বিনোদদা এবং হরিদাসবাবু। মাস্টারমশাই সামনের দিকে বসে কার্ড আঁকতেন। হরিদাসবাবু তাঁবুর পাশের কাপড়টা তুলে যাতায়াত করতেন কারণ পাছে ছবি আঁকার ব্যাঘাত ঘটে মাস্টারমশাইর। এদিকে কলাভবনে ফিরে এসে 'এপিডায়াস্কোপে' যখন ছবির কার্ডগুলি দেখান হচ্ছে তখন একটা ছবি দেখা গেল আঁটোসাঁটো ক'রে মালকোঁচা মারা একজন হামাগুড়ি দিয়ে তাঁবুতে ঢুকছেন—শুধু পিছনটাই দেখা যাচ্ছে। তলায় লেখা, 'হরিদাসবাবুর টেন্টে প্রবেশ'। দেখে হরিদাসবাবু সভার মধ্যে বলে উঠলেন, "মুশকিল আর কি, ভাবলাম 'ডিস্টার্ব' করব না, তাতেও রেহাই নেই"।

যেদিন নালন্দা যাওয়া হ'ল সেদিন হরিদাসবাবুর শরীরটা ভাল ছিল না, তবুও নালন্দা গিয়েছিলেন। আমি আর বিনোদদা সেবার ক্যাম্পেই ছিলাম। ফিরে এসে গল্প করছেন বিনোদদাকে, "বুঝলেন বিনোদবাবু আমার ত পৈটিক অবস্থা ভালো নেই, কি খাব?" বিশুবাবু বললেন, এক চুকুয়া (ভাঁড়) দৈ কিনে নিয়ে যেতে আর একটু চিঁড়ে। চুকুয়া তো দড়ি দিয়ে গলার সঙ্গে বেঁধে নিলাম বিশুবাবুর কথামত। এখন হয়েছে কি—ওখানে গিয়ে খাবার সময় চুকুয়া পড়ে ভেঙ্গে গিয়ে সব দৈ মাটিতে পড়ে গেল। বিশুবাবু বললেন ওপর থেকে খানিকটা খেয়ে নিতে। তাই করতে দুটো মাছি পেটের মধ্যে ঢুকে গিয়ে রাম রাবণের যুদ্ধ আরম্ভ করে দিল।" বলেই হাসতে আরম্ভ করলেন।

কালবৈশাখীর ঝড় উঠেছে একবার। সবাই আমরা বাইরে বেরিয়ে পড়েছি, হরিদাসবাবুও আছেন। "হাওয়াটা কোন্‌দিকে বইছে?" বলেই গায়ের উড়ুনিটা হাত থেকে ছেড়ে দিলেন। আর মুহূর্তে সেটি একেবারে তালগাছের ডগায় গিয়ে আটকে গেল।

অতি সরল প্রকৃতির এই পণ্ডিত মানুষকে দেখেছি আমাদের মধ্যে প্রতিদিন। কখনও মেজাজ খারাপ করতে দেখিনি। সকলেরই খুব প্রিয় ছিলেন আমাদের হরিদাসদা।

একবার রাজগীরে রাত্রে প্রচন্ড বৃষ্টি নেমেছে। আমরা ত সব তাঁবুতে। তাঁবুর চারধারে নালা কেটে দিলেন মাস্টারমশাই কয়েকজন ছেলেকে নিয়ে, যাতে জল সরে যায়। তাঁবুর মাঝখানে সব বিছানা গুটিয়ে জড় করে রেখে তার উপর বসে সমস্ত রাত গানের পর গান গেয়ে কাটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সকালবেলায় কাছের লোকেরা সব দেখতে এল আমাদের অবস্থা। এক মুসলমান জমিদার আমাদের খবর নিতে এলেন অনেক আটা ময়দা আর ঘি নিয়ে।

একদিন মাস্টারমশাই বাজারে একজন মোটাসোটা মুসলমান বৃদ্ধকে ওখানকার বিশেষ ধরনের হুঁকোতে তামাক খেতে দেখে একটি কিনে আনলেন, সঙ্গে কলকে ও তামাক। আমার উপর ভার পড়ল সেটাকে ঠিক করে লাগান এবং সন্ধ্যেবেলা তামাক সেজে দেওয়া আমার রোজকার কাজ হ'ল। টিকে ছিল না, ক্যাম্প-ফায়ারের অঙ্গার দিয়ে সেজে দিতাম, তাই খেতে খেতে তাঁবুতে বসে গল্প করতেন। পরে ঐ হুঁকোটা আমাকে দিয়ে দিয়েছিলেন আর দিয়েছিলেন একটি কার্ড—সেই বুড়োর তামাক খাওয়ার ছবি।

একবারের কথা কখনও ভুলব না। রাজগীরে যতবারই যাওয়া হয়েছে ততবারই নালন্দাতেও। যাওয়া-আসা হতো রেলগাড়িতে। ছোট লাইনের গাড়ি। এর বাড়ির পেছন দিয়ে, ওর বাড়ির উঠোনের পাশ দিয়ে খুব আস্তে আস্তে গাড়ি চলত। সেবার পয়সার টানাটানি। ম্যানেজার হীরেণ বলল, "সব ছেলেদের হেঁটে ফিরতে হবে।" তাতে কেউ রাজী নয় আমরা অল্প কয়েকজন ছাড়া। শান্তিদা, গোরা, আমি, অমলা ও হাসু হেঁটেই রওনা দিলাম। অমলা ও হাসু কলাভবনের ছাত্রী গোরা মাস্টারমশাইর ছোট ছেলে। ন' মাইল রাস্তা। তার আগে সমস্ত নালন্দা ঘোরা হয়েছে, কয়েক মাইল হবে। খুব চাঁদের আলো, আমরা এত জোরেই হেঁটেছিলাম যে দলের যারা ট্রেনে এসেছিল তাদের আগেই এসে পোঁছেছিলাম, কারণ ট্রেন তো সময় অনুযায়ী অনেক পরে ছেড়েছিল। হেঁটে এসে খুবই ক্লান্ত আমরা। গরম জলের কুন্ডতে খুব ভালো ক'রে স্নান করায় সেই ক্লান্তি দূর হ'ল।

রাজগীরের প্রধান আকর্ষণ এখানকার গরম জলের কুন্ড। কুন্ডর কাছেই পাহাড়ের নীচে আমাদের তাঁবু পড়ত। পাথরে বাঁধান কুন্ডের সিঁড়ি দিয়ে বেশ খানিকটা নেমে স্নান করতে হয়। কুন্ডে নামার আগে উপরে যে ছোট ছোট অল্প গরম জলের ধারা আছে তাতে গা ভিজিয়ে নিতে হয় এবং কুন্ডে

নেমেও জলের ধারে সিঁড়িতে বসে হাত দিয়ে গায়ে জল ছিটিয়ে দিয়ে দিয়ে সইয়ে নিতে হয় তা না হলে বিপদ– হঠাৎ জলে শরীর ডোবালে। বিনোদদা তাই করে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন।

রাজগীরের চারদিক ছোট ছোট পাহাড়ে ঘেরা। জঙ্গলে হরিণ, সজারু, বাঘ প্রভৃতি আছে। একবার দেখেছিলাম এক মুসলমান ভদ্রলোক একটা কালো রঙের বাঘ মেরে এনেছিলেন শহরে। পাহাড়ে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যাবার সময় হরিণ, সজারুর চিহ্ন দেখতে পেতাম। এখান থেকে বেশ কিছুটা দূরে গৃধ্রকূট নামে একটা জায়গা আছে, শোনা যায় এখানে ভগবান বুদ্ধ তপস্যা করেছিলেন। সেখানে যাবার রাস্তা আছে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। সাধারণত মাস্টারমশাই মেয়েদের নিয়ে ঐ রাস্তা দিয়েই যেতেন আর আমরা ছেলেরা যেতাম পাহাড়ের উপর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যেখানে কোনও রাস্তা নেই। পকেটে মুড়ি বাতাসা নিয়ে সকালে রওয়ানা হয়ে সমস্ত দিন কাটিয়ে সন্ধ্যেবেলা ফেরা হতো। দুপুরের খাবার খিচুড়ি রান্না ক'রে নিয়ে যাওয়া হতো গোরুর গাড়ীতে। ফেরবার সময় সন্ধ্যেবেলা সবাই একসঙ্গে রাস্তা দিয়ে ফিরতাম। গ্রামের লোকেরা সমস্ত দিন জঙ্গলের মধ্যে গোরু মোষ চরিয়ে ফিরছে। প্রত্যেক গোরু বা মোষের গলায় নানারকম আকারের টিনের কৌটোর ঘণ্টা বাঁধা আছে পাছে হারিয়ে যায় জঙ্গলে। সেই ঘণ্টার নানা সুরের আওয়াজ খুব ভাল লাগত. টুং টাং ঢং ঢাং বেজেই চলেছে।

এক্সকাশনের কথা বলতে গিয়ে কাহাল গাঁয়ের কথা মনে পড়ে। সেখান থেকে আমরা যাব বিক্রমশীলা। এই বিক্রমশীলা সম্বন্ধে একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। আগেকার যুগের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতই এটি একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। এ সম্পর্কে ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের 'প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস' গ্রন্থে যে তথ্য পাওয়া যায় তার থেকে কিছুটা তুলে দিলাম : "সুপণ্ডিত আচার্যের কাছে ছাত্ররা আপনি এসে জুটে যেত, এমনি করে শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠত। কোন এক জায়গায় বিভিন্ন বিভাগের আচার্য সমবেত হলে সেখানে আপনিই একটি বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি হত। প্রয়োজন বোধে জনসাধারণের স্বতঃপ্রণোদিত সাহায্য ও রাজ দান্যতা এই সব বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পুষ্টিসাধন করত। কিন্তু এদের কেউই অর্থ দিয়ে আচার্যদের নিয়ন্ত্রিত করার কথা মনেও স্থান দিতেন না। শিক্ষা-ব্যাপারে আচার্যরা সম্পূর্ণ

স্বাধীনতা উপভোগ করতেন। এমনি করে ভারতবর্ষে বহু বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল, তাদের মধ্যে তক্ষশীলা, উজ্জয়িনী, নালন্দা, কাশী, বলভী, অমরাবতী, অজন্তা, মাদুরা, বিক্রমশীলা প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। প্রত্যেকটি বড় বৌদ্ধ ও জৈন বিহার এক একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল।" (পৃষ্ঠা ১৫৫-১৫৬) আবার লেখা আছে : 'নালন্দার মতো বিখ্যাত না হলেও অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগে রাজা ধর্মপাল কর্তৃক স্থাপিত বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ও মহাযান বৌদ্ধদের এক বড় শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। খুব সম্ভবত ভাগলপুর জেলার পাথরঘাটা নামক স্থানে এই শিক্ষাকেন্দ্র অবস্থিত ছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার জন্য ধর্মপাল প্রচুর অর্থদান করেন। বিক্রমশীলায় ১০৭টি মন্দির ও ছ'টি কলেজ ছিল। পাঠ্যক্রম অনেকটা নালন্দার মতই ছিল।" (পৃষ্ঠা ২১০) এবং "ঐ বিশ্ববিদ্যালয় মুসলমান আক্রমণকারী কর্তৃক ধ্বংস হয়।" (পৃষ্ঠা ২১০)

উপরে দেওয়া তথ্য বাংলা ১৩৫৫ সনের লেখা। সম্প্রতি এই বিক্রমশীলার মাটির তলা থেকে খুঁড়ে অনেক কিছু আরও জানবার মত জিনিস বের হয়েছে এবং আরও বের হচ্ছে মাইলের পর মাইল, যার থেকে প্রমাণ হওয়ার মত যথেষ্ট কারণ আছে যে বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় খুবই বড় ছিল।

যাই হোক আমরা ত ঐ বিক্রমশীলা যাবার জন্য কাহালগাঁ থেকে মস্তবড় বজরা ভাড়া করেছি। তার চালক দু'জন। একজন বুড়ো আর একজন বাচ্চা, দুইজনই অচল অত বড় নৌকো চালাবার পক্ষে। রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর নৌকো ছাড়া হল। আমরা সব ঘুমিয়ে পড়েছি। সকালবেলার উঠে দেখি নৌকো প্রায় একই জায়গাতেই আছে। তখন আমরাই হাত লাগালাম। হীরেণ হালে, আমি আর শান্তিদা গুণ টানছি। এই রকম করতে করতে কোনমতে বিক্রমশীলা আসা গেল। নদীতে কোন কোন জায়গায় জল কম, নেমে ঠেলতে হচ্ছে। হঠাৎ দেখা গেল যদুবাবু নৌকোর ধার ধরে ঝুলছেন, কারণ গভীর জলে এসে পড়েছেন ঠেলতে ঠেলতে। যদুবাবু সাঁতার জানেন না, তখন সবাই তাঁকে টেনে তুলি। বিক্রমশীলায় আমরা গঙ্গার উপরে বজরাতেই ছিলাম। কোন জায়গায় তাঁবু ফেলা হয়নি। যতদূর মনে পড়ে বিক্রমশীলা দেখে আবার কাহালগাঁয়েই ফিরে এসে সেখান থেকে স্টিমারে রাজমহল যাওয়া হয়েছিল। স্টিমার কখন আসবে তার কোন সময়ের ঠিক থাকত না, তাই আমরা

সবাই স্টেশনেই ঘুমিয়েছিলাম। তখন অনেক রাত। হঠাৎ মাসোজী সকলকে তাড়া দিয়ে তুললেন, 'স্টিমার আসছে।' হুড়মুড় করে উঠে সব বিছানাপত্র বেঁধে লাইন করে মাল বয়ে স্টিমারে ওঠা হল। গঙ্গার উপর চলেছে স্টিমার। সে কি প্রচন্ড শীত! আমরা সবাই 'বয়লারের' ধারে বসেছিলাম। রাজমহলেও আমরা তাঁবু ফেলিনি। গঙ্গার একেবারে ধারেই 'সিং-ভবনে (পুরানো আমলের একটা খোলা বাড়ি) ছিলাম দিন চারেক। 'সিং-ভবন" নামটা মাস্টারমশাইর দেওয়া।

এখানকার একদিনের একটা ঘটনার কথা বলি। ছেলেরা এবং মেয়েরা গঙ্গায় দুটো আলাদা ঘাট ঠিক করে নিয়েছিলাম স্নানের জন্য। আমরা সাঁতার কেটে কেটে স্নান করছি একদিন, কে যেন মনে নেই, ডাঙ্গার থেকে দূরে একটা কুমীর আসছে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছে। তাড়াতাড়ি সবাই উঠে এলাম জল থেকে ততক্ষণে কুমীর ডুব দিয়েছে; একটুক্ষণ পরেই দেখা গেল হুস্ করে কুমীরটা ভেসে উঠেছে আমরা যেখানে স্নান করছিলাম সেইখানে। পরে শুনলাম, ওটাকে নাকি বলে ঘড়িয়াল, কুমীরেরই আর একটা জাত। মাছখেকো কুমীর। তারপর থেকে আর জলে নেমে স্নান করিনি বলাই বাহুল্য।

'এক্সকার্শনে' নানা স্থানে যাওয়ার মধ্যে প্রতিটি স্থানেরই বিশেষ ছাপ আজও মনের মধ্যে বেশ ভালোভাবেই আছে, তবুও কোনও কোনও স্থানের ছাপ বেশী গভীর ভাবে স্পষ্ট হয়ে আছে মনের মধ্যে। প্রত্যেক জায়গারই নতুন নতুন নানারকম ঘটনা তবে আজ এতদিন পরে সব মনে থাকার কথা নয় তবু যা মনে আছে, তাই লেখার চেষ্টা করছি। একটা কথা বলে রাখি, এই সমস্ত ঘটনা মুখে বললে যত রসিয়ে বলা যায় অথবা প্রকাশ করা যায়, বিশেষ করে যাঁরা এই সব দলে ছিলেন তাঁরা সামনে থাকলে যত জমিয়ে বলা যেত লিখে প্রকাশ ক'রে তার ধার কাছ দিয়েও যেতে পারব না।

ভীমবাঁধের কথা—ভীমবাঁধ যেতে হয় মুঙ্গের জেলার বরিয়ারপুর স্টেশনে নেমে বাস ভাড়া করে। তখনকার দিনে মোটেই ভালো রাস্তা ছিল না। এখন শুনেছি ওদিকে ভালো রাস্তা হয়েছে এবং হয়েছে থাকবার ভালো ভালো বাড়ি। ভীমবাঁধ জায়গাটা ঘন জঙ্গলের মধ্যে, বেশীর ভাগ শাল গাছ, খয়ের গাছ প্রভৃতি। আমরা যেবার প্রথম গেলাম, সেবার বেলা দশটা'র সময় রওয়ানা হ'য়ে গাছের ডাল কেটে কেটে রাস্তা ক'রে নিয়ে ওখানে পেঁছিতে বিকেল হয়ে

গিয়েছিল। ভীমবাঁধ স্টেশন থেকে মাইল পনের দূরে। এখানকার প্রধান আকর্ষণ হল চল্লিশটারও বেশী ছোট ছোট গরম জলের নদী জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে এঁকে বেঁকে চলে গেছে। কোন কোনটার জল এত গরম যে আমরা চা কফি পর্যন্ত বানিয়ে খেয়েছি তা থেকে। এখনকার কথা আলাদা, তখন কিন্তু লোকজন প্রায় ছিল না সেখানে। শুধু মাঝে মাঝে দু'চার ঘর নিয়ে কিছু গ্রাম দেখা যেত। জঙ্গলের ভিতরে বেড়াতে যেতে হলে 'গাইড্' ছাড়া অসম্ভব ছিল, আর সেই 'গাইড্' পাওয়া যেত এসব গ্রামের থেকেই। প্রায় চারদিকেই পাহাড় আর জঙ্গল। বাঘ, ভাল্লুক, হরিণ প্রভৃতিতে ভরা বিশেষ করে ভাল্লুক। 'ক্যাম্পে' সমস্ত রাত আগুন জেলে রাখা হতো। বলতে ভুলে গেছি, গোরা'র (মাস্টারমশাইর ছোট ছেলে) মামাবাড়ী বরিয়ারপুরেই। গোরা'র মামা তাঁর বন্দুক নিয়ে আমাদের সঙ্গেই থাকতেন যে ক'দিন আমরা ওখানে থাকতাম। প্রতিদিন মাঝরাতে একবার করে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করতেন। শহর ওখান থেকে অনেক দূরে ব'লে খাবারদাবার একবারেই নিয়ে যাওয়া হতো যতটা সম্ভব, যে কয়দিন ওখানে থাকা হ'ত সেই পরিমাণ।

একবার গোরার মামার বাড়ির লোকেরা একটি পাঁঠা কেটে সেটার চামড়া ছুলে আস্ত পাঁঠাটাই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আমাদের জন্য। সেটা এসে পৌঁছুল সন্ধ্যার পর। তখন আর সেটা রান্না করার সময় নেই, তাই সেটাকে মহুয়া গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখা হল। শীতের দিন, নষ্ট হবার ভয় নেই। আমরা সমস্ত রাত পালা করে পাহারা দিয়েছিলাম বসে, পাছে বাঘে নিয়ে যায়। বাঘ ভাল্লুক আমরা কখনও দেখতে পাইনি, তবে ভাল্লুকের অনেক চিহ্ন প্রায়ই দেখতে পেতাম। একবার একটা মস্ত বড় শিং-ওয়ালা সম্বর দেখতে পেয়েছিলাম খুব কাছ থেকে। আমরা যেখানে তাঁবু ফেলেছি তার প্রায় চার পাশেই গরম জলের নদী। তার মধ্যে একটা নদী ছিল, তার জলটা একেবারে ঠান্ডা না হলেও তত গরমও ছিল না। সেটাতে ছোট ছোট মাছ ছিল। মাছগুলি দেখাই যেত কারণ জলটা কাঁচের মতো। লতাপলাশের ডাল কেটে তাই দিয়ে ছিপ তৈরি করে আমরা মাছ ধরতাম। সুরেনবাবু বঁড়শি সঙ্গে নিয়েই গিয়েছিলেন। দুপুরবেলা একদিন মাছ ধরছি, হঠাৎ পায়ের শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখি হরিণটা দৌড়ে একেবারে আমাদের তাঁবুর সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। সবাই তো হৈ হৈ করে উঠেছে, আর মুহূর্তে হরিণটাও আবার দে

ছুট। এখনও চোখে লেগে আছে সে দৃশ্য। পরে অনেকেই আমরা এই হরিণটার ছবি এঁকেছিলাম মনের থেকে।

একদিন একটা খুব দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গিয়েছিল। আমরা একটা দুটো কম গরম জলের নদী বেছে নিয়েছিলাম। সকালে এবং সন্ধ্যা-বেলায় আরাম করে স্নান করতাম। ত্রিলোচন নামে একটি অবাঙালী ছেলে আমাদের সঙ্গে গেছে স্নান করতে, একদিকে সে সাঁতার জানত না। নদীগুলি গভীর না হলেও যে সাঁতার জানে না, তার ডুবে যাবার পক্ষে যথেষ্ট। হঠাৎ সর্দারজী (একটি শিখ ছেলে) হিন্দিতে চেঁচিয়ে উঠেছে 'ডুব গিয়া ডুব গিয়া' বলে। আমি আর গোরা সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে চুল ধরে টেনে তুললাম।

এই সঙ্গে আর একটা ডুবে যাওয়ার ঘটনা মনে পড়ে গেল। সেটা আরও সাংঘাতিক। আমরা সেবার বাঁশবেড়েতে গেছি। গঙ্গার মাঝে একটা চড়ার মত জায়গা ছিল, সেইখানে আমরা দুই একদিনের জন্য তাঁবু ফেলেছিলাম। জায়গাটা খুব সরু। তাঁবু ফেলে দু'পাশে আর জায়গা ছিল না। আমরা কয়েকজন নৌকো ভাড়া করে নদীতে বেড়াতে বেরিয়েছি। মাঝ-গঙ্গায় গিয়ে মনে হ'ল নৌকো থেকে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতরে ডাঙ্গায় যাব। সেইমত সবাই ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম। দেবরাজ শেঠি নামে একটি ছেলেও ঝাঁপ দিয়ে তলিয়ে যেতে লাগল। মাঝিটার নজরে পড়াতে সঙ্গে সঙ্গে সেও লাফিয়ে পড়ে ওকে টেনে তুলে উদ্ধার করল। দেবরাজ সাঁতারই জানত না। ভেবেছে, ঝাঁপ দিয়ে পড়লেই সবার মত সেও সাঁতরাতে পারবে।

এই বাঁশবেড়েতে পুরানো মন্দির থেকে অনেক টেরাকোটা'র কাজের মাটির ছাপ নিয়ে এসে সিমেন্টে তুলে কলাভবনে সংগ্রহ করে রাখা হয়েছিল। জানি না এখনো সেগুলি আছে কিনা।

আবার ভীমবাঁধের কথায় ফিরে আসি। রোজ 'গাইড'কে সঙ্গে করে বেড়াতে বের হতাম দল বেঁধে এক সঙ্গে। দলছাড়া হ'লেই হারিয়ে যাবার ভয়। দিনের বেলা স্কেচ করা, কার্ড আঁকা এ সব ত চলছেই যেমন প্রত্যেক 'এক্সকার্শন' পিকনিকে হয়ে থাকে। বিকেলবেলা খেলাধুলা আর সন্ধ্যার পর গরম জলে স্নান করে এসে ক্যাম্পফায়ারে বসা। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পরও অনেক রাত পর্যন্ত নানা রকম মজার মজার খেলা, নাচগান ইত্যাদি সব জায়গাতেই হতো।

জঙ্গল থেকে শুকনো কাঠ সংগ্রহ করাও একটা বড় কাজ ছিল রোজকার 'ক্যাম্পফায়ার' এবং রান্নার জন্য। সমস্ত দিনই সবাই নানা কাজে ব্যস্ত।

সেবার মল্লিকজী (৺গুরুদয়াল মল্লিক) আমাদের সাথে গিয়েছিলেন। অন্ধকার থাকতে উঠে উদাত্ত কণ্ঠে তাঁর গলার মীরার ভজন কি ভালই লাগত বিছানায় শুয়ে শুয়ে! পরে খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ডাক্তার কোথায় সেই জঙ্গলের মধ্যে! খুবই চিন্তার কারণ হয়েছিল। সকলের সেবায় অবশ্য ভালো হয়ে উঠলেন।

'এক্সকার্শনে' প্রত্যেকবারই ১লা জানুয়ারী ভোরবেলা অন্ধকার থাকতে উঠে আমরা বৈতালিক করতাম ঘুরে ঘুরে। ভীমবাঁধের বৈতালিক ঐ জঙ্গলের মধ্যে কি ভালোই লাগছিল। বৈতালিকের পর ইংরাজী নববর্ষে মিষ্টিমুখ করা হতো প্রতিবারই।

আরেকবার আমরা যখন ভীমবাঁধে গিয়েছিলাম। তখন রথীদারাও একদল একই সময়ে গিয়েছিলেন। দুই দল আলাদা ক্যাম্প করেছিল। সেবার ৺এলমহার্স্ট সাহেব গিয়েছিলে রথীদাদের সঙ্গে। সমস্ত দিন ঘুরে বেড়াতেন পাহাড়ের তলায় একটা পাখীমারা বন্দুক নিয়ে আর প্রায়ই আসতেন আমাদের ক্যাম্পে, বিশেষ করে নিয়মিতভাবে প্রতি সন্ধ্যায় আমাদের ক্যাম্প ফায়ারে। মাঝে মাঝে আমাদের ছেলেদের নিয়ে যেতেন জঙ্গলের মধ্যে—কোথায় একটা বড় শুকনো গাছ পড়ে আছে দেখে এসেছেন। দড়ি দিয়ে বেঁধে হৈ হৈ করে টেনে নিয়ে আসছি আমরা ক্যাম্প ফায়ারের জন্য। সঙ্গে আছেন এলমহার্স্ট সাহেব।

শুনেছি, আমাদের ক্যাম্প-লাইফ দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এলমহার্স্ট সাহেব এবং মাস্টারমশাই'কে বলেছিলেন, "আমারও একটা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আছে। আমরাও এই রকম আউটিংএ বের হই, কিন্তু আমাদের খুব সতর্ক থাকতে হয় ছাত্র-ছাত্রীদের সম্বন্ধে। এ কয়দিন নানাভাবে বিশেষ করে লক্ষ্য করেছি তোমার ছেলেমেয়েদের। যেখানে সেখানে যখন তখন ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোন অধ্যাপক নেই সঙ্গে, একেবারে পূর্ণ স্বাধীনতা কিন্তু কোনদিন দেখলাম না কোন জায়গায় এতটুকু বেসুরো হতে বা তাল কাটতে। কি মন্ত্র করেছ তুমি? এত নিয়মানুবর্তিতার ভিতর দিয়েও এত আনন্দ—এ তো আমি কল্পনাই করতে পারি না।"

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে এল্‌ম্‌হার্স্টের কোন সময়কার আর একটি উক্তির কথা। শুনেছি তিনি বলেছিলেন, "নন্দলালের সঙ্গটাই এডুকেশন।" একথা যে কত বড় সত্যি তা আমরা যত বুঝেছি তা বোধহয় আর কেউ নয়। প্রতিটি পিক্‌নিক্‌ এক্সকার্শনএ চলতে ফিরতে আমরা যা পেয়েছি, যা শিখেছি তার হিসেব দেওয়া সম্ভব নয়। ঘুরে ফিরেই এখনও মনে হয় আবার সেই যদি সোনার দিনগুলি ফিরে পেতাম।

মাস্টারমশাই'র শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা তখন ছিল না আর আমাদের ঐ অল্প বয়সে সেটা থাকার কথাও নয়। এখন বুঝতে পারি আর যতই ভাবি অবাক হয়ে যাই। ছেলেমেয়েদের শেখাবার কতটা আন্তরিক আগ্রহ থাকলে তবে ঐ রকম হয়। সমস্তক্ষণের ঐ এক চিন্তা। চলতে ফিরতে সব সময়ই নানাভাবে তাঁর শিক্ষা চলেছে অথচ কখনও একঘেয়ে বা বিরক্তিকর মনে হয়নি।

এখানে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করলে বোঝা যাবে ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে কতটা ভাবতেন মাস্টারমশাই, তাদের ভালমন্দ কি ভাবে তাঁর দিন-রাতের চিন্তা ছিল। একবার কেউ গুরুদেবের কাছে লাগিয়েছে যে কলাভবনের শিক্ষকরা ঠিকমত ক্লাস নেন না; গুরুদেব সেই শুনে নির্দেশ দিলেন যে দুবেলা সব অধ্যাপককে হাজিরা খাতায় সই করতে হবে। সেই নির্দেশ পেয়ে মাস্টারমশাই গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করে বললেন, "দু'বেলা সই করব সেটা ঠিকই আছে কিন্তু ক্লাসের সময় ছাড়াও যেমন দুপুরে বিশ্রামের সময়ও হয়ত কোন ছেলে বা মেয়ের কাজের সম্বন্ধে ভাবতে হচ্ছে; তখনও ত তবে সই করতে হয়।" শুনে গুরুদেব বলেছিলেন, "তোমাকে সই করতে হবে না"। মাস্টারমশাই বলেছিলেন যে সমস্ত অধ্যাপকদের ক্ষেত্রেই একই কথা। দুবেলা সই করার নির্দেশ রদ হ'ল তখন থেকে।

॥ ৫ ॥

সব এক্সকার্শন বা পিকনিকের কথা বলা হ'ল না, বলা সম্ভবও নয়। এবার কলাভবনের ক্লাস ও হস্টেল জীবনের কথায় আসি। এখানে ৺নন্দলালের শিক্ষা পদ্ধতি কেমন ছিল তাই বলি। কলাভবনে হেভেল 'হলে'র পিছনে আমাদের কাজের ঘর ছিল দু'টি। ছোটটি মেয়েদের আর বড়টি ছেলেদের। প্রত্যেক

ছেলে-মেয়েদেরই নিজস্ব আসন বা সিট্ (Seat) ছিল। পরে যখন ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়ল তখন মিউজিয়ামের দুই পাশে দুই বড় ঘরেও কাজের জায়গা করে দেওয়া হয়েছিল ছাত্রছাত্রীদের। অধ্যাপক অধ্যাপিকার মধ্যে মাস্টারমশাই ছাড়া ছিলেন সুরেনবাবু, মাসোজী, বিনোদদা এবং সুকুমারী দেবী (মাসীমা)। একজন অধ্যাপকের উপর কয়েকজন করে ছাত্রছাত্রীর ভার থাকত। মাস্টারমশাই সকলের কাজই ঘুরে ঘুরে দেখতেন এবং নজর রাখতেন প্রত্যেক দিন। আমরা বিশেষ করে তাঁর জন্য অপেক্ষা করে থাকতাম। দরকার বুঝলে কারো কারো ছবিতে হাত লাগাতেন আর আমরাও মনে মনে সেটাই চাইতাম। অনেক সময় দেখেছি মাস্টারমশাই হয়ত দিনের পর দিন কোন ছাত্র বা ছাত্রীর কাছে একেবারেই যাচ্ছেন না। আমাদের ভয় হতো হয়তোবা কোনও অপরাধ করেছি। কিন্তু পরে জেনেছি, 'ওভার গাইডেনস্' ছেলেমেয়েদের আত্মবিশ্বাস নষ্ট করে দেয় সেইজন্য তিনি ঐ রকম করতেন।

ছেলে-মেয়েরা যখন প্রথম ভর্তি হতো তখন নিজের মন থেকে ছবি করতে বলা হতো তাদের। সময়ের কোনও বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না; যার যতদিন ইচ্ছে একটা ছবির জন্য সময় নিতে পারত এবং ইচ্ছেমত যত ইচ্ছে ছবি করত। দরকার বুঝে কোন কোনও ছেলেমেয়েকে পুরোনো ছবি দেখে আঁকতে দেওয়া হতো। সকলের বেলায়ই এক নিয়ম ছিল না; প্রত্যেককে আলাদা ধরনের কাজ দেওয়া হতো প্রয়োজন অনুযায়ী।

আমার নিজের সম্বন্ধেই একবারের কথা মনে আছে। নিয়মমত আসনে বসি কিন্তু ছবি মাথায় নেই, আঁকব কি? মাস্টারমশাই লক্ষ্য করেছেন সেটা। নির্দেশ দিলেন—'রোজ যেদিকে খুশি বেড়াতে যাবে, কাগজ পেন্সিল নিতে পারবে না সঙ্গে।' তার আগে অবশ্য একটা মোঘল ছবি দেখে আঁকতে দিয়েছিলেন। রোজ বেড়াতে যাই খোয়াই, সাঁওতাল গ্রাম, গোয়ালপাড়া প্রভৃতি জায়গায়। এই বেড়ানই হল আমার ক্লাস। দিন দশ বারো পরে বললেন, "এবার রং তুলি কাগজ পেন্সিল নিয়ে আসনে বস, বেশী ঘুরলে ভূতে ধরবে"। অনেকগুলি 'ল্যান্ড্স্কেপ' এবং সাঁওতালদের বিষয় নিয়ে ছবি এঁকেছিলাম তারপর। স্কেচ্ হ'ল দু'রকমের—এক দেখে 'স্কেচ্' যাকে বলা যায় 'স্টাডি', আর এক হল মন থেকে 'স্কেচ্' যাকে বলে মেমারি স্কেচ্'। এই 'মেমারি স্কেচ্' থেকেই ছবি হয়। এই সব বুঝলাম তখন।

মাস্টারমশাই শেখানোর সময় কখনও প্রথমবারে ভুল ধরিয়ে দিতেন না বিশেষ করে ড্রইং-এর বেলায়। দরকার মত প্রকৃতি থেকে দেখে দেখে এঁকে শিখে নিতে বলতেন, যাকে বলে 'স্টাডি' করা, আগেই বলেছি। দুবার তিনবারেও ঠিক না হলে তখন দেখিয়ে দিতেন। বলতেন, 'অটোটিচিং সবচাইতে স্থায়ী হয়'। তাঁর বিশ্বাস ছিল, বেশির ভাগ ভুল নিজেই শুধরে নেওয়া যায়। ক্রমে মনের সঙ্গে হাতও পাকা হয়।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে আমাদের মাঝে মাঝেই প্রকৃতির থেকে 'স্টাডি' করতে হতো। তার কোনও বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না। একটা জিনিসই ধরে থাকতে বলতেন যার যেটা ভালো লাগে। প্রতি বছরই সেই একই জিনিস 'স্টাডি' করতে বলতেন—প্রতি বছরই যখন 'স্টাডি' করবে, দেখবে প্রত্যেকবারই নতুন কিছু পাচ্ছ তার থেকে, এই কথা বলতেন।

'অ্যানাটমি' পর্যায়ে 'হিউম্যান ফিগার'-এর 'বোন' (bone) বা 'মাস্‌ল' (muscle) প্রভৃতি স্টাডি করা আমাদের আবশ্যিক ছিল। ডাক্তার জ্যোৎস্নাবাবু নিয়মিত ক্লাস নিতেন সন্ধ্যার পর 'হেভেল হলে'। কলাভবনে মানুষের কঙ্কাল ছিল একটি। তার থেকে দেখে দেখে আঁকা এবং বইয়ের থেকে 'বোন' বা 'মাস্‌ল' ইত্যাদি আঁকতে হতো এবং কোন স্থানের কি নাম সব পাশে পাশে লিখে রাখতে হতো। প্রত্যেকের একটা করে বড় বাঁধান খাতা ছিল এর জন্য। এই এ্যানাটমির সব 'বোন' এবং 'মাস্‌ল'-এর নাম দিয়ে নিশিকান্ত একটি গান বেঁধেছিল। এ্যানাটমির খাতার পিছনেই সেটা লেখা ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে খাতা হারিয়ে গেছে।

নীহারবাবু'র ছবি আঁকার একটি ঘটনা মনে রাখার মত। এই নীহারবাবু সম্বন্ধে আগে লেখা হয়নি। নোয়াখালির লোক নীহাররঞ্জন চৌধুরী। একা একা থাকতে ভালবাসতেন। সব সময় অন্যমনা। শৈলেশের মতই একটা ছবি আঁকতে অনেক সময় লেগে যেত। প্রায় ছ'মাস ধরে একটা 'ল্যান্ডস্কেপ' করছেন মাস্টারমশাইর কাছে। একদিন মাস্টারমশাই দেখেন ছবিটি ঠিক মাঝখান দিয়ে কেটে দুভাগ করে বসে বসে ভাবছেন নীহারবাবু। মাস্টারমশাই এসে দেখে অবাক, জিজ্ঞাসা করলেন, "একি কাণ্ড করেছ?" "আমার মনে হ'ল এটা দুটো ছবি হয়ে যায় তাই কেটে ফেললাম', নীহারবাবু বললেন। খুব দুঃখ করে বলেছিলেন মাস্টারমশাই, ''মনে কর তুমি আর আমি একসঙ্গে খেলা

করছি, তুমি যদি হঠাৎ সব খেলার জিনিস ভেঙ্গে ফেলে উঠে যাও তাহলে আমার মনটা কেমন হয় ?"

একবার সোনুবেন ছবিতে রং লাগাতে পারছেন না কিছুতেই। রং দিলেই সব ছড়িয়ে যাচ্ছে। বসে বসে কাঁদছেন। মাস্টারমশাই দেখে বললেন, "আরে মন্ত্রটা পড়া হয়নি যে!" বসে ছবির গায়ে একটু হাত বুলিয়ে ঘন করে রং গুলে লাগিয়ে ঠিক করে দিলেন। রং আর ছড়িয়ে গেল না, বললেন, "এইভাবে রং গুলিয়ে লাগাও।" সোনুবেন ত অবাক !

কখনও কখনও কোন ছবি করতে গিয়ে হয়ত নষ্ট করে ফেলে মন খারাপ ক'রে বসে আছি। মাস্টারমশাই এসে হাত লাগিয়ে তাতে কিছু যোগ ক'রে এমন সুন্দর ক'রে তুলে উদ্ধার করলেন ছবিটাকে! এমনটা আমাদের অনেকেরই হতো।

ছবি শেষ হ'লেই তাকে 'মাউন্ট' করতে হতো। তখন বোলপুরে 'মাউন্ট' করার কোন দোকান ছিল না। আমরা নিজেরাই মোটামুটি 'মাউন্ট' করতাম এবং পরে কোলকাতা থেকে বাঁধিয়ে আনা হতো। মাস্টারমশাই বলতেন, "মাউন্ট না করা পর্যন্ত ছবি শেষ হয় না।" মাউন্ট করা হলে ছবির পিছনে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং মাস্টারমশাই'র সই থাকত তারিখ দিয়ে। মাস্টারমশাইর মত ছিল, "প্রতিটি ছবিই ত হ'ল এক একজন ছাত্র বা ছাত্রীর সার্টিফিকেট।"

সব শিক্ষকদেরই নিজের নিজের কাজের জায়গা ছিল কলাভবনেই। একমাত্র সুরেনবাবু তাঁর বাড়ীতেই কিছু ছবি করতেন দেখেছি, কিন্তু তিনি বেশিরভাগ সময় দিতেন 'আর্কিটেকচারে'। মাস্টারমশাই'র নিজের আসন ছিল ছেলেদের কাজের ঘরে। মাসোজী এবং বিনোদদা থাকতেন আমাদের কাজের ঘরের কাছেই একটা ছোট বাড়ীতে। ওখানেই ও'দের কাজের জায়গা ছিল। মাসীমার আসন ছিল মিউজিয়ামে। সব শিক্ষকরাই ছবি আঁকতেন যাঁর যাঁর কাজের ঘরে বসে।

মিউজিয়ামের পিছনেই ছিল আমাদের ভলিবলের মাঠ। বলটা থাকত কাজের ঘরেই। মাস্টারমশাই'র বাড়ী ছিল গুরুপল্লীতে। মাঝে মাঝে কোন কাজে অথবা টিফিন করতে বাড়ি যেতেন আর ঐ ফাঁকে আমরা ছাত্রছাত্রীরা বল নিয়ে নেমে পড়তাম ভলি খেলতে, 'নেট' তো খাটানোই থাকত। দূরে থেকে মাস্টারমশাইকে দেখা গেলেই "ঐ রে আসছেন মাস্টারমশাই, পালা পালা" করে

দৌড়ে আবার যে যার সিটে বসে পড়তাম আর হাঁপাতে থাকতাম। মাস্টারমশাই ছবি দেখতে এসে বলতেন, "ছবি আঁকতে আঁকতে একেবারে হাঁপিয়ে গেছ দেখছি।" বিশেষ কিছু বলতেন না।

প্রত্যেক দিন নিয়মিত আমাদের ভলিবল খেলা হতো আর সেখানে রোজ মাস্টারমশাই, সুরেনবাবু, ইসলামিক স্টাডিসের অধ্যাপক মৌলানা জিয়াউদ্দিন সাহেব প্রভৃতি উপস্থিত থেকে খেলা দেখতেন। খেলায় মেয়েরাও আমাদের সঙ্গে যোগ দিত। বৈতালিকে প্রতিদিন সকালে যোগ দিতে হতো সকলকেই। মাস্টারমশাই কখনও অনুপস্থিত থাকতেন না। তখন বৈতালিকে যাঁরা নিয়মিত গান গাইতেন তার মধ্যে প্রথমেই মনে পড়ে শান্তিদা'র কথা। শ্রীসুধীর কর, মণিরায় চৌধুরীও থাকতেন; কিন্তু শান্তিদাকে যত বেশি দেখেছি তত আর কাউকে নয়।

রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর প্রায়ই শান্তিদা আমাদের হস্টেলে এসে গান জমাতেন। একটার পর একটা গ ন গেয়ে চলেছেন। অনেক গানই তখন তাঁর কাছে শিখে নিয়েছি। এটা প্রতিদিনই হতো। কোন কোনও দিন দল বেঁধে বৈতালিক করতে বেরিয়ে পড়া হতো শালবীথির তলা দিয়ে। এইরকমভাবে বহু গান আমরা শিখেছি। গান ত তখন চারিদিকে যেখানে সেখানে ছড়ান ছিল। শান্তিদা কে ছাড়া কলাভবনকে ভাবাই যেত না; এক্সকার্শন, পিক্‌নিক্ সর্বদা গান দিয়ে ভরিয়ে রাখতেন।

এই প্রাত্যহিক বৈতালিকের কথায় একটা মজার ঘটনা মনে পড়ল। এক সময় শিক্ষাভবনের খুব কম ছেলেই বৈতালিকে উপস্থিত থাকত। নলিন গাঙ্গুলী মশাই তখন শিক্ষাভবনের অধ্যক্ষ। লিখিতভাবে তিনি নির্দেশ দিলেন যে সব ছেলেদের বৈতালিকে যোগদান আবশ্যিক। বিকেলে দেখি শিক্ষাভবনের হস্টেলে সব ছেলেরা 'মার্চ' অভ্যাস করছে; 'লেফট্ রাইট্' লেফট্ রাইট' ক'রে রীতিমতো 'প্যারেড্' হচ্ছে। তখন কলেজ বা শিক্ষাভবনের হস্টেল ছিল বোলপুরে যাওয়ার লাল কাঁকরের রাস্তার ধারে দোতলা বাড়ীতে, খড়ের চাল, বাড়ীটির নাম 'দ্বারিক'। আগে এটাই ছিল কলাভবন এবং তারও আগে মেয়েদের হস্টেল। যাই হোক—সেই হস্টেলের সামনে রীতিমত 'প্যারেড্' করছে শিক্ষাভবনের ছেলেরা। ব্যোমকেশ 'লিডার'। সে আ ার খোঁড় . ভালো ক'রে হাঁটতে পারে না, টাইফয়েড হয়ে পায়ের দে.ষ হয়ে গিয়ে ছল। সেই ে ্যামকেশই

সব অর্ডার দিচ্ছে। তার পাশে একজন সব সময় তাকে সাহায্য করার জন্য আছে সে ভালো করে সব সময় দাঁড়াতে পারে না বলে। পরের দিন সকাল-বেলা বৈতালিকের ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল কলেজের ছেলেরা 'লেফট্ রাইট্' করতে করতে পূর্বদিক থেকে মার্চ করে আসছে লিডার ব্যোমকেশ। লাইব্রেরীর কাছে এসেই 'হল্‌ট'। তারপর 'ফল্ ইন্'—সব লাইন করে দাঁড়াল। অন্য সবার মধ্যে একটা চাপা হাসি। বৈতালিকের শেষে আবার 'অ্যাটেনশন্', 'রাইট অ্যাবাউট টার্ন'। আবার তারা 'মার্চ' করতে করতে চলে গেল। তখনকার দিনে এটাকে মোটেই বড় করে তোলা হয়নি।

কলাভবনে আমরা বিশেষ ধরনের অভিনয় করতাম শান্তিদার নেতৃত্বে। মাস্টারমশাই'র পঞ্চাশ বছর পূর্তি'র সময় 'রাবণের কান্ড' (রাবণের সীতাহরণ) নামে মুখোশ নৃত্যাভিনয় করেছিলাম আমরা। কী উৎসাহ সকলের! প্রতিদিন বিকেলবেলা খেলার ঘণ্টায় এবং রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর মহড়া চলতো। নানারকমের অনেক বিদেশী বাদ্যযন্ত্র কলাভবনে ছিল। আমরা সে সব ব্যবহার করেছিলাম। অভিনয় হয়েছিল সব মুখোশ পরে। যারা পিছনে বসে বাজাচ্ছিল তাদেরও মুখোশ পরা। রাম ও রাবণ সেজেছিলেন শান্তিদা, সীতা আমি আর রোজ্‌লি মায়ামুং, সে যা জমেছিল! মায়ামুংকে যখন মারা হ'ল সে এমন জায়গায় গিয়ে পড়ল যে যেখানে 'ড্রপকার্টেন' পড়বে তার বাইরে। 'ড্রপ্' পড়লে তাকে পা ধরে ভিতরে টেনে আনা হ'ল। এর নাচ অভিনয় যা কিছু প্রায় সব বিদেশী যন্ত্রের বাজনার সঙ্গে। রাবণের সভাসঙ্গীতটি বেঁধেছিলেন শান্তিদা নিজেই। গানটির কথা ও সুর সিংহলি গানের আদলে বাঁধা। রাবণের সভায় অনুচরেরা নেচে নেচে এই গান গেয়েছিল। মাস্টারমশাই নিজের হাতে সকলকে সাজিয়ে দিয়েছিলেন।

রাবণের সভার গান ঃ—

"আবলুচাখাদে শ্যামকে নানু
শেহেরে শাশুরে দোতারে বানু
হোরাণে নাকা নেহারে দাঁতা
তাব্‌লা শিম্বু বব্‌দে হাঁদা রাগেনাহাবা।।

এই গানটির অর্থ বিশেষ কিছু নেই। সিংহলি গানের কথার ধ্বনিটাই আসল। প্রথম লাইনটা একটা সিংহলি গানের। পরের লাইন কটা

কলাভবনেরই কোন কোন ছেলেদের নাম নিয়ে করা। যেমন শিশির দোতারা বাজাত 'শেহেরে শাশুরের দোতারে বানু'। হীরেণের নাক খুব চোখা ছিল 'হোরানে নাকা', নীহারবাবুর দাঁত উঁচু ছিল 'নেহারে দাঁতা', শিবু তবলা বাজাত 'তাবুলা শিব্বু', ববুদে নামে একটি অতি ভালমানুষ চুপচাপ ছেলে ছিল, 'ববুদে হাঁদা রাগেনাহাবা'।

মাস্টারমশাই'র পঞ্চাশতম জন্মবার্ষিকীতে সিংহসদনে যখন প্রথমে এই 'রাবণের কান্ড' হ'ল, তখন গুরুদেব দেখে উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করে বলেছিলেন, "এরা আমাকে ভাবিয়ে তুলল দেখছি, এদের জন্য কিছু একটা তৈরি করতে হচ্ছে"। 'রাবণের কান্ড' পরে আরও কয়েকবার হয়েছে। একবার শ্রীনিকেতনের মেলার সময়ও হয়েছিল। সেবার সন্তোষদা (ভঞ্জ) জলতরঙ্গ বাজিয়েছিলেন। মেলার থেকে নানা সাইজের চীনামাটির বাটি যোগাড় করে নিয়ে জলতরঙ্গ বানিয়েছিলেন।

এবার মাস্টারমশাই'র পঞ্চাশ বছরের জন্মদিন উদ্‌যাপন সম্বন্ধে বলি। আমরা ছাত্রছাত্রীরা স্থির করলাম মাস্টারমশাই'র পঞ্চাশতম জন্মদিন পালন করব এবং প্রস্তাব গেল তাঁর কাছে। কিছুতেই রাজী হলেন না তিনি। অবশেষে রাজী হলেন এই সর্তে যে আশ্রমের মধ্যে কিছু করা চলবে না। তখন ঠিক করা হ'ল গোয়ালপাড়ায় পিক্‌নিক্ করে সেখানে মালাচন্দন, গান ইত্যাদি দিয়ে উৎসব হবে। একটা বড় আমগাছ তলায় বসিয়ে মালাচন্দন দিয়ে গানের পর তাঁকে সবাই প্রণাম ক'রে অনুষ্ঠান হ'ল। আমরা সকলে মিলে ছুঁচের কাজ করে একটা খদ্দরের চাদর উপহার দিয়েছিলাম। বেশির ভাগ ছেলেরা ত সেলাই জানে না; মেয়েদের সাহায্যে একটু করে কাজ সব ছেলেরাই করেছিল। আসল কাজটা মেয়েরাই করেছিল। সকলের হাতের কাজের উপহার দেওয়াটাই উদ্দেশ্য ছিল।

তারপর সমস্ত দিন ধ'রে পিক্‌নিক্ চলল। গানবাজনা, খেলাধুলো প্রভৃতি। এদিকে খবর পেঁছে গেছে গুরুদেবের কানে—'নন্দলালে'র পঞ্চাশ বছর পূর্তির জন্মোৎসব পালন করেছে কলাভবনের ছেলেমেয়েরা। তাঁকে কেউ জানায় নি। সন্ধোবেলা ক্ষিতিমোহনবাবুকে ডাকিয়ে মা টারমশাইকে বসিয়ে আবার একটা অনুষ্ঠান করেছিলেন। আমরা সবাই সেখানে উপস্থিত ছিলাম। মাস্টারমশাই একেবারে মাথাটি নীচু করে বসেছিলেন অপরাধীর মতো।

॥ ৬ ॥

'রাবণের কান্ড'র মত পরে আরও একটা নৃত্যাভিনয় শান্তিদা আমাদের দিয়ে করিয়েছিলেন। তার নাম ছিল 'মনোহরাবন্ধনম্'। এটাও মুখোশ প'রে এবং বাজনার সঙ্গে। এই অভিনয়ের আগে সন্ধ্যার পর নানারকম সংজে সেজে বাড়ি বাড়ি ঘুরে শান্তিদা'র তৈরী গান গেয়ে গেয়ে প্রচার করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানের জন্য চার আনা করে প্রবেশ মূল্য ধার্য করা হয়েছিল কালুর সাহায্যের জন্য। কালু শেখ নামে একটি অন্ধ মুসলমান ছেলে ছিল। কলাভবনেই থাকত আর গানবাজনা শিখত। তার আগে ভিক্ষে করে ঘুরে বেড়াত। মাস্টারমশাই তাকে কলাভবনে রাখার ব্যবস্থা করলেন। তার খরচটা আমরা ছাত্র-ছাত্রীরা চাঁদা তুলে বহন করতাম। পরে যতদূর মনে পড়ে কালু অফিস থেকে কিছু পেত হাতখরচের জন্য, পরিবর্তে তার কাজ ছিল প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা মন্দিরে গান গাওয়া।

এই মুখোশ নৃত্যাভিনয়ের কথায় একটি অস্বস্তিকর ঘটনার কথা মনে পড়ল। একবার আমরা কলাভবনের ছাত্রছাত্রীরা অনেক মুখোশ তৈরি করেছিলাম। 'ফ্যানসি ড্রেস' কমপিটিশান' প্রায়ই হতো তখন এবং খুবই জমত শুধু একবার ছাড়া, সেই ঘটনাই বলি। অন্যান্য বারের মত এবারও 'ফ্যানসি ড্রেস' হবে সিংহসদনে। বিভিন্ন বিভাগের সবাই নানারকম সাজে সেজে হাজির হয়েছে। আগেই গুরুদেব এসে উপস্থিত। কলাভবনের দল সবশেষে, সেই সব মুখোশ পরে এক একজন এক এক সাজে এসে হাজির। এমনকি মাস্টার-মশাই, সুরেনবাবুও বাদ নেই। দাড়ি গোঁফ লাগিয়ে সেজেছেন তাঁরাও। "আমরা বেনারস থেকে এসেছি" এই বলে ঢুকেই রামকিংকরদার তৈরী গান গাইতে আরম্ভ করেছি আমরা দল বেঁধে,

"লিলি লিলি লিলি লি
লেট্ আস প্লে ভলি,
আই পাস্ টু ইউ
ইউ পাস টু মি ॥"

সঙ্গে সঙ্গে শান্তিদা নাচতে আরম্ভ করেছেন। আর যাবে কোথায়? গুরুদেব ভীষণ চটে গিয়ে জোরে বলে উঠলেন, "শান্তি থাম্ বলছি, বিলিতি বাঁদরামো

পেয়েছিস নাকি ? সবাই একেবারে চুপ। এদিকে কে কার পিছনে লুকোবে—মাস্টারমশাই'র আর সুরেনবাবু'র দাড়ি গোঁফ খসে পড়ছে। সে এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। সেদিন আর জমে ? সব পালিয়ে বাঁচি।

একবার নাকি সব অধ্যাপকরা মিলে এই রকম 'ফ্যান্সি ড্রেস' করেছিলেন, খুব নাকি জমেছিল। বিয়েবাড়ি। বরযাত্রী এসেছে। ধোপা নাপিত সব এসেছিল সঙ্গে। কেউ সেজেছেন ধোপা, কেউবা নাপিত। ধোপা বোধহয় তনয়দা, নাপিত বোধহয় বিশ্বনাথদা, বর সন্তোন (কলাভবনের ছাত্র), বরকর্তা বোধহয় জগদানন্দবাবু, কনেকর্তা রথীবাবু, কনে কলাগাছ, এই রকমই আরও সব। কি একটা বিষয় নিয়ে বরকর্তার সঙ্গে মতের অমিল হওয়াতে বরকর্তা রেগে মেগে বর উঠিয়ে নিয়ে দলবলসহ চলে যেতে উদ্যত। কনেকর্তা হাত জোড় করে ক্ষমা ভিক্ষা করছেন ইত্যাদি। এটা আমার শোনা, তাই ভালো করে বলতে পারলাম না। হয়েছিল উত্তরায়ণে। শুনেছি অপূর্ব হয়েছিল। নিখুঁত সব অভিনয়।

কলাভবনের কথায় আবার ফিরে আসি। আমাদের সময় মিউজিয়ামে কোন তালা দেবার ব্যবস্থা ছিল না পরে আমরাই তালাচাবির ব্যবস্থা করি। আমাদের যা কিছু মহড়া বা সভা মিউজিয়ামেই হতো। যখনকার কথা বলছি, তখন সঙ্গীতভবন বলে আলাদা বিশেষ কিছু ছিল না। দিনুবাবু গুরুদেবের গানের ক্লাস নিতেন এই মিউজিয়ামেই। তাঁর বাড়িতেও ক্লাস হতো। সেখানেও আমরা শিখতে যেতাম। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর মিউজিয়ামের বারান্দায় অনেক সময় নুটুদি গানের ক্লাশ নিতেন। অসময় বলে খুব অল্প ছেলেই সেই ক্লাসে যোগ দিতে পারত। কাছাকাছি যারা থাকত, তারাই আসত। নুটুদির বাড়ি আমাদের হস্টেলের কাছেই ছিল।

আর ছিলেন ওস্তাদ রণজিৎ সিং। সেতার ও এস্রাজ শেখাতেন। তিনি থাকতেন এখন যেখানে 'ওয়াচ অ্যান্ড ওয়ার্ড'র অফিস, সেই বাড়িতে। তাঁর ক্লাস হতো যতদূর মনে পড়ে তাঁর ঘরেই। তখনকার সঙ্গীতভবন সম্বন্ধে এইটুকুই মনে পড়ে। শুনেছি ১৯১৪ সালে ভীমরাও শাস্ত্রী মহাশয় এখানে এসেছিলেন হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের জন্য। সে আমি আসার অনেক আগের কথা, কাজেই তাঁর সম্বন্ধে লিখতে পারব না।

নুটুদি (শ্রীমতী রমা কর) ছিলেন ৺শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের কন্যা ও

৺সন্তোষ মজুমদারের বোন। ৺সুরেন্দ্রনাথ করের স্ত্রী। আমি যখন শান্তিনিকেতনে আসি তখন দিনুবাবু ছাড়া গুরুদেবের গান শেখাতেন এই নুটুদি ও শান্তিদা। নুটুদি ও শান্তিদা তখন গান শেখালেও এঁরা খুব সম্ভব মাইনে করা শিক্ষক বা শিক্ষিকা ছিলেন না। ঠিক মনে নেই। এখনও নুটুদির হাতের লেখা দুটি গান আমার কাছে আছে।

প্রসঙ্গত তখনকার কোন কোন গাইয়ে বন্ধুর কথাও উল্লেখ করতে হয় যাদের কাছেও কিছু কিছু গান শিখেছি। যেমন সাগরময় ঘোষ এখন 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক) এবং পিনাকীন ত্রিবেদী'র কথাই মনে পড়ে। এদের দু'জনেরই গানের গলা খুবই ভালো ছিল।

নুটুদিকে খুব বেশীদিন আমরা পাইনি। অসুস্থ হয়ে যখন কোলকাতা গেলেন আমাকে তাঁর বাড়ি পাহারা দেবার জন্য বলে গিয়েছিলেন। আর ত ফিরলেন না। এখানকার অনুষ্ঠানাদিতে তাঁকে বিশেষ দেখার সুযোগ আমার হয়নি। নতুন গান তৈরী হলেই যেমন শান্তিদার ডাক পড়ত গুরুদেবের কাছ থেকে সেই রকম নুটুদিরও ডাক পড়ত দেখেছি। সত্যিই কী মিষ্টি গানের গলা ছিল তাঁর! গুরুদেবের খুবই প্রিয় ছিলেন।

পরে সঙ্গীতভবন হয়েছিল তখনকার 'প্রাক্তনী'তে, যেখানে চীনাভবন তার পাশে গুরুপল্লী যাবার চৌরাস্তার মোড়ে টিনের চালওয়ালা বাড়িতে। এখন সে বাড়ী নেই।

কলাভবনের হস্টেলজীবন—আমি যখন ভর্তি হই তখন আমাদের হস্টেল ছিল পুরানো হাসপাতালে গোয়ালপাড়া যাবার লাল কাঁকরের রাস্তার ধারে 'গৈরিক' নামে খড়ের চালওয়ালা বাড়িতে। আগে বলেছি পাশেই একটি কুয়ো ছিল, আমরা স্নান করতাম সেখানে।

আমাদের আলাদা নিজস্ব রান্নাঘরে ধনা নামে একজন লোক আমাদের রান্না করে দিত। মাছ মাংস প্রায় হতোই না। যদি বা কখনও খুব কদাচিৎ মাছ বা মাংস হতো, যারা নিরামিষ খেত তাদের জন্য রাখা হতো পানতুয়া বা রসগোল্লা। সকালের জলখাবার দিতে প্রায়ই দেরি করত ধনা, ফলে আমাদের ক্লাসে যেতে দেরি হয়ে যেত। ধনাকে আমরা বলতাম, "রোজ রোজ দেরি ক'রে জলখাবার দাও, আমাদের দেরি হয়ে যায় কলাভবনে যেতে আর মাস্টারমশাই'র

বকুনি খেতে হয়।" ধনা বলত, "তা দেরি হয়ে গেলে তো মাস্টারমশাই বকবেনই। আর দেরি হবে না।" কিন্তু রোজই এক ব্যাপার।

হস্টেলের পাশেই ছিল মেথরদের বাড়ি, মদ খেয়ে রোজই সন্ধ্যার পর নানা রকম কান্ড করত, আগে বলেছি। মজার মজার অর্থহীন গান, তুমুল ঝগড়া, মারামারি এইসব। এই মেথরদেরই ফেকু নামে একজন ছিল কলাভবনের পিওন। বিশাল চেহারা ছিল তার, যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। কলাভবনের দেয়ালময় ছবি এঁকে ভরিয়ে দিত। শুয়োর, কুমীর, গোরু, ভেড়া প্রভৃতির ছবি; আর আমাদের বলত, "মানুষটো খারতে লারছি বাবু, এটো আমাকে শিখিয়ে দিন"। একদিন দেখতে পাওয়া গেল ফেকু দুপুরবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আম্রকুঞ্জের ভিতর দিয়ে ছুটছে। একটুক্ষণ পর ফিরে এলে আমরা জিজ্ঞেস করলাম, "ব্যাপার কি?" ফেকু বলল, "ছুটির ঘন্টা দিতে ভুলে গিয়েছিলাম, মাস্টারমশাই বলেছেন ঠিক সময় ঘন্টা দিতে"। তাই নির্দিষ্ট এগারোটার ছুটির ঘন্টা বেলা দুটোর সময় বাজিয়ে বিশ্বস্ত কর্মীর সময়নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠার নজির রেখে ফিরে এলো। একবার নীচুবাংলায় হরিদাস ঠাকুর বাড়িতে ডাকাতি হ'ল। ফেকু নাকি সেই ডাকাতদের দলে ছিল। আমরা তো অবাক! ও আমাদের কখনও কখনও রান্না করে খাইয়েছে রান্নার লোক না থাকলে। কত প্রিয় ছিল আমাদের। কল্পনাই করতে পারিনি ফেকু এই কাজ করতে পারে। বহুদিনের জেল হয়ে গেল ফেকুর। জেলেই কলেরা হয়ে মারা গেল। আর তার সাথে দেখা হল না।

বিশ্বভারতীর একটা ছোট সাদা রঙের বাস ছিল। সেটা সাধারণতঃ স্টেশনে যেত শান্তিনিকেতনের প্যাসেঞ্জার আনতে বা পেঁছে দিতে। অনঙ্গদা সেটা চালাতেন। তিনি থাকতেন বোলপুরে। রোজ রাত্রে ঐ বাসে ক'রে বোলপুরে ফেরবার সময় আমাদের হস্টেলের কাছে গাড়ি থামিয়ে হাঁক দিতেন, "কই সব যাবে নাকি?' আর আমরা হৈ হৈ করে বাসে উঠে পড়তাম আর বোলপুরে গিয়ে মুর্শিদাবাদের মিষ্টির দোকানে ছানাবড়া খেয়ে হেঁটে হস্টেলে ফিরতাম। এ প্রায় প্রতিদিনের ব্যাপার। দোকানটা ছিল রেলওয়ে ব্রীজের ডানদিকে। এখন সে দোকান নেই। একদিন মিষ্টির দোকানের মালিক তার বাবার একটা 'প্রোট্রেট্' করাতে চাইল রং দিয়ে। নিগিকান্ত বলল, "করে দেব, আমরা চাই একটা আধমণি ছানাবড়া।" শুনেছি তখন আধমণ ওজনের

ছানাবড়া তৈরী হ'ত। কিছুদিন আমরা গিয়েছিলাম 'পোট্রেট স্টাডি' করতে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর করা হয়ে ওঠেনি আর আধমণি সেই ছানাবড়াও খাওয়া হয়নি।

চুরিচামারি বড় একটা ছিল না তখন, আমাদের হস্টেল ত একেবারেই বড় রাস্তার ধারেই ছিল। আমরা ত কলাভবনে চলে যেতাম। সমস্ত হস্টেলের ঘরই খোলা পড়ে থাকত। কোনদিন কারো কিছু চুরি হয়নি, শুধু একবার একটি অবাঙ্গালী ছেলের বালতি ছাড়া। এও একটা মজার ঘটনা। বালতি ত অনেকদিন চুরি হয়েছে, সবাই আমরা প্রায় ভুলেই গেছি। একদিন শেষ রাত্রে হঠাৎ সেই ছেলেটি লাফিয়ে উঠেছে বিছানা থেকে, "আমার বালতির শব্দ"। কেউ ঐ বালতি দিয়ে জল তোলার সময় ঠং করে শব্দ হয়েছে কুয়োতে। ছুটে গিয়ে ধরেছে যে জল তুলছিল তাকে। সত্যিই ওর বালতি। কি কান রে বাবা! জল দেওয়ার একটি লোকের কীর্তি এটি।

আমরা যখন গৌরিকে ছিলাম তখন শিশুবিভাগের উত্তরদিকের বারান্দায় ফ্রেস্কো করেছিলাম। এটা ১৯৩২ সালের কথা। আরিয়েমদা তখন শিশু-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত এবং ওখানেই থাকতেন। রোজ বিকেলে নিজের হাতে তৈরী চা খাওয়াতেন আমাদের। একই সময় মেয়েরা ফ্রেস্কো করেছিল শ্রীসদনে বসবার ঘরে, 'এগ্ টেমপারা টেক্‌নিকে'। ছেলেদের দলে ছিল নিশিকান্ত, শৈলেশ, নরেন্দ্র, নারায়ণসঙ্গম, রুদ্রাপ্পা, বনবিহারীদা, হীরেন, যদুবাবু ও আমি। শ্রীসদনে যে মেয়েরা ফ্রেস্কো করেছিল, তাদের মধ্যে ছিল যমুনা, নিবেদিতা, গীতাদি, নিভাদি, মন্দিরা।

এই 'এগ্ টেমপারা টেক্‌নিকে'র নিয়ম হলো রঙের সংগে ডিমের হলুদ অংশটা মিশিয়ে লাগাতে হয়। প্রথমে গ্রাউন্ডটা তৈরির সময় সাদা অংশটা লাগে। তখন একসঙ্গে বেশি ডিমের দরকার। পরে যখন ছবিতে রং লাগান আরম্ভ হয় তখন সমস্ত দিনে একজনের একটা পুরো ডিমও লাগে না। আমাদের বরাদ্দ ছিল প্রত্যেকের জন্য দু'বেলা দুটো করে ডিম। মুরগীর ডিমই ব্যবহার হতো। আমরা ছবিতে রং লাগাবার সময় একটা ডিম ভেঙ্গে তিন-চারজনে কাজ করতাম আর বাকিগুলি ভাজা করে খেয়ে ফেলতাম সবাই মিলে। ডিমের 'স্টক্' থাকত গীতাদি, মন্দিরাদি ও সাবিত্রীদির কাছে, আর তাদের কাছ থেকেই আমাদের ডিম আনতে হতো। এদিকে হয়েছে কি ওরা টের পেয়ে

গেছে যে আমরা ডিম ভাজা করে খেয়ে ফেলি। নালিশ করে দিয়েছে মাস্টার-মশাই'র কাছে। তিনি এসে আমাদের খুব বকুনি দিলেন আর মেয়েরা সবাই মাস্টারমশাই'র পিছনে দাঁড়িয়ে মিটি মিটি হাসছে, 'কেমন জব্দ' ভাবটা এই। আমরা ঠিক করলাম এর শোধ নিতে হবে। গীতাদি'র খাটের তলায় ডিম রাখা আছে। তখন শ্রীসদনের জানালায় গরাদ ছিল না। দুপুরবেলা ওঁরা যখন ঘুমোচ্ছেন আমরা দুতিনজন চুপি চুপি জানালা দিয়ে ঢুকে সব ডিম ঝুড়ি ধরেই চুরি করে নিয়ে এলাম। কে নিয়েছে জানে না, কাজেই মাস্টারমশাই'র কাছে বলতেও পারছেন না, অথচ বুঝতে পারছেন আমাদেরই কাজ। তখন আমাদের কাছে প্রকারান্তরে ক্ষমা চেয়ে তবে ডিম ফেরত।

ফ্রেস্কো এবং অন্যান্য প্রকল্পের কথায় ফিরে আসি। পান্থশালায় বিনোদদা এবং সুতানের হাতের ফ্রেস্কো ছিল। রাজহাঁস, পদ্মলতা ইত্যাদির ছবি। এটা খুব সম্ভব ১৯২৯ সালে করা এগ্ টেমপারা টেক্‌নিকে। সুরপুরীতে মাস্টারমশাইর হাতের ফ্রেস্কো আছে—সাঁওতাল মেয়ের ছবি ইটালিয়ান টেক্‌নিকে করা ১৯৩০ বা ১৯৩১ সালে। আমি তখনও এখানে আসিনি; তখন শিশুবিভাগের ভিতরে এবং দক্ষিণদিকের বারান্দায় অনেক ছবিই আঁকা হয়েছে দেয়ালে। দক্ষিণের দেয়ালে মাস্টারমশাই'র ইটালিয়ান টেক্‌নিকে বাঁশঝাড়, বিনোদদার ফুলফিগার পোর্ট্রেট্ প্রভৃতি অপূর্ব ছবি ছিল। ভিতরে এছাড়াও অন্যান্য বিষয়ের ছবি অনেকের হাতেরই করা। নানারকম পশুপাখীর ছবি এগ্ টেমপারার করা ১৯৩০-৩১ সালে।

শ্রীনিকেতনের উৎসব প্রাঙ্গণের ইটালিয়ান ফ্রেস্কো ১৯৩০ সালে হয়েছে। মাস্টারমশাইর আঁকা হলকর্ষণের ছবি। বহুদিন ধরে রোদে জলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল ব'লে সম্প্রতি কিছুদিন হল ছাদ করে দেওয়া হয়েছে ওর উপর। শ্রীনিকেতনের বড়বাড়ির নীচের তলায় অধ্যক্ষের ঘরের দেয়ালে বহু আগের করা মাসোজীর হাতের ইটালিয়ান টেক্‌নিকে করা একটি ফ্রেস্কো আছে শুধু ইনডিয়ান রেডের লাইনে করা। ছেলে কোলে সাঁওতালি মায়ের ছবি। তারিখ জানা নেই।

শান্তিনিকেতন লাইব্রেরীর দোতালার ফ্রেস্কো শুনেছি সুরেনবাবুর নেতৃত্বে করা। খুব সম্ভব ১৯২৯ সালের আগেই হয়েছে। নীচের বারান্দায় কাজ আমাদের সময়েই হয়েছিল—জয়পুরী ফ্রেস্কো। জয়পুর থেকে এক বুড়ো

ওস্তাদকে আনা হয়েছিল দেয়ালের জমি তৈরি করে দেবার জন্য মার্বলের গুঁড়ো দিয়ে। সেই ওস্তাদ কাজ করছেন মাচায় উঠে—এই ছবিও দেয়ালে আছে। নাচের ছবি, সাঁওতাল গোরু চরাচ্ছে, তার মধ্যে ষাঁড়ের লড়াই, নৃত্যাভিনয় প্রভৃতি সব ছবি মাস্টারমশাই'র করা। ছাত্রছাত্রীরা রং তৈরি, মাচা বাঁধা ইত্যাদিতে সাহায্য করেছিল দল বেঁধে। এখানে ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ করে নাম করতে হয় গুজরাটী ছেলে জয়ন্তী পারেখের। কাজের ফাঁকে ফাঁকে চা তৈরি হতো। সমস্ত দিন ধরে খুব উৎসাহভরা একটা কাজের আবহাওয়া চলত। পরে হয়েছিল চীনাভবনের ফ্রেস্কো। হলের ভিতরের কাজ হয়েছিল গৌরীদির নেতৃত্বে আর বাইরের বারান্দায় আঁকা নটীর পূজার ছবি মাস্টারমশাই'র করা, তাছাড়া অন্যগুলি করেছিল ছেলেরা আর মেয়েরা। চীনাভবনের বাইরের 'স্টুক্কো'র কাজ আছে রামকিংকরদার করা প্রায় একই সময়ে।

এসবের আগে দুটো প্রকল্প নেওয়া হয়েছিল। হাসপাতালের বারান্দায় ফ্রেস্কো বেশির ভাগ ছেলেমেয়েরা করেছিল। এখন আর সে কাজ নেই। সুরেনবাবুর নেতৃত্বে বড় রান্নাঘরের সামনে 'চৈতি' অথবা 'খাইবারপাস' (শো কেস্) তৈরী করেছিলাম রোজালি, শুক্লা ও আমি। ছাদ থেকে আরম্ভ করে সবটাই মাটির সঙ্গে আলকাতরা মিশিয়ে করা। ঐ 'চৈতি'তে সপ্তাহে একটি করে কিছু সুন্দর জিনিস রাখা হতো, যেমন কোন ছবি বা মাটির তৈরি কোন সুন্দর পুতুল অথবা ঐ ধরনের অন্য কিছু। পরে ঐ একই রকমভাবে আলকাতরা মাটি দিয়ে 'শ্যামলী' ও কলাভবনের হস্টেল হয়েছিল। কলাভবনের হস্টেলের ছাদ বৃষ্টিতে ভেঙ্গে পড়াতে পরে খড়ের চাল করা হ'ল। সেই ছাদ ভেঙ্গে প'ড়ে যাওয়ার ঘটনা খুব ভালো মনে আছে। আমরা ছ'জন তখন ঐ মাটির হস্টেলে থাকি। মল্লিকজীও থাকতেন ঐ বাড়িতেই। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে ; আমরা হস্টেলেই আছি। হঠাৎ দেয়ালের মস্তবড় একটা অংশ আমারই ঘরের ভিতরে ধ্বসে প'ড়ে গেল। তখনই আমরা বিছানাপত্র নিয়ে একেবারে মিউজিয়ামের পশ্চিমের ঘরে চলে এলাম। ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। আমরা বাইরে যাতায়াত করতাম জানালা দিয়ে। তখন গরাদ ত ছিল না জানালায়। শুধু মল্লিকজীকে অন্য একটি ছোট্ট খড়ের ঘর দেওয়া হয়েছিল।

পরে মিউজিয়ামের ঐ পশ্চিমের ঘরেও বাগ গুহার থেকে অনুকরণ ক'রে

অপূর্ব ফ্রেস্কো করা হয়েছিল মাস্টারমশাই'র নেতৃত্বে। তখনকার প্রায় সব ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের অনেকেরই সমস্ত দেয়াল জুড়ে কাজ। এটা হয়েছিল ১৯৩৬ সালে এগ্ টেম্পারায়। যে সব ফ্রেস্কোর কথা বললাম তার অনেক-গুলিই এখন আর দেখা যাবে না, কারণ সেগুলি উঠিয়ে ফেলে চুণকাম করে দেওয়া হয়েছে, যেমন শিশুবিভাগের দক্ষিণের বারান্দার কাজ, হাসপাতাল অথবা পান্থশালার ফ্রেস্কো।

যেভাবে চৈতি তৈরি হ'ল, সেইভাবে মাটি ও আলকাতরায় অনেক রিলিফের কাজ অথবা মূর্তি হয়েছিল 'শ্যামলী'র দেয়ালে এবং কলাভবনের হস্টেলে। 'শ্যামলী'র কাজ করেছিলেন প্রধানতঃ মাস্টারমশাই, রামকিংকরদা এবং আরও কেউ কেউ। কলাভবন হস্টেলের কাজ করেছিল সব ছেলেরা। এই সময় রুদ্রাপ্পা বুদ্ধমূর্তি তৈরি করেছিল ঐ হস্টেলের কাছেই এখন যেখানে সিমেন্টের মূর্তি আছে। এও তৈরি হয়েছিল মাটি আর আলকাতরা দিয়ে। সেটা একদিন ভেঙ্গে পড়ে গেল। সে এক মজার ব্যাপার! সুন্দরদি গুরুপল্লীতে বাড়ি করেছিলেন তাঁর ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার জন্য। সেই সুন্দরদির দেওরের ছেলে কান্তেশ খেলার পর ছুটে এসে সেই বুদ্ধমূর্তিকে জড়িয়ে ধরেছে আরও কয়েকজনের সঙ্গে ফটো তুলবে বলে, আর সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা খুলে পড়ে গেল। এমনিতেই পুরোনো হয়ে ভিতরের বাঁশটা পচে গিয়েছিল। কান্তেশ ত ভয় পেয়ে তখনই ছুটে 'দিনান্তিকা'য় গিয়ে মাস্টারমশাইকে বলল সব কথা। মাস্টারমশাই বললেন, ''ভালোই হয়েছে, ওটা ভেঙ্গেই ফেলব ভেবেছিলাম। তুই যে সত্যি কথা বললি তাতে খুব খুশী হলাম"। তারপর ঐ জায়গাতেই এখন সিমেন্টের বুদ্ধমূর্তি হয়েছে! সিমেন্টের ঐ ধরনের অনেক কাজ আছে রামকিংকরদার। আমাদের সময়কার যে সব কাজের কথা লিখলাম, সে সবের সঠিক সন তারিখ আমার মনে নেই, তবে ১৯৩১ থেকে ১৯৩৮ সালের মধ্যে এগুলি হয়েছে। এসব কাজ আমাদের নিয়মিত ক্লাসের মধ্যে থাকলেও এর পিছনে আলাদা উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল; তা না হলে এত বড় বড় কাজ করা সম্ভবই হতো না যার প্রধান উৎস মাস্টারমশাই, বলাই বাহুল্য।

হস্টেল-জীবনের কথায় আবার ফিরে আসি। গৈরিক থেকে আমরা চলে এলাম কলাভবনের কাছের তিনটে খড়ের বাড়িতে খুব সম্ভব ১৯৩২-৩৩ সালে। আমাদের কোন মাইনে করা 'হস্টেল সুপারিনটেনডেন্ট' ছিল না। ছাত্রদের

ভিতর থেকেই এক একজনকে 'সুপারিনটেনডেন্ট' করতেন মাস্টারমশাই। আমরা বলতাম তাকে 'হস্টেল ম্যানেজার'। হস্টেল সম্বন্ধে কোন কিছু অসুবিধা দেখা দিলে সেই ম্যানেজারই মাস্টারমশাইর সঙ্গে যোগাযোগ করত। বিশেষ কোন অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটলে আগে নিজেদের মধ্যে মিটিয়ে নেবার চেষ্টা হতো মাস্টারমশাইর কাছে না গিয়ে। তবে সেরকম ঘটনা খুব কমই ঘটত। এসব নিয়ম মাস্টারমশাইর নির্দেশেই হয়েছিল বলার দরকার করে না।

আমাদের রান্নাঘরেও প্রতিমাসে একজন ক'রে ম্যানেজার হতো। তিনবেলা খাওয়া; সকালে, দুপুরে এবং রাত্রে আর বিকেলে শুধু চা। এতে খরচ পড়ত মোটামুটি দশ টাকা। কখনও সামান্য কম বেশি হতো। একবার মনে আছে কোন ম্যানেজারের সময় তের টাকা পড়েছিল বলে হৈচৈ পড়ে গিয়েছিল। দোষ নেই সে ম্যানেজারের। ভালোমন্দ খাবার খাইয়েছে তাই দু'তিন টাকা বেশি পড়েছিল।

আমাদের রান্নাঘরে প্রায়ই আসতেন মাস্টারমশাই; খোঁজখবর নিতেন এবং মাঝে মাঝে খেতেনও। বৌদি (মাস্টারমশাই'র স্ত্রী) প্রায়ই খোঁজখবর নিতেন আমাদের খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে। বিকেলে হস্টেলে কোন জলখাবারের ব্যবস্থা না থাকলেও ঐ সময়ে খাওয়া বেশ ভালো করেই জুটত প্রায়দিনই। এক মিষ্টি বুড়ো ত আসতই, তাছাড়া বোলপুর থেকেও দুই-একজন আসত 'প্যাটিস', 'বিস্কুট প্রভৃতি খাবার নিয়ে। এই খাওয়ার খরচ অবশ্যই যার যার নিজের ছিল।

তখন দুই তিন টাকা মণ চাল, দুধ টাকায় আট সের কি দশ সের, চিনির সের তিন চার আনা, কয়লা হস্টেলে পৌঁছে দেবার খরচ নিয়ে চার আনা মণ, মাছ তিন চার আনা সের, মাংস চার পাঁচ আনা, একটা মুরগী দু'আনা, হাঁসের ডিমের দাম একটু বেশী—টাকায় ষোল গণ্ডা অর্থাৎ ৬৪টা আর মুরগীর ডিম এক সঙ্গে বেশি কিনলে একশটা পর্যন্ত পাওয়া যেত টাকায়।

গ্রীষ্মের অথবা পূজার ছুটির পর আমরা অনেকেই বাড়ি থেকে নানারকম শুকনো খাবার, ঘি, আচার প্রভৃতি নিয়ে আসতাম। ছুটির পর ফিরে এসে হস্টেলে নামা মাত্র সকলের বাক্স খুলে দেখা হতো কে কি নিয়ে এসেছে। কাড়াকাড়ি ক'রে তখনই খাওয়া আরম্ভ হয়ে যেত। ঘি, আচার এসব দুপুরে বা রাত্রে খাবার পাতে সবাই ভাগ করে খেতাম। আর একটা জিনিস জুটত কপালে

প্রথমেই। ফিরে এসে হস্টেলে নামা মাত্র 'কে এল' 'কে এল' ব'লে সবাই ছুটে বেরিয়েই গুম্ গুম্ করে পিঠের ওপর কয়েকটা কিল দিয়ে অভ্যর্থনা করত

কখনও কখনও কীচেনের শোচনীয় দুরবস্থা যেত। টাকা ফুরিয়ে গেছে মাসের শেষে। এর ওর কাছ থেকে কিছু চেয়ে চিন্তে কোনরকমে চলত। হস্টেলের সামনের গাছের পেঁপে অথবা বাগানের লাউ দিয়ে একটা তরকারী আর সঙ্গে রসুনবাটার চাটনি। একবারের একটা ঘটনা। মাসীমা সুকুমারী দেবী) আগে থাকতেন শ্রীসদনে, পরে ওখানে কোন অসুবিধা হওয়াতে মাস্টারমশাই'র ব্যবস্থানত আমাদের হস্টেলে চলে এসেছিলেন। ওঁর থাকবার ঘরের পাশেই ছোট্ট খড়ের রান্নাঘর। রান্না ক'রে দেয় এক বুড়ী ঝি। আমার থাকবার ছোট ঘরটি ছিল মাসীমার ঘরের পাশেই। দুজনের ঘরের সামনে একই বারান্দা। আমরা কয়েকজন তাঁর খুব প্রিয় ছিলাম। মাঝে মাঝেই এটা ওটা খেতে পেতাম। মাসীমার খুব রাগ ছিল। সেইজন্য আমরা খুব ভয় পেতাম তাঁকে। সব সময় সন্তুষ্ট ক'রে চলতে চেষ্টা করতাম। আমাদের কুয়োর পিছনে একটা তরকারীর বাগান করেছিলাম আমরা। স্নানের জলটা বাগানে গিয়ে পড়ত, তাতে করে বাগান করা সুবিধে হয়েছিল। মাসীমা এসেই সেই বাগানটা দখল করে নিলেন। তখন তার নাম হ'ল 'মাসীমার বাগান'। আতা গাছ ছিল কয়েকটা তাও মাসীমা'র দখলে। তিনিই ভাগ করে দিতেন সকলকে। আমাদের লাগান কীচেনের চালে লাউগাছ – সেও মাসীমার। মনে মনে রাগ হ'লেও কিছু বলতে পারতাম না। বাগান থেকে অথবা আমাদের কীচেনের চালের লাউ তুলতে গেলেও মাসীমার অনুমতি নিতে হতো।

একদিন উপেন (রান্নার লোক) এসে বলল, কিছুই তো নেই বাবু, কি রান্না হবে?" রামকিঙ্করদা শুনেই বললেন, "কিছু নেই তো ঘিভাত করে দাও।" কিছুই নেই তার আবার ঘিভাত! এইরকম কথা রামকিঙ্করদা'র মত লোককেই মানায়। আমরা বললাম, "গাছ থেকে লাউ পেড়ে তার ঝোল রান্না কর।" উপেন বলে, "মাসীমা বকেন যে।" "মাসীমার গাছ নাকি?"—আমরা ভেবেছি মাসীমা গেছেন কলাভবনে, কাজেই নিশ্চিন্তমনে গলা ছেড়েই বলেছি। পিছন থেকে হঠাৎ, "কি বললে গো, সব শুনেছি। লাউ গাছ কেটে ফেলে দেব আমি গোড়া থেকে।" আমরা ত তখনকার মত পালিয়ে বাঁচি, কিন্তু কপাল খারাপ। মাসীমা'র রান্না তরকারী পায়েস বন্ধ ত হলই, কথা পর্যন্ত বলেন না আমাদের

সাথে। কয়েক দিন ত গেল এইভাবে। আর ত চলে না, বিশেষ করে আমার অবস্থা সহজেই অনুমেয়। আমি ত থাকি মাসীমার ঘরের পাশেই।

মিটিং ক'রে একটা উপায় ঠিক করা হ'ল। দুপুরবেলা দরজা জানালা বন্ধ করে ঘুমোচ্ছেন মাসীমা। ওঁর বাগানে একটা গোরু ঢুকিয়ে দিয়ে সবাই চেঁচামেচি করে উঠেছি, আরে তোরা সব করছিস কি? মাসীমা'র বাগানে গোরু ঢুকে সব খেয়ে ফেলল যে"! ছোটাছুটি করে গোরুটাকে তাড়িয়ে দিয়ে এসে মাসীমার বারান্দায় বসে হাঁপাতে লাগলাম। ছুটে বেরিয়েছেন মাসীমা; বাগানটা ঘুরে এসে বললেন, "ভাগ্যে তোমরা দেখেছিলে গো, তা না হলে সব খেয়ে দিত, বিশেষ করে শশাগাছটা যেরকম ফন্‌ফনিয়ে উঠেছে। আজ বিকেলে এসো গো, পায়েস করেছি একটু।" আবার কপাল ফিরল সেই দিন থেকে।

গোয়ালপাড়া থেকে খেজুরের রস চুরি করে এনে দুপুর রাতে মাসীমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে কত খাইয়েছি। ওই ব্যাপারটা, অর্থাৎ রস চুরি আমরা প্রায়ই করতাম। রস নামিয়ে হাঁড়িটা আবার ঠিক জায়গায় ঝুলিয়ে দিয়ে তার ভিতর দু'চার আনা পয়সা রেখে দিতাম।

প্রায়দিনই মাস্টারমশাই হস্টেলে আমাদের ঘর দেখতে আসতেন; সেইজন্য সব সময় ঘর বিছানাপত্র প্রভৃতি পরিষ্কার রাখতে হতো; শুধু ঘর কেন, হস্টেলের চারধার, রান্নাঘর প্রভৃতি পরিষ্কার রাখতে হতো, কোথাও একটুকরো কাগজ পড়ে থাকবার উপায় ছিল না। কাজের ঘরের বেলায়ও তাই। কাজের শেষে অসমাপ্ত ছবি থেকে আরম্ভ করে রং, তুলি, পেন্সিল সব কিছু গুছিয়ে রাখতে হতো। মাস্টারমশাই বলতেন, "আমি কারো ভেলভেটের বিছানা চাই না, যার যা আছে তাই পরিষ্কার করে গুছিয়ে রাখবে। শুধু ছবি আঁকলেই হবে না, সব কিছুর মধ্যেই সাজিয়ে গুছিয়ে পরিষ্কারপরিচ্ছন্নভাবে না রাখতে শিখলে ছবি আঁকা শেখা ব্যর্থ।" যখন এক্‌স্‌কার্শনে যেতাম তখনও যার যার বিছানাপত্র গুছিয়ে ঠিকমত রাখতে হতো। ক্যাম্পও পরিষ্কার রাখতে হতো ঝাঁটপাট দিয়ে। একটা গর্ত করে তাতে আবর্জনা, খাবারের পাতা প্রভৃতি ফেলে পুড়িয়ে দেওয়া হতো। যখন বাইরে বেড়াতে যেতাম ঘুরে বেড়াবার স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে সকলেরই ছিল, কিন্তু ঠিক সময়মতো ক্যাম্পে ফিরতে হতো। এসব আমাদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। পিক্‌নিকের বেলাতেও

তাই, একসঙ্গে যাওয়া হতো এবং ফেরাও হতো একসঙ্গে। আসলে আমরা পেয়েছি আর্ট এডুকেশন, শুধুই ছবি আঁকা শিখিনি।

একবার একটি অবাঙ্গালী ছেলে এসেছিল, খুব অল্পদিন থেকেই চলে যায়। লাল, নীল, সবুজ, খুব কড়া কড়া রঙের জামা পরত সে। অনেক দিন মাস্টারমশাই বারণ করেছেন, আমরাও বরেছি, কিন্তু কোন ফল হয়নি। একদিন কীচেনে আমরা খেতে বসেছি, মাস্টারমশাই এসে একটা থালা নিয়ে তার কানের কাছে খুব জোরে জোরে বাজাতে লাগলেন। সে আর কি করে, কানে হাত দিয়ে ঢেকে রেখেছে মুখ ঘুরিয়ে। "কি খুব কানে লাগছে? আমাদেরও ঐ রংটা খুব চোখে লাগছে" বললেন মাস্টারমশাই। এই ধরনেরই অনেক রকম মজার শিক্ষা চলত মাস্টারমশাই'র চলতে ফিরতে সব সময়।

একদিন একটা পাকা পাতা এনে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "বল ত এটা কি রং?" আমি বললাম, "লেমন ইয়েলো"। মাস্টারমশাই বললেন, "তার চাইতেও ভালো বলা হতো পাকা লেবুর রং বললে।"

আর একদিনের একটি মজার ঘটনা—শিশুবিভাগে মাস্টারমশাই প্রায় রোজই যেতেন। ঘুরে ঘুরে দেখতেন সমস্ত হস্টেল। ছোটদের সঙ্গে গল্পগুজব করতেন। একদিন দেখেন দুটি ছেলে খুব মারামারি করছে; কিছুতেই থামাতে পারা যাচ্ছে না। মাস্টারমশাই এসেই গম্ভীরভাবে পকেট থেকে স্কেচখাতা আর পেন্সিল বার করলেন। "তোমার নাম কি? আর তোমার নাম?" দুজনের নামই খাতায় লিখে নিয়ে চলে এলেন। ছেলেদুটি ভয় পেয়ে যে যার ঘরে চলে গেল। এ গল্প ওঁর কাছেই শুনেছি।

মাস্টারমশাই'র ব্যক্তিগত জীবনের কোন কোন ঘটনার থেকেও শেখবার আছে। এই যেমন একবারের একটা ঘটনার কথাই শুনেছি। ভয়ডর বলে কোন জিনিস ত ছিল না। একবার সাপে কামড়েছিল চাঁদের আলোয় বাঁশগাছের ছায়া স্টাডি করতে গিয়ে। ভালো ক'রে বাঁধন দেওয়া হলো আর ডাক্তারবাবু বললেন সমস্ত রাত জেগে থাকতে। কলাভবনের ছেলেরা দল বেঁধে হাজির—ঘুমোতে দেবে না। সবাই হৈ হৈ ক'রে তাস খেলছে আর ওদিকে ভোঁস ভোঁস ক'রে ঘুমোচ্ছেন মাস্টারমশাই। এতটুকু ভয় পাননি। পরের দিন সকালে সব ঠিক, কিছুই হয়নি।

আরেকবারের একটি ঘটনা। এক বুধবারের উপাসনায় সবাই উপস্থিত

আছেন মন্দিরে। মন্দির চলছে। কাছেই সব দেবদারু গাছ। তাতে একটা মস্তবড় মৌচাক হয়েছে। একটি শিশুবিভাগের ছেলে সেই চাকে ঢিল ছুঁড়ে বসেছে। মুহূর্তে দেখা গেল ছেলেটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে। মৌমাছির আক্রমণে একেবারে কালো হয়ে গেছে সমস্ত শরীর। দেখতে পেয়েই মাস্টারমশাই ছুটে এসে কোলে তুলে নিয়ে একেবারে গেস্টহাউসের পাশের ছোট ঘরে ঢুকেই দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়ে মৌমাছি মারতে আরম্ভ করলেন। এইরকমভাবে ছেলেটি রক্ষা পেল। মাস্টারমশাই নিজে কিন্তু মৌমাছির আক্রমণ থেকে রেহাই পাননি। কিন্তু সমস্ত উপেক্ষা ক'রে এই কাজ করে-ছিলেন। কিরকম নিজেকে বিপন্ন ক'রে একটি ছোট ছেলেকে বাঁচিয়েছিলেন তাও শেখার মত। এই ঘটনার কথা আমার শোনা।

মাস্টারমশাই 'আনঅ্যাপ্রোচেবল' এবং অতি গম্ভীর প্রকৃতির লোক যার জন্য ওর কাছেই ঘেঁষা যায় না. একথা অনেকের কাছেই শুনেছি। কিন্তু আমরা যারা কাছে থেকে দেখেছি, তারা বুঝেছি এর থেকে ভুল ধারণা আর কিছু হতে পারে না। অনেক সময়ই নিজের ভাবে বিভোর থাকতেন ব'লে অনেকেই তাঁকে ভুল বুঝত। তিনি যে কত মিশুকে ও আমুদে ছিলেন তা আমরা প্রতিদিন দেখতে পেতাম। ছোট ছোট অনেক ঘটনা থেকেই তা জানা যায়। হীরেনবাবুর (দত্ত) কাছে একটা গল্প শুনেছি। সেদিন ১লা এপ্রিল। মাস্টারমশাই তো প্রায়ই আশ্রমের মধ্যে ঘুরে বেড়াতেন। সেদিন ছাতিমতলার কাছাকাছি হীরেনবাবুর সঙ্গে দেখা। জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা হীরেনবাবু, 'এপ্রিল ফুল'টা কিসের থেকে হল?" হীরেনবাবু বললেন, "জানি না"। "আমিও জানি না আপনিও জানেন না, আমরা দুজনেই এপ্রিল ফুল"। এইরকম ছোটখাটো মজার মজার কথা প্রায়ই বলতেন মাস্টারমশাই। মামা'র (শৈলেশ) 'মাস্টারমশাই বিশ্বাসঘাতক' এই গল্পটা প্রায়ই পিকুনিকে বলতেন মামারই সামনে। সে গল্পটাও বেশ মজার। তখন কারও অসুখ-বিসুখ কিছু হ'লে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হতো, আর আমরা পালা করে শুশ্রূষা করতে যেতাম তাকে। বিকেলবেলা দলবেঁধে দেখতে যেতাম রোগীকে। একবার মামার ডান হাতের বগলতলায় একটা ফোঁড়া হয়েছে। হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হলো জোর করে। মামা অত্যন্ত ভীতু প্রকৃতির লোক, কিছুতেই হাসপাতালে যাবে না। ফোঁড়া ত ফাটে না, শেষে ডাক্তারবাবু

(জ্যোৎস্নাবাবু) বললেন কাটতে হবে। আর যায় কোথায়, মামা ত একেবারে অস্থির। তারপরের ঘটনা মামার কথাতেই শোনা যাক। আমরা দেখতে গেছি। মামা নিশিকান্তকে বলছে, "ভাই নিশিকান্ত, বাল্যবন্ধু আমার (নিশিকান্ত আর মামা এককালে শিশুবিভাগে ছিল), মনের দুঃখের কথা তোমাকেই কই। আমার সর্বাঙ্গে ব্যথা। আমার দেশে ভালো কবিরাজ কি নাই? কবিরাজি ওষুধে কি ফোঁড়া সারে না? মাস্টারমশাই কিছুতেই দেশে যেতে দেবেন না। ডাক্তারবাবু ফোঁড়া কাটবেন ঠিক করেছেন। আমার বগলের কপালে যে এত দুঃখ ছিল তা জানতাম না। আর মাস্টারমশাই যে এত বড় বিশ্বাসঘাতক তা ত জানতাম না"। পরের দিন অনেক কষ্টে ধরে বেঁধে, মানে কেউ ধরেছে হাত কেউ বা পা, এই করে ফোড়া কাটা হলো। কমে গেল ব্যথা অনেক। পরের দিন আমরা গেছি। মামা বলছে, "ভাই নিশিকান্ত বাল্যবন্ধু আমার, আজ আমার সর্বাঙ্গে ব্যথা নেই, আজ আমার অর্ধাঙ্গে ব্যথা"। অল্প অল্প হাসি ফুটেছে মুখে।

আশ্রমের ছোটবড় সমস্ত বিভাগের ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকদের সঙ্গে মাস্টার-মশাই'র ঘনিষ্ঠ মধুর সম্পর্ক ছিল। অন্যান্য বিভাগের অনেক ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকদের প্রায়ই আসতে দেখতাম ওঁর কাছে। নাটক, অভিনয়, নানা উৎসব-অনুষ্ঠান কিছুই মাস্টারমশাইকে ছাড়া ভাবা যেত না। এইসব কাজের ভিতর দিয়ে সকলেরই একটা মার্জিত রুচি গ'ড়ে উঠত, যারা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করত অথবা প্রত্যক্ষ করত সকলেরই। শিক্ষার মধ্যে এই রুচিবোধ গ'ড়ে ওঠার ব্যাপারটা অতিশয় মূল্যবান। এই জন্যই সাধারণ স্কুল কলেজের শিক্ষার মধ্যে এসব কাজের এবং গানবাজনার প্রয়োজন গুরুদেব এত বড় করে দেখতেন এবং এসব কিছুর আয়োজন এখানে রেখেছিলেন। আর অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা মাস্টারমশাই'র মত একজনকে পেয়েছিলেন, যাঁর সাহায্যে ও অনুপ্রেরণায় আশ্রমের পরিবেশ এত সুন্দর হয়ে উঠতে পেরেছিল।

মাস্টারমশাই আমাদের কি মন্ত্রে যে কাজের নেশা ধরিয়ে দিয়েছিলেন তা বলতে পারব না। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, অনেকেই সিটে বসে যার যার ছবির সামনে, ওঠবার নাম নেই। 'দিনান্তিকা'র (চা-চক্র) থেকে ফেরবার পথে একবার ঘুরে যেতেন কাজের ঘরে। সেখানে তখনও কারুকে দেখতে পেলেই তাড়া দিয়ে উঠিয়ে দিতেন। আবার দেখেছি, অনেক সময় কারও কারও কাজে

মন বসছে না ; সিটে তারা বসছেই না মোটে ; ঘুরে বেড়াচ্ছে। জোর করে তাদের কাজে বসাবার চেষ্টাও করতেন না। কি করলে তাদের কাজে মন বসতে পারে তাই ভেবে বার করতেন। বুঝতেন, জোর করে বসালেই creative কাজ হয় না। আবার যখন কাজে মন লেগে যায় তখন তারা রাতদিন ঐ নিয়েই পড়ে আছে। দুই একটি ছেলে সম্বন্ধে বলতে শুনেছি মাষ্টারমশাইকে, "কাজই করে না শুধু এর ওর সিটে বসে আড্ডা দেয়। শুধু লক্ষ্য করে যাচ্ছি, দেখলাম শেষের বছর দুই এমনই কাজে মন বসল যে ওঠানোই যায় না সিটের থেকে এবং যে সব কাজ করে গেল একেবারে পাকা হাতের। আড্ডার ভিতর দিয়েই শিখে নিয়েছে"। এমনই কাজের আবহাওয়া ছিল যে তাতেই ছেলেমেয়েরা আপনিই অনেক কিছু শিখে যেত।

মাষ্টারমশাই'র কাছে শেখার সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছি ছাত্রজীবনে, ধন্য হয়েছি শেখার সুযোগ পেয়ে আমার শিক্ষকতার জীবনেও। প্রথম যখন শ্রীনিকেতনে শিক্ষাসত্রে আমার কাজের কথা হয় মাষ্টারমশ ই নিজেই উৎসাহভরে খবর দিয়েছিলেন এসে। আমি প্রথমে ভয় পেয়ে আপত্তি করেছিলাম। বলেছিলেন তখন, "ভয় কি, আমি ত রয়েছি।"

মাষ্টারমশাই'র কাজে আমরা বকুনি খেতাম, এটা আমাদের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল। আবার অনেক সময় দেখেছি মাষ্টারমশাই আমাদের উদ্ধার করেছেন বিপদ থেকে। একবারের ঘটনাই মনে আছে—মিউজিয়ামের সামনের রাস্তায় শিরীষ গাছতলায় বেশ কয়েকদিন ধ'রে পড়ে আছে অমূল্যবাবুর (শ্রীঅমূল্য বিশ্বাস) প্রায় ভাঙ্গা মোটর গাড়ীটা। অমূল্যবাবু ছিলেন ইন্‌জিনিয়ার। বড় টিউবওয়েল ওঁরই করা। মস্ত বড় টিউবওয়েলের জলের সেই ট্যাঙ্ক একদিন ভেঙ্গে পড়ে যায় প্রচণ্ড শব্দ করে। অমূল্যবাবুর সেই মোটরগাড়ীটা আশ্রমের যেখানে সেখানে পড়ে থাকতে দেখা যেত। বোধহয় কেরোসিন তেলেই চলত। একদিন রাত্রে খুব চাঁদের আলো। খাওয়াদাওয়ার পর ঠিক হ'ল যে মোটর ড্রাইভিং শেখাটা আমাদের একান্তই দরকার, যেখানে হাতের কাছেই একটা মোটর পড়ে রয়েছে। যে কথা সেই কাজ। আমি বসেছি স্টিয়ারিংএ আর সবাই পিছন থেকে ঠেলছে। সোজা শ্রীসদনের সামনে দিয়ে এসে বড় রান্নাঘরের পাশ দিয়ে উত্তরায়ণকে ডান দিকে রেখে বাঁ দিকের রাস্তা ধরে খানিক এগিয়ে ৺কালীমোহনবাবু'র বাড়ীর কাছাকাছি আসতেই

গাড়িটা ঘট্ ঘট্ শব্দ করে কি করে যেন স্টার্ট হয়ে গেছে। যারা ঠেলছিল তারা ত ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়, আমাকে ফেলে রেখে। আমি ত ভয়ে অস্থির। এখন যদি এটা জোরে চলতে আরম্ভ করে ডানদিকে খোয়াই বরাবর তাহলেই গেছি আর কি! দরজা খোলার সময় কোথায়? দরজার ওপর দিয়ে ডিঙ্গিয়ে কোনরকমে লাফিয়ে পড়ে দে ছুট্। হাত-পা ছ'ড়ে গেছে। তারপর গাড়িটার ঘট্‌ঘট্ শব্দ কখন বন্ধ হয়ে গেছে জানি না।

এদিকে সুরেনবাবুর কাছে নালিশ করে দিয়েছেন অমূল্যবাবু আমাদের নামে। পরের দিন সকালে আমরা মিউজিয়ামে ঢুকেছি। "অমূল্যবাবু'র গাড়িটা ওখানে নিয়ে ফেলেছে কারা?" সুরেনবাবু প্রশ্ন করলেন আমাদের। আমরা স্বীকার করলাম আমরাই করেছি। প্রচন্ড বকুনি আরম্ভ হল সুরেনবাবুর, আর থামে না বকুনি। সুরেনবাবু এমনি খুব ঠান্ডা প্রকৃতির লোক. সহজে রাগ করেন না; কিন্তু একবার রেগে গেলে আর উপায় থাকত না। আমরা ত মাথা নীচু করে বকুনি হজমই করে যাচ্ছি, এমন সময় মাস্টারমশাই এসে ঢুকেছেন, "কি হয়েছে হে সুরেন?" "এই দেখ না, অমূল্যবাবুর গাড়িটা ঠেলে নিয়ে ওধারে ফেলেছে।" মাস্টারমশাই উদার গলায় বললেন, "তাতে আর এমন কি হয়েছে? এরকম একটু আধটু করবেই ছেলেরা।" আমরা ত পালিয়ে বাঁচলাম।

আর একবারও সুরেনবাবুর কাছে বকুনি খেয়েছিলাম সবাই। সেবারও খুব চাঁদের আলো। খুব খেলায় মত্ত আমরা। ছোটাছুটি চেঁচামেচি হচ্ছে। হঠাৎ সুরেনবাবু এসে খুব বকতে আরম্ভ করলেন। মাস্টারমশাই তখন থাকলে হয়ত বেঁচে যেতাম। আমারই হল সব চাইতে বিপদ। আমি আবার সুরেনবাবুর বাড়িতেই তখন ঘুমোই। এখন যাই কি করে? বেশ খানিকক্ষণ পরে গেলাম কিন্তু বিশেষ কিছু বলেননি। তবে কিছু বললেই বোধহয় ভালো হতো। কিছু না বলাটাই যেন আরও বেশি বকুনির মত মনে হচ্ছিল।

নুটুদির মা'র বাড়ি ছিল খোলা মাঠের মধ্যে একেবারে পশ্চিমদিকে। সেই বাড়িতে নুটুদির ছোট বোন বাসুদি ছিলেন তখন। আমরা আর কেউ তখন কিছুদিন পাহারা দিতে যাই না। আমি ত সুরেনবাবুর বাড়িতেই শুই। নুটুদি অসুস্থ হয়ে কোলকাতা যাবার পর থেকেই ঐ বাড়ি পাহারা দেওয়ার ভার আমার উপর, আগে বলেছি। সেদিন কেন যেন মনে নেই শুতে যাইনি



মাস্টারমশাইর ক্যাম্প পরিদর্শন



বিনোদদা স্কেচ করছেন (লেখকের করা স্কেচ)

সুরেনবাবুর বাড়িতে। কালোবাড়ির হস্টেলে নিজের ঘরেই ঘুমিয়ে আছি। সুরেনবাবু বাড়িতেই আছেন। হঠাৎ রাত দুপুরে বাসুদি'র 'ও কলাভবনের ছেলেরা, ও কলাভবনের ছেলেরা' চিৎকারে ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমরা বের হয়ে সব ছুটলাম। দরোয়ান ধনেশ্বরের জোরাল টর্চ লাইটে দেখতে পেলাম পাঁচ ছয়জন লোক পালাচ্ছে। হঠাৎ সন্তোষদা'র (মিত্র) চিৎকারে ধনেশ্বর যেই টর্চ ঘুরিয়েছে তাঁর দিকে তারপর আর কারোকে দেখা গেল না। সব বোধহয় আলের ধারে মাঠের মধ্যে শুয়ে পড়ে লুকিয়ে গেল। আমরাও ভাবলাম চোর একবার পালিয়ে গেলে আর ধরা যায় না। তাই আর যাওয়া হল না চোরের পিছনে। তা না হলে হয়ত ধরাই যেত। কারণ পশ্চিমদিকের অত বড় মাঠ পেরিয়ে পালিয়ে যাওয়া সহজ ছিল না। কথায় বলে চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। আসলে ডাকাত পড়েছিল। বাসুদিকে খুব মেরেছিল গায়ের থেকে গয়না কেড়ে নেবার জন্য। এত চেঁচামেচি এত হৈ চৈ, কত লোক জুটেছে কিন্তু আশ্চর্যের কথা, যে সুরেনবাবু ও-বাড়ি থেকে ছেলের এতটুকু কান্নার শব্দে জেগে উঠে ছুটে যান তাঁর সেদিন ঘুমই ভাঙল না এত গোলমালেও।

আর একবার ডাকাত পড়েছিল 'নীচুবাংলোয়' হরিদাসবাবুর বাড়িতে। সেই ডাকাতিতেই তো ফেকু ধরা পড়েছিল। পাশের বাড়িতে থাকতেন বিনোদদা। হরিদাসবাবুকে খুব মেরেছিল। বিনোদদা ছুটে গিয়েছিলেন, তিনিও বাদ যান নি। আমরা খবর পেয়ে গিয়েছিলাম সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ততক্ষণে সব পালিয়ে গেছে। ওঁরা চিনতে পেরেছিলেন বিশেষ করে ফেকু ও লালধারীকে। লালধারী দুধের ব্যবসা করত এবং হরিদাসবাবুকে দুধ দিত এবং দুধে জল মেশান নিয়েই আগে কথা কাটাকাটি হয়েছিল এবং তখনই শাসিয়ে গিয়েছিল শুনেছি। ওঁদের কথামতই ফেকু ও লালধারী ধরা পড়ল। বিচারে ফেকুর জেল হ'ল; লালধারীর কথা মনে নেই। আদালতে হরিদাসবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিল "কোথায় মেরেছে আপনাকে?" রেগে উত্তর দিয়েছিল হরিদাসবাবু, "বাঙ্গালী পৃষ্ঠদেশ ছাড়া আর কোথায় মার খাবে?"

আমার আট বছরের শান্তিনিকেতনের জীবনের নানারকম প্রজেক্টের কথা আগেই বলেছি। এসব ছাড়াও কোন কোন ছেলেকে ভুবনডাঙ্গা, পিয়ার্সন পল্লী প্রভৃতি জায়গায় পাঠানো হ'ত 'নাইটস্কুলে' পড়াবার জন্য। এই কাজের

প্রধান উদ্‌যোক্তা ছিলেন শ্রীযুক্ত সুধীর কর এবং শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। এঁদের অনুরোধে অতি উৎসাহের সঙ্গে সাড়া দিয়ে কলাভবন থেকে ছাত্র পাঠাতেন মাস্টারমশাই। শ্রীসুখময় মিত্র, শ্রীশান্তি বসু, শ্রীসন্তোষ রায় প্রভৃতি ছেলেরা নিয়মিত ঐসব গ্রামে গিয়ে ক্লাস নিত সন্ধ্যাবেলা।

হস্টেলে যে সব ছেলে অসুস্থ হ'ত হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ত তাদের আগেই বলেছি। আর তাদের সেবা করার জন্য ছেলেরা পালা করে থাকত। নবকুমার নামে একটি ছেলের কথা খুবই মনে আছে। গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ছিল। 'ম্যালিগ্‌নেন্ট ম্যালেরিয়া'। গোয়ালপাড়ায় ক্যাম্পে গিয়ে এই অসুখ নিয়ে এল। একেবারে প্রথম থেকেই খুবই খারাপ অবস্থা। ডাক্তারবাবু বললেন বাহাত্তর ঘন্টা না পেরোলে কিছু বলা যাবে না। ছেলেরা রাতদিন কি সেবাটাই করেছিল! বাঁচবার কোন আশাই ছিল না। নবকুমার ভাল হয়ে উঠল ঠিকই। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এখান থেকে দেশে গিয়ে কিছুদিন পর টাইফয়েড্‌ হয়ে মারা যায়। সেবা করাটাও আমাদের হস্টেলের অন্যান্য কাজের মধ্যে ছিল। কলাভবনের নানারকম কাজের কথা বললাম। একটা কথা লিখতে ভুলে গেছি। পিক্‌নিক্‌ এক্সকার্শন ছাড়াও মাঝে মাঝে আশপাশ গ্রামে অল্পদিনের জন্য ক্যাম্প করে থাকা হ'ত 'স্কেচ, নেচার স্টাডি' প্রভৃতির জন্য।

আমি যখন ছবি আঁকা ও গান শেখানোর কাজে যোগ দিলাম শ্রীনিকেতনে শিক্ষাসত্রে তখনও মাস্টারমশাইর কাছ থেকে কত শেখার সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছি আগেই বোধহয় বলেছি। কি করে শেখাতে হবে তা তিনি সর্বদাই নির্দেশ দিতেন। শুধু তাই নয় সপ্তাহে একদিন (বুধবার) নিজে এসে শিক্ষাসত্রের ছেলেদের নিয়ে বসে নানারকম হাতের কাজ শেখাতেন অথবা তাদের নিয়ে কিছু সময় কাটাতেন। সকালবেলায় এসে সমস্ত দিন আমার বাড়িতে থাকতেন এবং ঐ সময় ছেলেরা অবাধে তাঁর কাছে আসত। তখন মোট জনা পঁচিশেকের মত ছাত্র ছিল শিক্ষাসত্রে এবং সবই আবাসিক। শ্রীনিকেতনে আমার কাজের সম্বন্ধে পরে বলব। মাস্টারমশাই সম্বন্ধে বলে শেষ করা যাবে না তাঁর কাছে কত ভাবে শিখেছি। তাই বলছিলাম আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেবার মূলে হল এই শান্তিনিকেতন, মাস্টারমশাই এবং গুরুদেব যাঁর অনেক কথা পরে বলব। আগে কলাভবনের সকলের কথা শেষ করি।

মাসোজী—বিনায়ক মাসোজী পুণার মানুষ। কলাভবনের অন্যান্য অধ্যাপকদের মধ্যে প্রথমেই মনে পড়ে মাসোজীর কথা। এরকম একজন উৎসাহী প্রাণবন্ত লোক আমি আর দেখিনি। সমস্তক্ষণ নানারকম কাজের মধ্যে দেখেছি। দেখেছি পিক্‌নিকে, এক্সকার্শনে, নাটক অভিনয়ের স্টেজ সাজানোতে। আরও দেখেছি সমস্ত দিন প্রচণ্ড খেটে স্টেজ সাজাবার পরই পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন হয়ে কাপড়চোপড় বদলে মস্তবড় এস্রাজখানা নিয়ে গানের দলের সঙ্গে বাজাতে বসতে, দেখেছি খেলাধুলায়, কিসে নয়। বেহালাও বাজাতেন। তবে গানের সঙ্গে সব অনুষ্ঠানেই সাধারণতঃ বিরাট এস্রাজটার কথাই বেশী করে মনে পড়ে। আর একটা জিনিস বাজাতে দেখেছি, সেটা হল করাত। ছুতোররা যে করাত ব্যবহার করে। মস্তবড় একটা করাত ছিল তাঁর। দুই হাঁটুর মধ্যে কাঠের হাতলটাকে চেপে ধরে বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে করাতের ডগটাকে টিপে ধরে বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে সুর করতেন মোটা ছড়ের সাহায্যে। এ আমি আর কাউকে ত দেখিইনি, শুনিওনি অন্য কারো বাজাবার কথা।

আগেকার দিনে পৌষ উৎসবের সময় অতিথিদের থাকবার জন্য তাঁবু ফেলা হতো অনেক। সে সবের ভার থাকত মাসোজীর উপর। ক্লান্তি বলে কিছু ছিল না। সমস্তক্ষণ হাসিমুখে কাজ করে চলেছেন। সকলের সঙ্গেই মধুর সম্পর্ক। ছাত্ররা সবাই যেন বন্ধুর মত। আর একটা মস্তবড় জিনিস লক্ষ্য করেছি। অত কাজে সমস্ত দিন ব্যস্ত, আমরা অনেকেই তাঁর সাহায্যকারী, কখনও কারোকে কোন ফরমাশ করতেন না এবং মেজাজ খারাপ করতে দেখিনি কোনদিন। পিক্‌নিক্‌, এক্সকার্শন, স্টেজ সাজানোতে মাসোজীকে ছাড়া ভাবাই যেত না। কথা খুব কম বলতেন। প্রতিদিন ভলিবল খেলতেন আমাদের সাথে ক্লাসের শেষে। রাত্রে নিজের ঘরে বসে পড়াশুনা করা। এক কথায় আমাদের সময়কার কলাভবনের জীবন মাসোজীকে ছাড়া ভাবতেই পারি না। কত কথাই মনে পড়ে, আমরা দল বেঁধে হেঁটে চলেছি পিক্‌নিক্‌ বা এক্সকার্শনে; মাসোজীর 'মাউথ অর্‌গ্যানটি' ঠিক বেজে চলেছে চলার সঙ্গে সঙ্গে—"খরবায়ু বয় বেগে চারিদিক ছায় মেঘে ওগো নেয়ে নাওখানি বাইয়ো" গানের সুর বা অন্য কিছু। লম্বা চওড়া চেহারার লোকটি আমাদের প্রিয় মাসোজী সব সময় ভরাট করে রাখতেন সব কিছুতে। একাই একশ। শান্তিনিকেতন পার্টির সঙ্গে অনেক জায়গাতেই গেছেন স্টেজ সাজাতে ও এস্রাজ বাজাতে।

বিবাহ করেননি। যে ছোট বাড়িটিতে থাকতেন তাতেই খুব সাজিয়ে গুছিয়ে থাকার অভ্যাস ছিল। কোন চাকর রাখতেন না। পরে চলে যান নাগপুরে। মাঝে আমেদাবাদেও ছিলেন কিছুদিন কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে। এখান থেকে চলে যাবার পর আর কখনও আসেননি। শুনেছি মানসসরোবরে গিয়েছিলেন একা। সম্প্রতি মারা গেছেন। রাত্রে ঘুমোবার সময়ও ঘরের দরজা জানালা খোলাই রাখতেন। একটা পোষা বেড়াল ছিল তাছাড়া আর কেউ কাছে থাকত না। সকালে দেখা গেল মেঝেতে পড়ে আছেন মৃত অবস্থায় আর বেড়ালটি কাছে বসে আছে। কাউকেই কাছে আসতে দিচ্ছিল না।

বিনোদদা (শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী মুখার্জী)—শুনেছি একেবারে ছোটবেলা থেকেই চোখে খুব কম দেখতেন। আমরা যখন থেকে দেখেছি তখন ত প্রায় অন্ধেরই মত। একেবারে চোখের কাছে কাগজ নিয়ে ছবি আঁকতেন। দেখে অস্বস্তি লাগত। চোখে ভাল দেখতেন না বলে চলাফেরাতে অসুবিধা হতো ঠিকই কিন্তু ছবি আঁকতে অথবা আমাদের দেখিয়ে দিতে কোন অসুবিধা হতে দেখিনি। মাস্টারমশাইকে দেখেছি প্রায় সবসময় বিনোদদার সঙ্গে থাকতে। পিক্‌নিক্‌, এক্সকারশন সব কিছুতেই বিনোদদার সঙ্গে আছেন। বিনোদদাকে ছাড়া বড় একটা দেখতাম না মাস্টারমশাইকে। রোজ ক্লাসের শেষে একবার বিনোদদার ঘরে বসে একটা বিড়ি ধরিয়ে খানিকক্ষণ গল্পগুজব করে তবে বাড়ি ফিরতেন।

সুরেনবাবু (শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর)-প্রথম প্রথম আমাদের শেখাতেন, পরে শেখানো ছেড়ে দিয়ে আশ্রম সচিবের কাজই করতেন। শান্তিনিকেতন পার্টি যত জায়গায় যেত সুরেনবাবু থাকতেন তার ভারপ্রাপ্ত হয়ে। ছবি আঁকা ছেড়েই দিয়েছিলেন প্রায়। 'আরকিটেকচার' নিয়েই থাকতেন বেশীর ভাগ সময় আগেই বলেছি। আশ্রমের তখনকার প্রায় সমস্ত বাড়ির প্ল্যান ওঁরই। উদয়নের প্ল্যানও ওঁরই করা। তবে সে তো একবারে হয়নি, ক্রমে বাড়ানো হয়েছিল ওঁর কাছেই শুনেছি। এসব কাজ ছাড়াও বাইরের অনেক জায়গা থেকেও বড় বড় অর্ডারি কাজ পেতেন এবং তার জন্যও ব্যস্ত থাকতে হতো, যার জন্য অনেক সময়ই আশ্রমের বাইরে থাকতে হতো সেই সব কাজ দেখাশুনা করার জন্য।

খুব জমাটি লোক ছিলেন সুরেনবাবু। বাইরে যখন অভিনয়ের দল যেত তখন সব জায়গাতেই অভিনয়ের পর রাত্রে আমাদের বৈঠক বসত। নানারকম মজা হতো সেই সব আসরে। অভিনয়ের সময় কে কি ভুল করল, বেসুরে গান গেয়েছে কেউ আর শান্তিদা ভুল করে অন্যজনকে ছড়ের খোঁচা দিয়েছেন, কেউবা স্টেজে নাচতে নাচতে পড়ে গিয়েছিল এইসব মজা করে করে দেখানো হতো অথবা গোটা অভিনয়টাই 'ক্যারিকেচার' করে নাচা হতো। খুব জমত এই আসর প্রত্যেকদিন। সুরেনবাবুই এসবের প্রধান উদ্‌যোক্তা ছিলেন। 'রিজার্ভ কম্পার্টমেন্ট' থাকত সব জায়গায় যাবার সময়। ট্রেনেও ঐরকম সব মজা হতো। এসবের মধ্যেই সুরেনবাবু থাকতেন। "কই সন্তোষ, শিশির, একবার লাগ দেখি।"

পার্টিতে সুরেনবাবু সব সময় তাঁর ঘড়ি 'ফাস্ট' করে রাখতেন। কারণ অভিনয়ের সাজ, অথবা কোথাও যাবার সময় যাতে আগেই তৈরী হয়ে যায় সবাই এবং ওঁর ঘড়ি অনুযায়ী সকলকে তাড়া দিতেন। একবার অবশ্য তাঁর ঘড়ি খুব স্লো করে রাখা হয়েছিল। কেউ তখন টের পায়নি। 'মুনলাইট পিকনিকে' গেছি আমরা সেবার খোয়াইতে। খুব জমেছে খেলা, গানের পর গান প্রভৃতি। বিশেষ করে খাওয়ার শেষে একটার পর একটা গান চলেছে। গান ফরমাশ করেই চলেছেন সুরেনবাবু। শ্রীসদনের মেয়েদের দেরি হয়ে গেলে হেমবালাদি বকবেন—"এখনও তো মোটেই রাত হয়নি।" ঘড়ির কাঁটা উল্টো দিকে ঘুরিয়েই চলেছেন সুরেনবাবু। তাই বলছিলাম তাঁর ঘড়ি দরকার মত ফাস্ট অথবা স্লো চলত। সব কিছুর মধ্যে জমিয়ে থাকতে ভালবাসতেন। এমনি স্বল্পভাষী ছিলেন মাস্টারমশাইর মতই। এখানকার উৎসব অনুষ্ঠান অভিনয় ইত্যাদি ওঁকে ছাড়া ভাবাই যেত না।

মাসীমা (সুকুমারী দেবী)—কলাভবনের মাসীমা। আগেই মাসীমার কথা কিছু বলেছি। মিউজিয়ামে সিট্ ছিল মাসীমার। ওয়াশ টেক্‌নিকেই ছবি আঁকতে দেখেছি। খুব ফিনিশ করে ছবি করতেন। দেবদেবীর ছবিই বেশী। সেলাইতেও তখনকার একমাত্র মাসীমার কথাই মনে পড়ে। আলপনাতে মাসীমার মত আর কেউ ছিলেন কিনা জানি না। তখনকার দিনে ৭ই পৌষের মন্দিরে ওঁর বছরের পর বছর অপূর্ব আলপনার কথা মনে পড়ে। শ্রীনিকেতনের বাৎসরিক উৎসবেও মেয়েদের দল নিয়ে অনেকবার আলপনা দিয়েছেন। ইনি

মাস্টারমশাইর কাছেই শিখেছেন। বালবিধবা ছিলেন। মাসীমা আমাদের হস্টেলে যখন ছিলেন ভরাট হয়ে থাকত আমাদের হস্টেল। শেষে অসুস্থ হয়ে কোলকাতায় হাসপাতালে মৃত্যু হয়। বড় কষ্ট পেয়ে মারা যান। অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। আত্মীয়স্বজন বড় কেউ দেখতে আসতেন না। শেষ সময় শুধু কলাভবনের ছেলেদের কথাই বলতেন নাম ধরে ধরে।

শ্রীবিশ্বরূপ বসু—মাস্টারমশাইর বড় ছেলে। আমি শান্তিনিকেতন আসার কিছুদিন পর জাপান থেকে ফিরলেন রঙিন উড্ ব্লকের কাজ শিখে। ইনিই বোধহয় প্রথম এই কাজ শিখে আসেন ভারতবর্ষে। কলাভবনের অধ্যাপকের কাজে বহাল হলেন তখন থেকে। প্রধানতঃ উড্কাট্ লিনো কাটের কাজ শেখাতেন। আমি এঁর কাছে রঙিন লিনো ব্লকের কাজ শিখেছি।

এসব ছাড়াও যখন নৃত্যাভিনয়ের দল বাইরে যেত তখন অভিনেতা এবং অভিনেত্রীদের সাজাবার ভার তাঁর উপরেই থাকত। আশ্রমের নানা অভিনয় অথবা মণ্ডসজ্জাতেও একজন প্রধান অংশগ্রহণকারী হিসেবে দেখেছি। এখন অবসরপ্রাপ্ত।

গৌরীদি (শ্রীমতী গৌরী ভঞ্জ)—মাস্টারমশাইর বড় মেয়ে গৌরীদির কথা সকলেরই জানা। যদিও আমাদের সময় ইনি কলাভবনের অধ্যাপিকা ছিলেন না তবুও এঁর কথা না লিখলে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে আমার পাওয়া শান্তি-নিকেতনের কথা বলা। যদিও ক্লাস করে এঁর কাছে কিছু শিখিনি তবে অনেক কিছুই পেয়েছি তাঁর সান্নিধ্যে এসে। আজও শিখছি। অর্নামেন্টাল ছবি, ডিজাইন এবং আলপনায় মাসীমার সঙ্গে গৌরীদির নামও করতে হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মাসীমার চাইতেও অনেক বেশী। যেমন বাটিক, বাঁধনী, চামড়ার কাজ, হাতে সুতো দিয়ে বুনে তাতে নানা রঙের পুঁতি বসিয়ে চমৎকার গয়না তৈরী করা, শুকনো ঘাসের কি সুন্দর সুন্দর গয়না প্রভৃতি হাতের কাজ এমন আর কারো দেখলাম না। অতি মিষ্টি স্বভাবের মানুষ। গৌরীদির নাচের কথা না বললে তাঁর সম্বন্ধে বলা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। প্রথম যখন 'নটীর পূজা' অভিনয় হয় তাতে নটীর ভূমিকায় গৌরীদির অপূর্ব নাচের গল্প শুনেছি। দেখার সৌভাগ্য হয়নি। এই অভিনয়ের পরই গৌরীদির সন্তোষদার (ভঞ্জ) সঙ্গে বিয়ে হয়।

॥ ৭ ॥

সর্ব প্রথম আমার যাঁর কথা বলা উচিত ছিল, আশ্রমে যাঁর আশ্রয়ে এসে আমার জীবনের ভাগ্য অনুসন্ধানের পথ খুঁজে পেলাম, যাঁর সান্নিধ্যে এসে জীবন ধন্য হয়েছে, আমার দেখা আমার পাওয়া শান্তিনিকেতনের কথা বলতে গিয়ে বাধ্য হয়েই প্রথমে অন্য কথা দিয়ে আরম্ভ করতে হল।

গুরুদেবকে আমি প্রথম দেখি এক বুধবারের মন্দিরে। লম্বা জোব্বা পরা সামান্য একটু ঝুঁকে পড়া চেহারা। মনে আছে অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম এক দৃষ্টে। মনে পড়ে গেল আমাদের স্কুলের আর্টিস্ট অ্যাসিসট্যেন্ট হেড-মাস্টারমশাই অশ্বিনীবাবুর (শর্মা) কথা। গুরুদেবের খুব ভক্ত ছিলেন। বড় বড় পেস্টবোর্ডে প্যাস্টেল দিয়ে গুরুদেবের কত পোর্ট্রেটই না আঁকতেন মন থেকে। একেবারে সেই চেহারা যে! তারপর দীর্ঘ দশ বছর কত জায়গায় কতভাবে দেখেছি। আমরা কলাভবনের কয়েকজন ছাত্রছাত্রী মিলে একদিন প্রণাম করতে গেলাম। সামান্য দু'একটা কথা আমাদের জিগেস করেছিলেন। কুশল প্রশ্ন, তাতেই মুগ্ধ হয়ে ফিরে এলাম। কি আনন্দ তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পেয়ে। জীবনে নতুন আলো দেখতে পেয়েছিলাম যাঁর আশ্রয়ে এসে তাঁর প্রথম সান্নিধ্য পেয়ে কি উৎফুল্ল হয়েই ফিরে এসেছিলাম সেদিন!

ছোটবেলা থেকেই গানবাজনা ছবি আঁকাতে ঝোঁক ছিল আগেই বলেছি। বাড়িতে গানবাজনার চল্ ছিল খুব। বিশেষ করে গুরুদেবের অনেক গানই ছোটবেলায় শুনে শুনে শিখেছিলাম। কারো কাছেই বসে শেখার সুযোগ হয়নি, কাজেই অনেক গানেরই ভুল সুর থেকে গিয়েছিল। এখানে এসে তা বুঝতে পেরেছিলাম। যখন কলাভবনে পড়তাম তখন থেকেই গান শেখার দিকে বিশেষ আগ্রহ। গান ত যেখানে সেখানে ছড়ানো ছিল। শেখার সুযোগের অভাব কি? বাঁশি বাজাতাম ছোটবেলা থেকেই। কিন্তু বিশেষ ধরনের টিপারা বাঁশি বাজাতে শিখলাম এখানেই। আগে কখনও এই বাঁশি দেখিনি। অন্য সোজা মুখের পেতলের বাঁশি আগে যা বাজাতাম এ তার থেকে অনেক কঠিন। কিন্তু খুব মিষ্টি আওয়াজ। আর এর সুবিধে হচ্ছে যত খুশি আস্তে বাজানো যায় তাতে স্কেল বদলে যায় না যা অন্য কোন বাঁশিতে সম্ভবই নয়। এত আস্তে আওয়াজ বার করা যায় যে কাছে বসে শুনলেও মনে হয় কত দূর থেকে ভেসে আসছে আওয়াজ। এস্রাজ, দোতারা এসব বাজনাও কিছু

কিছু জানা ছিল। কলাভবনে ছবি আঁকা শিখতাম, সঙ্গে সঙ্গে গানও শিখতে লাগলাম বিশেষ করে দিনুবাবুর ক্লাসে। কলাভবনে তাঁর ক্লাস হতো বিকেলের দিকে। পরে তাঁর বাড়িতেও গেছি গান শিখতে মাঝে মাঝে। তখন ত খুব অল্প ছেলেমেয়েই ছিল। শান্তিদা ও নুটুদির কথা ত আগেই বলেছি।

এই গানবাজনার জন্যই গুরুদেবের এত কাছে আসবার সুযোগ হয়েছিল। যখন কলাভবনের ছাত্র তখন থেকেই নানা নৃত্যাভিনয়ের পার্টির সঙ্গে বাইরে যেতাম। সেই সব অভিনয়াদির মহড়ায় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর গুরুদেবের কাছে বসে যোগ দেবার সৌভাগ্য হয়েছে। গানের দলে গানও গাইতাম এবং বাঁশিও বাজাতাম। তখন গানের দলে লোকসংখ্যা কত কম ছিল। ছেলেদের মধ্যে শান্তিদা, সন্তোষদা ও আমি। আর মেয়েদের মধ্যে ইন্দুদি, অমলা, মণিকা আরও দুই একজন। তখনকার দিনে মাইকের প্রচলন ছিল না, অন্তত আমাদের পার্টিতে ব্যবহার হতো না। সমস্ত ভারতবর্ষের নানা জায়গায় আর তাছাড়া সিলোনের অনেক শহরেই ঘোরা হয়েছে, কেউ কখনও বলেনি গান শোনা যায়নি বলে। গানের দলের সঙ্গে বাজিয়েছিলেন বালগঙ্গাধর, সন্তোষদা (ভঞ্জ), অশেষবাবু (বন্দ্যোপাধ্যায়), শ্যাম কর্মকার, শিবকুমার দত্ত (শিবু) এবং আমি। আমি এবং সন্তোষদা গানও করতাম আগেই বলেছি। অশেষবাবু, বালগঙ্গাধর ও শিবু এস্রাজ বাজাতেন। শ্যাম বাজাত খোল। সন্তোষদা বেহালা এবং নলতরঙ্গ। আমি বাঁশি। তালের যন্ত্রের মধ্যে খোল ছাড়া আরও দুটো জিনিস ব্যবহার হতো। একটা জাভা দেশের গং (ঘন্টা) ছিল। সাধারণতঃ সেই গংএর সুরের স্কেলেই এসরাজ বেহালার সুর বাঁধা হতো। এই জাভার গংএর কথায় মনে পড়ল কলাভবনের মিউজিয়ামের বারান্দায় বিরাট আকারের ঐরকম একটি গং ঝোলান ছিল। ক্লাসের আরম্ভে এবং শেষে সেটা বাজানো হতো একটি বিশেষ ধরনের হাতুড়ি দিয়ে। হাতুড়ির ওপরটা গোল এবং তাতে জড়ান ছিল মোটা কাপড় অনেকটা 'প্যাডের' মত। এই ঘন্টার গুরুগম্ভীর আওয়াজ বহু দূর থেকে শোনা যেত। নলতরঙ্গ এবং বাঁশি ঐ ছোট ঘন্টার সুরেই থাকত। এছাড়া কাঠের ছোট একটা ফাঁপা যন্ত্র ছিল জাপানী অনেকটা তালের আঁঠির মত দেখতে। একটা হালকা ছোট কাঠের হাতুড়ি দিয়ে সেটার ওপর ঘা মেরে ঠক্ ঠক্ শব্দ করে নাচের তালের সঙ্গে বাজান হতো।

তখনকার নৃত্যাভিনয়ের দলে পাঠভবন থেকে আরম্ভ করে সমস্ত বিভাগের ছেলেমেয়েদের বাছাই করে নেওয়া হতো নাচে গানে বা বাজনায়। এমনকি শিক্ষকরা ছাড়াও আশ্রমের অন্যান্যদের থেকেও নেওয়া হতো দরকার মত যাঁরা কোন বিভাগের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন না। শিক্ষাভবনের কন্ডামুনি রেড্ডিকে নেয়া হয়েছিল অর্জুনের গানের শুধু দুটো লাইন গাইবার জন্য কারণ ওর গলার স্বর খুব মোটা ছিল। নাচের দলের সখীদের প্রায় সবাই তো পাঠভবনের, যথা—মমতা, হাসু, অনু, দীপ্তি, সেবা, সুজাতা, অনিতা ইত্যাদি। শিক্ষা-ভবনের বনলীলা ছিল চিত্রাঙ্গদার মদনের ভূমিকায়। এইরকমভাবেই দল গড়া হতো। বালগঙ্গাধর ছিল শিক্ষাভবনের। শিবু কলাভবনের।

একদিকে কলাভবনে ছবি আঁকা শিখি আর সঙ্গে সঙ্গে চলল গান শেখা। গান গাইতাম বাঁশি বাজাতাম বলে নৃত্যাভিনয় ও আশ্রমের নানা উৎসব অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণের সুযোগ পেয়েছিলাম। এটা শুধু আমার ছাত্রজীবনেই নয় চাকরী জীবনেও বহু বছর ধরে চলেছিল অর্থাৎ গুরুদেবের পরলোক গমনের পরও বহু ছর পযন্ত। শেষ পর্যন্ত গানের দিকটই প্রাধান্য পেল যার দৌলতে চাকরী পেয়ে আমার এখানে থেকে যাবার সুযোগ হয়ে যাওয়াতে পরম সৌভাগ্যবান বলে মনে করছি। অন্তত শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে যেতে হল না তাতেই প্রধানতঃ স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম।

আমি যখন শান্তিনিকেতনে আসি তখন ওস্তাদ রণজিৎ সিংকে দেখি সেতার ও এস্রাজের শিক্ষক হিসেবে। কেউ কেউ শিখতেন তাঁর কাছে। কিছুদিন পর চলে গিয়েছিলেন। এলেন শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায় খুব সম্ভব ১৯৩৫ কি ১৯৩৬ সনে হিন্দুস্থানী গানের শিক্ষক হয়ে। তাঁর কাছে শিখতে আরম্ভ করলাম আমরা কয়েকজন। অবশ্য বেশিদিন ওঁর ক্লাস আমরা করিনি। কেন জানি না আমাদের ভাল লাগত না ওঁর ক্লাস করতে। তখনই নিয়মিত সঙ্গীত-ভবন আরম্ভ হল বলা চলে এবং প্রিন্সিপাল হলেন হেমেনবাবু। অল্প কিছু দিন পরই এলেন ওস্তাদ আয়েত আলি খাঁ সেতারের শিক্ষক হয়ে। ইনি ৺ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের ছোটভাই। তাঁর কাছে সেতার শিখতে আরম্ভ করলাম। এরকম একজন শিক্ষক আমি দেখিনি। কি যত্ন করেই শেখাতেন, কি তাঁর স্নেহ! খুবই ভালবাসতেন আমাকে। প্রথমে হস্তসাধন দিলেন অভ্যাস করতে যা বেশিক্ষণ ভাল লাগত না বাজাতে। বড় রসকসহীন

কাঠখোট্টা জিনিস তো! ওস্তাদজী ঠিকই ধরেছেন সেটা। বলেছিলেন, "কিছু কিছু গান ত জানা আছে। যখনই হস্তসাধনে বিরক্তি আসবে তখনই গান তুলতে চেষ্টা করবে। তাই বাজাবে তখন। নিজের কানে যেন ঠিক বাজে। তারপর আবার হস্তসাধন অভ্যাস করবে।"

সন্ধ্যেবেলা যখন হস্টেলে সেতার অভ্যাস করতাম চুপ করে লুকিয়ে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনতেন ঠিক হচ্ছে কিনা। তারপর নিয়ে যেতেন সঙ্গে করে নিজের ঘরে সুরবাহার শোনাতে। কী অপূর্ব মিষ্টি বাজনা দিনের পর দিন শুনিয়েছেন। কত স্নেহই পেয়েছি। একবার আমাদের কয়েকজনকে নিয়ে কনসার্ট তৈরী করেছিলেন। সেতার, এস্রাজ, বাঁশি, তবলা বেজেছিল তাতে। 'আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ' গানটি দিয়ে তৈরী হয়েছিল। কী চমৎকারই যে হয়েছিল! আমার সঙ্গে বড় মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় কোন কারণে বেশিদিন এখানে তাঁর আর থাকা হল না। যাবার সময় দুঃখ করে বলেছিলেন, "ভেবেছিলাম তোমাকে তৈরী করে দিয়ে যাব কিন্তু কি করব আমার এখানকার অন্ন জুটল না।" আমি প্যাস্টেলে ওঁর একটা পোর্ট্রেট করেছিলাম। যাবার সময় দিয়ে দিয়েছিলাম তাঁকে। এখন অন্তত এই ভেবে সান্ত্বনা যে আমার একটা হাতের কাজ তাঁর কাছে আছে। আর কোনদিন দেখা হয়নি। তাঁর কথা কখনও ভুলতে পারব না। এতদিন বেঁচে আছেন কিনা জানি না।

ওস্তাদ আয়েত আলি খাঁর জায়গায় এলেন ওঁদেরই আত্মীয় এস্রাজী ইয়াকুব রসুল (ফুলঝুরি)। এস্রাজের চেয়ে তবলাতেই তাঁর নাম ছিল এবং তবলার জন্যই ফুলঝুরি উপাধি পেয়েছিলেন। অপূর্ব তবলার হাত। ফুলঝুরি নামেই সবাই ডাকতো। অল্প দিন পরেই চলে যান।

তারপরই এলেন এস্রাজী অশেষবাবু ১৯৩৭ সনে। ছোটখাটো খুবই অল্প বয়স যিনি আজও সঙ্গীতভবন আলো করে আছেন। বিখ্যাত ওস্তাদ ৺রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ছেলে একথা সকলেরই জানা। অশেষবাবুর মত এস্রাজী আমি দেখিনি। তাঁর এস্রাজের কথা বলে বোঝানো যাবে না। যেন কথা বলে। যে কোন পর্দাকে সুর করে অবলীলাক্রমে বাজাতে আর কাউকে দেখিনি। এস্রাজ ছাড়াও সেতার তবলা প্রভৃতিতে পাকা হাত। নৃত্যাভিনয় এবং উৎসবাদির গানের সঙ্গে অশেষবাবুর এস্রাজ ছাড়া ভাবাই যায় না।

তার আগেই ১৯৩৬ সনে সুশীলবাবু সেতারের শিক্ষক হয়ে এলেন। সন্তোষদারই ছোট ভাই শ্রীসুশীলকুমার ভঞ্জ চৌধুরী আমার পরম বন্ধু। এঁর কাছেও সরোদ শিখতে আরম্ভ করেছিলাম। শেষে সঙ্গীতভবন থেকে অবসর নিয়েছেন। এঁর তৈরী দুটো গতের উপর গুরুদেব কথা বসিয়ে গান বেঁধেছেন। যেমন "এসো শ্যামল সুন্দর" এবং "মোর ভাবনারে কী হাওয়ায় মাতালো।" শ্যামা নৃত্যনাট্যের গানের স্বরলিপি সুশীলবাবুরই করা। অনেক কনসার্ট তৈরী করেছেন গুরুদেবের গান দিয়ে আমাদের নিয়ে। আর একটা 'হবি' ছিল। ভাল হোমিওপ্যাথ ছিলেন যার জন্য প্রায়ই গুরুদেবের কাছ থেকে ডাক আসতো। গুরুদেব নিজে বায়োকেমিক চিকিৎসা করতেন সকলেরই জানা। আমরা কত ওষুধ খেয়েছি গুরুদেবের কাছ থেকে। সুশীলবাবুকে অনেক হোমিওপ্যাথির বই দিয়ে গেছেন। অতি অমায়িক প্রকৃতির এই সুশীলবাবুর সঙ্গে সকলেরই মধুর সম্পর্ক।

তখন মাইনে করা তবলচী অথবা মৃদঙ্গবাদক কেউ ছিলেন বলে মনে পড়ে না। পরে অবশ্য শ্যাম কর্মকার খোলের জন্য ছিলেন আগে বলেছি। এবং তবলায় উমাপদ ঘর নামে এক ভদ্রলোক কিছু দিনের জন্য ছিলেন। সে অনেক পরে। বাইরে যখন নৃত্যাভিনয়ের দল যেত শ্যামই থাকত সঙ্গে। ওর বাড়ি ছিল আদিত্যপুরে শান্তিনিকেতনের কাছেই। এখন আর বেঁচে নেই।

একজন তবলচী ছিলেন তখন দেখেছি, নামটা মনে নেই। যতটা মনে পড়ে জাতে মেথর। মাইনে করা ছিলেন কিনা জানি না তবে প্রায় অনুষ্ঠানেই বাজাতে দেখেছি এমন কি অনেকের গান বা বাজনার ক্লাসেও সঙ্গত করতেন।

একবার ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব এসেছিলেন কয়েকদিনের জন্য। ছেলে আলি আকবর খাঁ তখন ছোট। সিংহসদনে কি একটা উৎসবের সময় খাঁ সাহেবের সরোদের সঙ্গে তিনিই তবলায় সঙ্গত করেছিলেন। বাজনার শেষে খুশী হয়ে খাঁ সাহেব জড়িয়ে ধরেছিলেন তাঁকে।

ঐ সময় খাঁ সাহেবের জন্য একটা বিশেষ প্রদর্শনী সাজিয়েছিলেন মাস্টারমশাই নানা ধরনের পুরনো আমলের ছবি দিয়ে। খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছিলেন আর মাস্টারমশাই বুঝিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। খাঁ সাহেবও নানারকম পুরানো রাগ গেয়ে শোনাচ্ছিলেন। ছেলেকে বলছেন, "দেখ, কোনটা শিখবে? এও ভাল সঙ্গীতও ভাল। যেটা শিখবে একটা শিখবে।" মাস্টারমশাইকে

বলেছিলেন আমাদের দেখিয়ে, "এঁরা আছেন ভাল। শিখছেন এখন। আমার আর আপনার সব শেষ হয়ে গেছে। আমরা এখন ওস্তাদ হয়ে গেছি যে।"

তখন আর সঙ্গীতশিক্ষক ছিলেন শান্তিদা (শ্রীশান্তিদেব ঘোষ), অমিতা সেন (খুকু), শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার কেমিস্ট্রির অধ্যাপক হয়ে এখানকার কলেজের কাজে যোগ দেন খুব সম্ভব ১৯৩২ সনে। ইনিও গুরুদেবের গান গাইতেন এবং পরে শেখাতেনও। যতদূর মনে পড়ে এঁরাই তখন গুরুদেবের গানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন শিক্ষক-শিক্ষিকা হিসেবে।

আমি কলাভবনের পাঁচ বছরের পড়া শেষ করেছি। এখান থেকে চলে যাব স্থির হয়েছে। কী করব তারপর জানি না। কোলকাতায় মাসীর বাড়ীতে জিনিসপত্র রেখে দেখা করতে এসেছি, সকলের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে। মাস্টারমশাইকে বললাম সব আমার কথা। তিনি শুনে অবাক হয়ে বললেন, "সে কি! এই তো সেদিন এলে এরই মধ্যে চলে যাবে?" তখনকার দিনে অনেকেই অনেক বছর ধরে থাকতেন কলাভবনে, সময়ের কোন বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না। আমি বললাম যে পাঁচ বছর হয়ে গেল। "এর মধ্যে পাঁচ বছর হয়ে গেল? সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করছি। সব গুরুমশাইদের সাথে, সব বন্ধু ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে। আশ্রমের বড় ছোট সকলের সাথেই। মন খুব খারাপ। তখনও গুরুদেবের সাথে দেখা করতে যাওয়া হয়নি। সন্ধ্যেবেলা বসে আছি হস্টেলে, গুরুদেবের চাকর মহাদেব এসে হাজির। "বাবামশাই ডাকছেন।" এই নামেই গুরুদেবকে এরা ডাকত। আমি ত অবাক। হঠাৎ গুরুদেব ডাকছেন কেন? আবার ভাবলাম হয়ত ভুল করেছে মহাদেব। এরকম ভুল তো প্রায়ই ও করে। একবারের কথাই মনে আছে। তখন আমি নতুন এসেছি প্রায়। মহাদেব "বাবামশাই ডাকছেন" বলে নিয়ে গেল দুপুরবেলা। আমাকে ত তেমন চেনেন না, আমাকে কেন ডাকছেন ঠিক বুঝতে পারলাম না। ছুটে গেলাম। প্রণাম করে দাঁড়িয়েছি।

"কি চাই তোমার?"

"আমাকে ডেকেছেন?"

"না-না, তোমার নাম কি?"

"শিশির।"

"এই দেখ, আমি ডাকতে বললাম সুশীলকে, আর আমি এই তোমাকে বলে

দিলাম 'স' দিয়ে যত নাম আছে তারা সবাই এল বলে। তুমি তোমার কাজের ক্ষতি করে এলে কেন ?" বলে একটু হাসলেন।

তবু গেলাম, হয়ত বা হতেও পারে কারণ তখন ত আমি তাঁর পরিচিত। কাছের মানুষ। একটা 'ডিম লাইট' জ্বলছে। ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে আছেন। প্রণাম করলাম। বসতে বললেন। পায়ের কাছে মাটির উপরেই বসে পড়লাম।

"তোমার বাঁশি আমি শুনেছি, তুমি যে আমার গান কর তা তো জানতুম না। কলাভবনের পড়াতো শেষ করলে, এখন আমার গান শেখ না কেন ? এই তো অনাদিরা (দস্তিদার) করে তো খাচ্ছে। তোমার বাবাকে লিখে দাও তোমার কোন খরচ লাগবে না এখানে। আমার একটা 'স্টাইপেণ্ড' আছে সেটা তোমাকে দেব। আর শোন, যে কোন একটা তারের যন্ত্র শিখবে গানের সঙ্গে সঙ্গে।" আর নাচ শেখার কথাও বলেছিলেন। কিন্তু তা আমার শেখা হয়নি কোনদিন নিয়মিত ক্লাসে। আমরা ছিলাম পিকনিক এক্সকার্শনের নাচের দলে। না শেখা নাচের দল।

কার কাছ থেকে যেন শুনেছেন আমার সম্বন্ধে, তাই আমাকে এইসব কথা বললেন। আর যেতে হল না এখন থেকে। মনে মনে বেঁচে গেলাম আমাদের শান্তিনিকেতনে থেকে যাবার এমন সুবর্ণ সুযোগ হয়ে যাওয়াতে। ও'র বলাই যথেষ্ট। স্টাইপেন্ডের ব্যবস্থা না করলেও থাকতেই হতো। যতদূর জানা আছে শান্তিদা সাবিত্রী দেবীও এই স্টাইপেন্ড পেয়েছিলেন আমার আগে। পনেরো টাকা করে পেতাম। তখনকার দিনে একমাস চলার পক্ষে পনের টাকাই যথেষ্ট।

আমি তখন সঙ্গীতভবনের নিয়মিত ছাত্র হয়ে গেলাম। খুব সম্ভব সেটা ১৯৩৬ সন। আমি তখন একমাত্র গানের ছাত্র সঙ্গীতভবনের। তখন সঙ্গীত-ভবন ছিল চীনাভবনের কাছে গুরুপল্লী যাবার রাস্তার চৌমাথায় টিনের চালের বাড়িতে। এটাই ছিল তখনকার 'প্রান্তনী'। চারধারে চারটি ছোট ঘর এবং মাঝখানের একটি ঘর একটু বড়ই। এই বাড়িরই একটি ছোট ঘরে ওস্তাদ আয়েত আলি খাঁ, ফুলঝুরি এবং অশেষবাবু পর পর থেকে গেছেন। ছাত্র-হিসেবে সঙ্গীতভবনে যোগ দেবার পর আমার উপর দুটো কাজের ভার পড়ল। এক—ছোট ছেলেমেয়েদের গান শেখানো আর এস্রাজ শেখানো ছোট মেয়েদের।

তখন সঙ্গীতভবনের 'প্রিন্সিপাল' ছিলেন হেমেনবাবু। তবে একটা কথা মনে আছে। রোজ মাস্টারদের সই করার জন্য কোন হাজিরা খাতা না থাকলেও প্রতি দিনের জন্য একটা করে আলগা কাগজ ছিল। তাতেই সব মাস্টারকে সই করতে হতো। ছাত্র হলেও আমাকেও করতে হতো কারণ কিছু ক্লাস আমি নিতাম। রোজ সেই সই করা কাগজ চলে যেত গুরুদেবের কাছে। আমি ঠিক জানতাম না. আমার সই করার ঘরে সই না করে ক্রস '×' চিহ্ন দিয়ে দিতাম অর্থাৎ আমি ক্লাস নিয়েছি। কিন্তু ক্রসের অর্থ অন্য রকম হয়। পর পর কয়েকদিন এরকম দেখে গুরুদেব ডেকে পাঠালেন আমাকে। "তোমার কী হয়েছে?"

"কিছু হয়নি তো!'

"তবে ক্লাস নিচ্ছ না কেন?"

"ক্লাস নিচ্ছি তো!"

"তবে তোমার সই করার ঘরে ক্রস্ চিহ্ন কেন?"

"সই না করে ক্রস্ দিয়ে দি।"

"না-না, তা না করে সই কোরো।"

প্রথম বছর পনের টাকা করে পেলাম। পরের বছর থেকে পঁচিশ টাকা করে দিলেন নিজে থেকেই। আমি তো তখন সঙ্গীতভবনের ছাত্র। ক্লাসে গান শিখি, সমস্ত নৃত্যাভিনয় ও নানারকম উৎসব অনুষ্ঠানের মহড়ায় নিয়মিত যোগ দিই যেমন আগেও দিতাম। এই সব মহড়ার সময় সর্বদা গুরুদেব উপস্থিত থেকে নির্দেশ দিতেন এবং পরিচালনা করতেন শান্তিদা। প্রতিদিন সন্ধ্যে-বেলা মহড়া হতো। অনেক সময় দিনের বেলাতেও। একেক সময় আমাদের বিরক্ত লাগত দিনের পর দিন মহড়ায় উপস্থিত থাকতে। কিন্তু যদি কোনদিন কোন কারণে রিহার্সেল না থাকত তাহলে কিন্তু মোটেই ভাল লাগত না। মনে হতো আজকে কোন কিছু করার নেই, ভীষণ ফাঁকা লাগত এমনই অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল।

আমাদের সময় যে সব নৃত্যাভিনয় হয়েছিল তা হল শাপমোচন, চিত্রাঙ্গদা, শ্যামা, চণ্ডালিকা, তাসের দেশ এবং এসব ছাড়া বর্ষামঙ্গল, বসন্তোৎসব প্রভৃতির জন্য নতুন নতুন গান তৈরী হয়েছিল। এই সব ঋতু উৎসবের সঙ্গে কন্সার্টও তৈরী হতো গুরুদেবের গান দিয়ে।

প্রথমে আমি অভিনয় পার্টির সঙ্গে যাই সিলোন ১৯৩৪ সনে। কোলকাতা থেকে জাহাজে করে দু'দিনে পেঁৗছেছিলাম। জাহাজের নাম 'ইঁচাঙ্গা'। সন্ধ্যার পর আমরা উঠলাম জাহাজে। ছেলেদের জন্য ব্যবস্থা হয়েছিল 'ডেকে' থাকবার আর মেয়েদের জন্য সেকেন্ড ক্লাসে নীচে। সে যা কান্ড হয়েছিল। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছি। অন্ধকার থাকতেই কে যেন ডাকাডাকি করে তুলে দিল, সমুদ্র এসে গেছে, সমুদ্র এসে গেছে।'' ছোটাছুটি করে জাহাজের সামনে চলে গেলাম সবাই। বিশেষ কিছুই বুঝতে পারলাম না অন্ধকারে। সকাল হলে দেখতে পেলাম ঘন কালছিটে নীল রঙের সমুদ্র। জীবনে প্রথম দেখা সেই সমুদ্রের রূপ এখনো মনে আছে। মাস্টারমশাই বলেছিলেন আগে, ''দেখবে কত রকমের ঢেউ। যখন ঢেউ ভাঙবে দেখতে পাবে কতরকমের সবুজ রং। ঢেউ স্টাডি করে শেষ করতে পারবে না।' জাহাজের পাশ দিয়ে একরকমের ছোট ছোট বড় পাখনাওয়ালা মাছ জলের থেকে লাফিয়ে উঠে বেশ খানিকটা উড়ে গিয়ে ঝপাং করে আবার জলে পড়ছে ঝাঁকে ঝাঁকে। কিন্তু ঢেউ স্টাডি করা আর সমুদ্র উপভোগ করা মাথায় উঠল সকলেরই যখন কাগজের নৌকার মত দুলতে আরম্ভ করল অতবড় জাহাজখানা। 'সি সিকনেসে' সবাই কাহিল। সবচাইতে বিপদ হল মেয়েদের। ওরা ত নীচে জাহাজের খোলের মধ্যে ছিল; দোলাটা আমাদের চাইতে আরও বেশি করে কাহিল করেছিল ওদের। আমরা 'ডেকে' থাকাতে তবু বাইরেটা দেখতে পাচ্ছিলাম। মেয়েরা তো কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, শুধুই দুলুনি। সবচাইতে অবস্থা খারাপ যমুনা আর রাণী চন্দর। মেয়েরা বিছানা নিয়ে নীচের থেকে বেরিয়ে 'ডেকে' এসে উপস্থিত। আর সবাই তো সামলে নিল কোনরকমে। কিন্তু যমুনা আর রাণীদি বিছানা থেকে উঠতেই পারল না। আমাদের দলের সঙ্গে যোধাবাবু নামে এক ভদ্রলোক গুরুদেবের পরিচারক হয়ে গিয়েছিলেন। গুরুদেব তো আমাদের সঙ্গেই ছিলেন ফার্স্ট ক্লাসে ওপরে। খুব বিড়ি খেতেন যোধাবাবু। সিলোনে বিড়ি পাওয়া যাবে না ভেবে এক সুটকেস ভরতি বিঁড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন। ভদ্রলোক বহুবার সমুদ্র পাড়ি দিয়েছেন তাই তাঁর কিছু হয়নি। আমাদের ত এত শরীর খারাপ হয়ে গেল যে কিছুই খেতে ইচ্ছে করে না। খালি শুয়েই থাকি। যোধাবাবু আমাদের বললেন, ''ওহে, জোর করে খাওয়াদাওয়া কর তাহলেই তাড়াতাড়ি সেরে যাবে তা না হলে উপায় নেই। তাঁর কথামত জোর করে খেয়েদেয়ে তবে

আমরা ঠিক হলাম। প্রথম দিন তো আমাদের মাংস দিয়েছে। জয়ন্তীলাল পারেক মাছমাংস খায় না। তার শখ হ'ল মাংস খাবে। যোধাবাবু বললেন, "কি হে মাছ-মাংস তো ছোঁও না, এদিকে জিভটি তো বেশ মেরে দিলে।" তার মানে? তখনই জানতে পারলাম গোরুর মাংস দিয়েছে আমাদের। জীবনে না জেনে সেই প্রথম গোরু খেয়েছিলাম।

ছ'দিনের দিন বিকেলে আমরা কলম্বো পেঁছিলাম। দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি কত আখের ক্ষেত। পরে কাছে এসে বুঝতে পারলাম সব নারকেল গাছ। এত নারকেল গাছ এর আগে কোথাও দেখিনি। ওখানে যেখানেই যাওয়া হতো প্রথমেই নারকেলের জল বা নারকেলের দুধ দিয়ে আপ্যায়ন করা হতো। নারকেলের জলের মধ্যে কচিডাবের শাঁস দেওয়া।

সিলোনে যতদূর মনে পড়ে এক সপ্তাহ কম দু'মাস থেকে নানা জায়গায় সতের রাত শাপমোচন অভিনয় হয়েছিল। কলম্বো, গল, মাতারা, অনুরাধাপুর জাফনা এইসব শহরে অভিনয় হয়েছিল। সমস্ত শহরেই যাওয়া হয়েছিল মোটরে, শুধু অনুরাধাপুর থেকে জাফনা যাওয়া হয়েছিল ট্রেনে। ক্যানডিতে কোন অভিনয় হয়নি। শুধ বেড়াতে যাওয়া হয়েছিল ওখানে। পাহাড়ের উপর খুব সুন্দর শহর। ওখানকার 'বটানিক্যাল গার্ডেন' মনে রাখবার মত। ওখানেই প্রথম দেখি নাগলিঙ্গমের গাছ। ইংরাজী নাম 'ক্যানন্ বল ট্রি'। গাছের তলায় নোটিশ লাগান আছে তলায় না যাবার জন্য। বিরাট আকারে খুব ভারি এর ফল, অনেকটা বেলের মত দেখতে। মাথায় পড়লে আর রক্ষা নেই।

সিলোনের বিখ্যাত পুরুষ মানুষের ক্যানডি নৃত্য দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল। পুরুষেরা দল বেঁধে এই নাচ নাচে। সিংহলের মুখোশ নৃত্যও দেখেছি। ভারি ভারি কাঠের মুখোশ পরে এই নাচ। অনেক জায়গ তেই এসব নৃত্য আমাদের দেখাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কোন 'স্টেজে' নয়, খোলা মাঠের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে এই নাচ। এরকম পুরুষালী নাচ আগে দেখেনি, বিশেষ করে মনে পড়ে একটি অতি মোটাসোটা লোকের নাচ। কি অবলীলাক্রমে অতক্ষণ ধরে নাচল লোকটি। লাফিয়ে বোঁ বোঁ করে ঘুরে নাচছে শূন্যে। যে লোকটির নাচের কথা বললাম সে হাতে পানতেরু নামে একটা গোল চাকতির মত যন্ত্র নিয়ে নাচছিল। নাচের তালে তালে সেটা ঝাঁকিয়ে শব্দ করছিল।

মাস্টারমশাই অনেক স্কেচ করেছিলেন এই সব নাচের। আমরাও কিছু কিছু করেছি। আমার করা সেই মোটা লোকটির পানতেরু নৃত্যের একটা রঙিন ছবি কলাভবন মিউজিয়ামে আছে। কালো রঙের সব লোক। খালিগায়ে সাদা পুঁথির গয়না সমস্ত গাময় ঝলমল করছিল। শান্তিদা রাবণের কাণ্ড মুখোশ অভিনয়ে রাবণের সীতা-হরণের শেষ নাচে এই ক্যান্ডি নাচ নেচেই তো মাতিয়ে দিয়েছিলেন। কী জোরালো সেই নাচ হয়েছিল বড় বড় ড্রাম ও জগঝম্প জাতীয় যন্ত্রের তালে তালে। ওখান থেকে শিখে এসেছিলেন শান্তিদা ঐ নাচ।

সমস্ত সিলোনে যেখানেই গেছি এমন আদর যত্ন খুব কম জায়গাতেই পেয়েছি। এত আন্তরিকতা! সব জায়গাতেই রাজার হালে রাখা হয়েছিল আমাদের। মনে পড়ে পানাড়ুরায় একেবারে সমুদ্রের ধারে উইলমট্ পেরেরার নারকেল বাগানের মধ্যে বিরাট বাড়ির কথা। কত সহজ সম্বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সকলের সঙ্গেই যেন কতদিনের পরিচয় আরও মনে পড়ে রোজ সন্ধ্যাবেলা সমুদ্রের ধারে বালির উপর বসে প্রায় উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার মত হাওয়া খাওয়া অথবা বালির উপর নানারকম ঝিনুক বা শামুক কুড়িয়ে বেড়াবার প্রতিযোগিতা। ছোট ছোট এক জাতের কচ্ছপ যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াত। মাস্টারমশাই যার নাম দিয়েছিলেন 'মিস্টার পানাড়ুরা'। আসবার সময় কয়েকটা নিয়ে আসা হয়েছিল সঙ্গে করে। আজও বোধহয় রাণীদির (চন্দ) বাগানে অথবা উত্তরায়ণের বাগানে আছে দুই একটা। এই কচ্ছপের নাম 'কিরিম্বা'।

সিলোন পার্টির সঙ্গে ছিলেন মণিপুরী নাচের মাস্টার শ্রীযুক্ত নবকুমার ঠাকুর এবং তাঁর ছেলে নরেন্দ্র। আগরতলার লোক। ওঁরা আমাদের সাথে জাহাজে যাননি। সাত্ত্বিক লোক। জাহাজে খাওয়াদাওয়ার অসুবিধার জন্য ট্রেনে করে গিয়েছিলেন শৈলজাবাবুর সঙ্গে। নবকুমারবাবুকে নিয়ে মাস্টারমশাই খুব মজা করতেন। খুব খুঁতখুঁতে লোক নবকুমার বাবু। মাস্টারমশাই প্রায়ই নানারকমভাবে পেছনে লাগতেন। একদিন বলছেন, "কিসের দুধ খাচ্ছেন মশাই এখানে জানেন? এখানে হাতির দুধ ছাড়া পাওয়া যায় না।" নবকুমার-বাবু নাক সিঁটকিয়ে বলে উঠলেন, "রাম রাম রাম, তা হলে তো আর দুধ খাওয়া হবে না।" কোথাও যাওয়া হবে, মালপত্র সব বাসে বা ট্রাকে তোলা হচ্ছে। নতুন সুটকেসের প্রতি সর্বদা দৃষ্টি, পাছে নষ্ট হয়ে যায়। কারো বাক্সের নীচে পড়ে ঘসা খেয়ে দাগ ধরে যাবে এই ভয় সব সময়। হঠাৎ মাস্টারমশাই এসে

নবকুমারবাবুর সামনে মিথ্যে করে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছেন, "ইস্‌ কার গেল নতুন সুটকেসটার উপর একটা ট্রাঙ্ক চাপিয়ে একেবারে নষ্ট করে দিল।" শুনেই লাফিয়ে উঠে 'কোথায়' বলে ছুটলেন নবকুমারবাবু। আর একটা কান্ড করতেন দেখেছি। আমি, নবকুমারবাবু এবং মাস্টারমশাই একই ঘরে থাকতাম উইলমট্‌ পেরেরার বাড়িতে। রোজই দেখতাম খাওয়াদাওয়ার পর টিনের থেকে বের করে একটা সিগারেট ধরিয়ে টিনটা পাশেই খোলা রেখে উল্টোদিকে মুখ করে কাত হয়ে শুতেন। এদিকে ছেলে দরজার পাশে আড়ালে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। যেই বাপ কাত হয়ে শুয়েছেন অমনি চুপি চুপি ঘরে ঢুকে কয়েকটা সিগারেট বের করে নিয়ে চলে গেল। আড় নয়নে দেখে নিয়ে নবকুমারবাবু চিত হয়ে শুয়ে সিগারেট টানতে লাগলেন টিনটা বন্ধ করে দিয়ে। প্রত্যেক দিনই এই ব্যাপার হ'তে দেখতাম।

খাওয়াদাওয়ার জিনিস প্রচুর। নানারকম ফলের মধ্যে মনে পড়ে ইয়া বড় বড় মিষ্টি পেঁপে আর বিরাট আকারের মিষ্টি আনারসের কথা। আর নানারকম তরকারীর মধ্যে মনে পড়ে ব্রেড্‌ফ্রুট্‌ নামে কাঁঠালের মত দেখতে একরকম তরকারী। প্রত্যেক বাড়িতেই এই গাছ দেখতে পেতাম। যতদূর মনে পড়ে এই গাছের পাতা অনেকটা পেঁপেপাতার মত।

এখানে যতদিন ছিলাম প্রায়ই বিশিষ্ট সব ব্যক্তিদের বাড়িতে নেমতন্ন হতো। তার মধ্যে বিশেষ করে মনে পড়ে এক গুজরাটী মুসলমান ভদ্রলোকের বাড়ির কথা। ছোট ছোট আলাদা ঘরে চারজন করে খাবার ব্যবস্থা। ভেলভেটের বিছানা তাকিয়া মেঝের উপর। ফুলদানিতে ফুল দিয়ে সাজানো আর প্রত্যেকের সামনে রুপোর মোমদানিতে মোম জ্বলছে। আতরের গন্ধ ভুর ভুর করছে। আর খাওয়ার কথা কি বলব! সব মোগলাই খাবার কত রকমের! ভদ্রলোক নিজে জরির চোগা চাপকান জরির টুপি পরে সেজেগুজে আমাদের আদর আপ্যায়ন করেছিলেন। আর যারা পরিবেশন করেছিল বাবুর্চি তারাও একেবারে কেতা দুরস্ত। চিরকাল মনে থাকবে সেই ভদ্রলোকের বাড়ির খাওয়ার কথা। সবশেষে ফুলের বাগানে বসে আইসক্রীম খাওয়া।

সিলোনের প্রতিটি শহর অতি সুন্দর। আমার জীবনের অভিনয় পার্টির সঙ্গে ভ্রমণের প্রথম অতি মধুর অভিজ্ঞতার কথা মনের মধ্যে আজও গেঁথে আছে যা ভোলা যাবে না কোনদিন।

এই সিলোন পার্টির পর ভারতবর্ষের অনেক জায়গাতেই গুরুদেবের সঙ্গে চিত্রাঙ্গদা, শ্যামা, চণ্ডালিকা, তাসের দেশ, বর্ষামঙ্গল প্রভৃতি নানা নৃত্যাভিনয় এবং অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গেছি। দিল্লীতে ১৯৩৬ সনে গুরুদেব যখন পার্টি নিয়ে গেলেন তখন গান্ধীজী তাঁকে অনুরোধ করে বলেছিলেন এই বয়সে আর কোন পার্টি নিয়ে না ঘুরতে। এই অনুরোধ পুরোপুরি রাখতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না। এর পরও অন্তত কোলকাতায় বেশ কয়েকবারই স্টেজে বসে অনুষ্ঠান করিয়েছেন। ছায়া স্টেজে যেবার বর্ষামঙ্গল করলেন তারপরই খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।

এইসব অভিনয় পার্টিতে যারা যেতাম ঠিক একটা পরিবারের লোকের মতো। নানারকম ঘটনা ঘটত স্টেজে। ছায়া স্টেজের কথায় মনে পড়ে গুরুদেবের অপূর্ব 'ঝুলন' আবৃত্তির কথা আর তার সঙ্গে শান্তিদার নাচ।

'ছায়া' স্টেজে অনেক অঘটনও ঘটেছিল যেমন অনেক জায়গাতে ঘটে থাকত। বাইরে থেকে এসব বোঝা যেত না। কোন একজন মেয়ে একেবারে অন্য স্কেলে আগা সে গোড়া কোরাসে গেয়ে গেল। শান্তিদা ঠিক বুঝতে পারছেন না কে। একে একবার ছড়ের খোঁচা তাকে একবার ছড়ের খোঁচা দিচ্ছেন আর তারা বিরক্তিভরে কট্‌ কট্‌ করে তাকাচ্ছে। কনসার্টের সময় একটি মেয়ে সেতারের পর্দা না সরিয়ে একই ঠাটের পর্দার উপর 'ইমন' ও 'ভৈরবী' দুটো সম্পূর্ণ আলাদা রাগের গান বাজিয়ে গেল ; আর সুশীলবাবুর কি অবস্থা! ওই ছায়া স্টেজের কথাই বলি। ওখানে বর্ষামঙ্গল যেবার হ'ল অনেক নতুন নতুন গান তৈরী হয়েছিল। গুরুদেব সেইসব গানের মহড়া কিছুদিন শান্তিনিকেতনে আমাদের নিয়ে দিয়ে কলকাতায় চলে গেলেন ওখানকার দলকে তৈরী করার জন্য। শান্তিদা আমাদের নিয়ে এখানে (শান্তিনিকেতনে) মহড়া দিতে লাগলেন। পরে আমরা কলকাতায় গিয়ে ওখানকার দলের সঙ্গে যোগ দিলাম।

প্রথম দিনের অনুষ্ঠান দেখে অনেকে বললেন গুরুদেবকে যে ছেলেদের "থামাও রিমিকি ঝিমিকি বরিষণ" গানটির কথা বোঝা যায় নি। গানের কথা শোনা না গেলে খুব অখুশী হতেন গুরুদেব। তাই পরের দিন অন্য ব্যবস্থা হল তাঁর কথামত। স্টেজের পেছনে একটি বেঞ্চ রাখা হ'ল এবং আদেশ হল আমাদের ছেলেদের ওপর ঐ বেঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে গাইবার জন্য। আমরা তাই করেছিলাম। অনেক ঘটনাই তো ঘটত।

একবারের একটা মজার ঘটনার কথা বলি। যেবার আসানসোলে চিত্রাঙ্গদা হ'ল সেবারের কথা। তখন অবশ্য গুরুদেব ছিলেন না। খোলা মাঠে স্টেজ সাজানো হয়েছিল। সমস্ত অডিটোরিয়াম এবং স্টেজের জায়গা ত্রিপল দিয়ে ঢেকে দেওয়া। বাঁশ এবং মোটা মোটা লোহার পাইপ দিয়ে ফ্রেম করে তার উপরে ত্রিপল দিয়ে ঢাকা। খুব সুন্দর ক'রে সাজানো স্টেজ। সুরেনবাবুর যেমন নিখুঁত সাজানো। "আর একটু ওপরে, উঁহু একটু নামবে"—এইরকম ভাবে। অভিনয় আরম্ভ হবার আগে নামল বৃষ্টি। সে কি প্রচণ্ড বৃষ্টি! আমরা তো তৈরী কিন্তু কি করে আরম্ভ হবে? কি আর করা, 'গ্রীনরুমে' সবাই মিলে খুব গান বাজনা জমিয়েছি। এদিকে ত্রিপলের উপর জল জমে অত নিখুঁতভাবে সাজানো স্টেজ বেঁকে ভেঙ্গে একাকার। অডিটোরিয়ামেরও একই অবস্থা। বাঁশ দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জল বের করে দেওয়া হ'ল বৃষ্টি থামবার পর। দেরি হয়ে গেলেও আরম্ভ হ'ল অভিনয় ঐ ভাঙ্গা স্টেজেই। প্রথমেই নানা রঙের ফ্লাড্‌লাইটের আলো ফেলা হচ্ছে বদলে বদলে যেমন হয়ে থাকে আর সেইসঙ্গে "মোহিনীমায়া এল" গান হচ্ছে। প্রথমেই ঢুকল, ঝাড়ুদার ঝাঁট দিতে দিতে। তাকে তো তাড়ানো হ'ল উইংএর পাশ থেকে। তারপরেই একটি কুকুরের প্রবেশ। সেও পালাল তাড়া খেয়ে।

গুরুদেবের সঙ্গে যে সব জায়গ তেই গিয়েছি আমাদের সেকেণ্ড ক্লাস বগি রিজার্ভ করে যাওয়া হতো, শুধু গুরুদেবের জন্য ফার্স্টক্লাস। সব জায়গাতেই আমাদের 'বগি' কেটে রেখে দেবার বন্দোবস্ত করা ছিল। তখন তো থার্ড ক্লাসও ছিল। গাড়িতে খুব আনন্দ করতে করতে যাওয়া হতো। নাচ গান নানারকম খেলা খুব জমত আমাদের। যেখানেই যাওয়া হয়েছে সেখানেই জায়গাটি ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হতো। দিল্লী, লাহোর, মীরাট, এলাহাবাদ, অমৃতসর, বম্বে, লখনৌ, মাদ্রাজ, ত্রিচিনাপল্লী, মাদুরা, মহাবলিপুরম প্রভৃতি জায়গায় যাওয়া হয়েছিল। অমৃতসর, ত্রিচিনাপল্লী ও মাদুরাতে অভিনয় হয়নি। শুধু দেখবার জন্য যাওয়া। এসব জায়গাতেই যে গুরুদেব আমাদের সঙ্গে ছিলেন এমন নয়।

লখনৌতে মনে পড়ে বার দুই যাওয়া হয়েছে বোধহয়। প্রথমবার আমি যাইনি। পরের বারের কথাই মনে আছে। সেবার প্রতিদিন দুবার করে অভিনয় হয়েছিল। গুরুদেব সঙ্গে ছিলেন না। শুনে খুব রাগ করেছিলেন একদিনে দুবার করার জন্য, ছোট ছোট মেয়েদের খুব কষ্ট হয়েছে এই ভেবে।

যে সব জায়গার কথা বললাম তাছাড়াও আরো অনেক জায়গাতেই যাওয়া হয়েছে। তখনকার পূর্ববঙ্গের কোন কোন শহরে যেমন মইমনসিং, সীলেট, কুমিল্লা, শিলং এবং খুলনা তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরে। যেবার খুলনাতে যাওয়া হয়েছিল সেবারের একটা ঘটনার কথা বলি। আমরা তো শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতা হয়ে খুলনা যাব। এক রাত কলকাতায় থেকে পরের দিনই দুপুরের গাড়িতে রওয়ানা হতে হবে। সন্ধ্যের গাড়িতে কলকাতায় এসে জোড়াসাঁকোয় উঠলাম কয়েকখানা ট্যাক্সি ভাড়া করে হাওড়া থেকে আসা হয়েছে। শান্তিদা যে ট্যাক্সিতে ছিলেন সেই সঙ্গেই সন্তোষদার বেহালা দিয়ে দিয়েছিলেন। নামবার সময় বেহালা ভুলে রয়ে গেল ট্যাক্সিতেই। সর্বনাশ, এখন উপায়? পরের দিনই আমরা রওয়ানা হয়ে যাব। রথীদা সন্তোষদাকে বললেন, "আমার ড্রাইভারকে নিয়ে হাওড়ায় যাও। ওর সঙ্গে অনেক ট্যাক্সি-ওয়ালার চেনা আছে। হয়ত কোন খোঁজ পাওয়া যেতে পারে। তাই হল। গেলেন সন্তোষদা ড্রাইভারকে নিয়ে। খোঁজ করতে করতে একজন ট্যাক্সিওয়ালা বলল, "হ্যাঁ, কাল রাত্রে একসঙ্গে কয়েকখানা গাড়ি গিয়েছিল। তার মধ্যে একজন ট্যাক্সিওয়ালা বলছিল একটা মাল বাবুরা ছেড়ে দিয়েছে। ফিরিয়ে দিতে গেলে ভাড়া দেবে কিনা কে জানে। এইমাত্র প্যাসেঞ্জার নিয়ে ভবানীপুরে গেছে। কখন আসবে কে জানে।" সেই ট্যাক্সিওয়ালাকেই বলে এলেন সন্তোষদা যে বলে দিও ওকে মাল ফিরিয়ে দিয়ে এলে ভাড়া তো পাবেই উপরন্তু বক্‌সিস্‌ও পাবে, আর তাছাড়া রথীদার ড্রাইভারও তাকে চেনে। বাড়িতে এসে ভোলাবাবুকে (রথীদার ম্যানেজার) বলে দেওয়া হল যদি আসে তহলে যেন তার ভাড়া এবং বক্‌সিস্‌ দিয়ে দেওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা টেলিগ্রাম করে দেওয়া হয় খুলনাতে পার্টির নামে। আমরা ত রওয়ানা হয়ে গেলাম। পরের দিন অভিনয়। বিকেলবেলা সন্তোষদা বললেন, "চলুন মশাই পোস্টাফিসে খোঁজ নিয়ে আসি কোন টেলিগ্রাম এল কিনা।" গেলাম দুজনে। জিজ্ঞেস করা হল পোস্টমাস্টারকে কোন টেলিগ্রাম এসেছে কিনা শান্তিনিকেতন পার্টির নামে। "বলব কেন আপনাদের?" ঘটনার কথা অনেক বুঝিয়ে বলাতে এবং আমরা যে শান্তিনিকেতন পার্টির তাই শুনে ভদ্রলোক বললেন যে বেহালা পাওয়া গেছে। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল, সন্তোষদার ত বটেই আমাদেরও। "চলুন মশাই ডাব খাওয়া যাক।" ডাব খেয়ে গলা ভেজাবারই অবস্থা বটে।

কি বড় বড় ডাব। একটার জল খেয়ে শেষ করা যায় না। তাই খেয়ে সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ফিরলাম। এইরকম কত ঘটনাই ঘটত। ছোটখাটো ঘটনার ত অন্ত ছিল না।

গুরুদেবকে কতভাবে দেখেছি কত কাছে থেকে। যেবার ইরিসিপেলাসে আক্রান্ত হলেন আমি তখন কলাভবনের ছাত্র। জ্ঞান নেই। আশ্রম ভারাক্রান্ত সবাই উদ্বিগ্ন। উত্তরায়ণে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। গেটের বাইরে একটা বোর্ডে লিখে দেওয়া হতো কখন কি অবস্থা। কলকাতা থেকে ডাঃ নীলরতন সরকার থেকে আরম্ভ করে বহু ডাক্তারের আনাগোনা। তখন বোলপুরে তেমন ভাল ওষুধের দোকান ছিল না। সব ওষুধ কলকাতা থেকে আনতে হবে ডাক্তারের কথামত। যতদূর মনে পড়ে বুলা মহলানবিশ মশাই বিকেলের গাড়িতে রওয়ানা হয়ে গেলেন ওষুধের লিস্ট নিয়ে। কি একটা ওষুধের কথা ভুল হয়ে গেছে লিস্টে লিখতে, হঠাৎ মনে পড়ায় তখনই তাঁকে সেই ওষুধের কথা বলে আসতে হবে। ট্রেনের সময় হয়ে গেছে। সুরেনবাবু তখনই আমাকে সেই ওষুধের লিস্ট দিয়ে সাইকেলে করে পাঠিয়ে দিলেন। যে করেই হোক ধরতে হবে তাকে। তখনকার কী রাস্তা বোলপুরে যাবার। ট্রেন ছাড়ে ছাড়ে এই অবস্থায় আমি গিয়ে বুলাবাবুর হাতে লিস্টটা দিয়ে দিলাম। সেই থেকেই উত্তরায়ণে থাকি। গুরুদেবের কানের পাশে যে জায়গাটা ব্যাণ্ডেজ করা ছিল, অজ্ঞান অবস্থায় অনবরতই সেই ব্যাণ্ডেজ ধরে টানতেন। সব সময়ই একজনকে কাছে বসে থাকতে হতো যাতে হাত না লাগান। আমাকেও মাঝে মাঝে বসতে হতো। সব সময় নজর রাখা, হাত দিলেই হাত সরিয়ে দেওয়া। রাতদিন একজনকে থাকতেই হতো। আমরা কয়েকজন রাতদিন ওখানেই থাকি। ছাত্রদের মধ্যে বোধহয় আমিই একা।

এই রকম অজ্ঞান অবস্থায় কয়েকদিন ছিলেন। যেদিন প্রথম জ্ঞান ফিরল সেই শেষরাত্রের দৃশ্য চিরজীবন মনে থাকবে। শান্তিদা, তারকদা ও আমি প্যাসেজে ঘুমিয়ে আছি। আলুদা পশ্চিমের বারান্দায় যেখানে রিহার্সেল হতো সেইখান ঘুমিয়ে। সুধাকান্তদার তখন ডিউটি। হঠাৎ 'আলু আলু' সুধাকান্তদার চীৎকারে আমরা জেগে লাফিয়ে উঠে যে দৃশ্য দেখেছিলাম আজও চোখে লেগে আছে। পরনে কোন বস্ত্র নেই। অজ্ঞান অবস্থায় গায়ের ওপর একটা চাদর ঢাকা দেওয়া থাকত। পাশ ফিরে দাঁড়ানো ঝুঁকে পড়া লম্বা দুধে

আলতার রঙের চেহারা নীল রঙের মৃদু আলোতে। নাগা সন্ন্যাসী দেখিনি কোনদিন, গল্পই শুনেছি, যেন একেবারে তাই। খালি বলছেন, "তুই ছাড় না আমি পারব।" সুধাকান্তদা যেতে দেবেন না, জড়িয়ে ধরে আছেন। বাথরুমে যাবেন। আমি, শান্তিদা ও তারকদা অবাক হয়ে সেই দৃশ্য দেখছি। একেবারে ভুলেই গেছি গিয়ে সুধাকান্তদাকে সাহায্য করতে অথবা আলুদাকে ডেকে দিতে।

এই অসুখের পর গুরুদেব কানে কম শুনতেন। বেশ কিছুদিন পর একদিন সন্ধ্যাবেলা ডাক এল গুরুদেবের কাছ থেকে। পূর্ববঙ্গের ভাটিয়ালী গান শুনবেন। যখন দেশে যেতাম ছুটিতে তখন কিছু কিছু ওখানকার লোকসঙ্গীত শিখতাম এর ওর কাছ থেকে। এখানে আসবার আগেও কিছু শেখা ছিল। কারো কাছে শুনে থাকবেন সে কথা। ভয়ে ভয়ে গেলাম দোতারাটা নিয়ে। কানে তখন কম শুনতেন বলে একেবারে পায়ের কাছে বসে বেশ কয়েকখানা গান শুনিয়েছিলাম। গানের সঙ্গে সঙ্গে হাতে তাল দিচ্ছিলেন। খুব চাঁদের আলোতে পূবদিকের বারান্দায় বসে গান শুনিয়েছিলাম। সুরেনবাবু এবং আরও দুই একজন ছিলেন সেখানে।

সঙ্গীতভবনে যখন ছিলাম তখন গুরুদেবের নির্দেশে আমি এবং ইন্দুদি (শ্রীমতী ইন্দুলেখা ঘোষ) রোজ খেলার ঘণ্টার সময় ওঁর কাছে গান শিখতে যেতাম বোধহয় আগেই বলেছি। এক লাইনই এতবার করে গাইতেন যে আমাদের শিখতে কোন কষ্টই হতো না। প্রথমে খুব ভয় হয়েছিল কিছু ওঁর শেখানোর পদ্ধতিতে আর একেবারেই ভয় রইল না।

॥ ৮ ॥

সঙ্গীতভবনে তিন বছর থাকার পর হঠাৎ একদিন সকালে মাস্টারমশাই এসে বললেন, "সুরুলে চাকরী ঠিক হয়েছে তোমার।" শুনে প্রথমে একটু খারাপই লেগেছিল কারণ সুরুল সম্বন্ধে আমাদের একটু নাকসিঁটকানো ভাব ছিল। তখন সুরুল বলতে শ্রীনিকেতনকেই বোঝাত। বলতে ভুলে গেছি, এর আগে শিক্ষাসত্রে একঘণ্টা করে গান শেখাতে যেতাম। ধীরেনদার (ডঃ ডি. এম. সেন)

উপর তখন শিক্ষাসত্রের ভার। তাঁর সাইকেল নিয়ে রোজ সকালে গান শেখাতে আসতাম মাঝে মাঝে শেষরাত্রে বৈতালিক হতো। যেদিন বৈতালিক হতো ধীরেনদা তাঁর ছোট্ট গাড়ি করে রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর কলাভবন হস্টেল থেকে আমাকে নিয়ে আসতেন। দুজনে বড় বাড়ির তেতলায় থাকতাম রাত্রে আর বৈতালিকের পর সকালে ফিরে আসতাম।

এর পর রথীদা একদিন ডেকে শ্রীনিকেতনের শিক্ষাসত্রের চাকরীর কথা বললেন। ছেলেদের গান ও ছবি আঁকা শেখাতে হবে। গুরুদেবের অনুমতিক্রমেই এটা হয়েছিল বলাই বাহুল্য। আমি তো শ্রীনিকেতনে চাকরী নিয়ে এলাম। ক্রমে শিক্ষাসত্রের ছেলেদের ছাড়াও 'গার্ল'স স্কুলের ছোটদের এবং পল্লীর ছোট ছেলেমেয়েদের গান শেখাবার ভারও পড়ল। এমনকি পল্লীর মহিলারাও গান শিখতেন আলাদা ক্লাস করে।

গার্ল'স স্কুল নাম হলেও এখানে গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পড়তে আসত। বেশীর ভাগই সুরুল থেকে, পল্লীরও কিছু এমনকি বল্লভপুর গ্রাম থেকেও। গান ছাড়াও এদের ছবি আঁকাও শেখাতে হতো আমাকে। প্রথমে ছোট্ট একটা খুব নিচু চালওয়ালা খড়ের বাড়িতে এই গার্ল'স স্কুলের ক্লাস হতো। এই বাড়িটার চারদিকেই ঘোরানো বারান্দা ছিল আর সেই বারান্দার উপরের চাল খুবই নিচু ছিল। মাথা নিচু করে ঢুকতেও কষ্ট হতো।

কত ছোট ছোট অনুষ্ঠানে গুরুদেব উপস্থিত হ'তেন ঐ বয়সেও, এই গার্ল'স স্কুলের কথাতেই মনে পড়ল। এখানকার বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের সভাতে তাঁকে আমন্ত্রণ করা হ'ল। গুরুদেব তখন কিছুদিন শ্রীনিকেতনেই ।ছলেন বড়বাড়ির তেতলায়।

সেই সভায় গুরুদেব এসেছিলেন। মাথা নিচু করে ঢুকলেন সেই খড়ের বাড়িতে। আমি তো কয়েকখানা গান তৈরী করিয়েছি বাচ্চাদের দিয়ে। প্রথম গান যখন আরম্ভ হ'ল গুরুদেব ঘাড় ঘুরিয়ে কট্‌মট্‌ করে তাকালেন। আমি ত ভয়ে অস্থির। অনুষ্ঠানের পর আমাকে বললেন, "ছোটদের গান শেখাবার সময় ওদের উপযুক্ত গান বেছে নিও। এসব গান ওদের জন্য নয়।" আমি একেবারে নতুন। এসব সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না।

পরে আর একদিন তেতলায় ডেকে পাঠিয়েও কি ধরনের গান শেখাতে হবে তা বলেছিলেন। যেদিন ডেকে পাঠিয়েছিলেন সেদিন বেশ একটু মজা করে

কথা বলেছিলেন। সুধাকান্তদা ছিলেন ওঁর কাছে। খবর দিলেন, "শিশির এসেছে।" জিগেস করলেন, "কোন্ শিশির?" শ্রীনিকেতনের গানের শিশির।" "ও তাই বল, আমি ভাবলাম গেস্টহাউসের শিশির। তাকে অবশ্য শিশির না বলে ঝরনা বলাই উচিত।" গেস্টহাউসের ম্যানেজার শ্রীশিশির মিত্র মোটা ছিলেন আর আমি তো রোগা পটকা।

গুরুদেবকে এমনিভাবে বড় ছোট কত অনুষ্ঠানেই দেখেছি। দেখেছি সব অনুষ্ঠানই তাঁর উপস্থিতিতে ভরাট হয়ে উঠতো। তাঁর তিরোধানের পর বহুদিন পর্যন্ত তাঁর অভাবটা এত বেশি অনুভব করতাম যে সেটা সহজেই অনুমেয়।

বাঁশিওয়ালা বলে ডাকতেন আমাকে। 'ইরিসিপেলাসের পর অনেকদিন আমাদের মহড়ার সময় উপস্থিত থাকতে পারতেন না। পশ্চিমের বারান্দায় যেখানে রিহার্সেল হতো তার দক্ষিণের ঘরেই শুয়ে থাকতেন। একটা কিসের মহড়া দিচ্ছি আমরা। গুরুদেব তো উপস্থিত নেই। কার গানের সঙ্গে যেন আমি একটু সুরের এদিক ওদিক করে একটু কায়দা করেই বাজাচ্ছি গুরুদেব ত শুনতে পাবেন না এই ভেবে। কিন্তু ঠিক শুনতে পেয়েছেন পাশের ঘর থেকে। স্বভাবতই পছন্দ হয়নি বাজানো তাই তখনই ডেকে পাঠিয়ে বললেন, "ওহে বাঁশিওয়ালা, একটু অভ্যাস করে নিও। এরকম মাঝে মাঝেই অভ্যাস করে নিতে বলতেন বাঁশিওয়ালাকে।

নৃত্যাভিনয় ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের মহড়ার সময় দেখেছি আমরা উপস্থিত হবার অনেক আগে এসে বসে আছেন। শান্তিদা তো পরিচালনা করতেন গুরুদেবর নির্দেশে। তাঁকেও খাটতে দেখেছি প্রতিটি নৃত্যনাট্যের অথবা অন্যান্য অনুষ্ঠানের জন্য অক্লান্তভাবে। সমস্ত দিন এতটুকু ফুরসত ছিল না তাঁর। হয় গুরুদেবের কাছে নতুন গান শিখছেন, না হয় আমাদের শেখাচ্ছেন, আর না হয় নাচের ছেলেমেয়েদের তৈরী করছেন। তাছাড়া গুরুদেবের ডাক তো সমস্ত দিনই আছে নতুন গানের সুর তুলে নেবার জন্য।

একবারের একটা আশ্চর্য ঘটনার কথা বলি। তখন তাসের দেশের রিহার্সেল হচ্ছে। গুরুদেব তো আছেনই, আমরাও সবাই উপস্থিত, শুধু রাজা অর্থাৎ সন্তোষদা এসে পেঁছানিন তখনও, দেরি হচ্ছে। তাঁর জন্য অপেক্ষায়। হঠাৎ গুরুদেব বলে উঠলেন, "লাগে লাগে।" কিছু আরম্ভ করার সময় ঐরকম বলতেন। "সন্তোষবাবু তো আসেন নি।" "রাজা তো এসে গেছে।"

যে প্যাসেজ দিযে আমরা আসতাম সেখানটা গুরুদেবের দেখতে পাওয়ার কথা নয় যেখানে বসতেন সেখান থেকে। আমরা তাকিয়ে দেখি ঠিকই সন্তোষদা ঢুকছেন।

আর একবার 'শ্যামা'র মহড়া দেখতে এসেছিল একটি বাইরের ছেলে। সেও বসেছে ঐ প্যাসেজেই। ওখানটা একেবারেই দেখতে পাবার কথা নয় আগেই বলেছি। হঠাৎ একেবারে উঠে দাঁড়িয়ে রেগে বৌঠানকে (প্রতিমা দেবী) বললেন, "বৌমা, এখানে কোন বাইরের লোক থাকলে আমি রিহার্সেলে থাকব না। ছেলেটি তখনই চলে গিয়েছিল। এই রকম সব আশ্চর্য ঘটনা দেখেছি।

আমাদের অনেকেরই এক কাজ ছিল; বর্ষার সময় খোয়াইর ভেতরের কেয়াবন থেকে কেয়াফুল তুলে এনে গুরুদেবকে দেওয়া খুব ভোরে। একসঙ্গে তো বেশি ফুল ফুটতো না, তাই ফুল তোলা নিয়ে একটা প্রতিযোগিতার মত ছিল কে কার আগে গিয়ে তুলে আনতে পারবে, বিশেষ করে নেপালবাবুর (রায়) সঙ্গে এই প্রতিযোগিতা চলত। স্বভাবতই নেপালবাবু আমাদের সঙ্গে পারতেন না আর খুব বকতেন আমাদের। খুব ভোরেই গুরুদেব পুবের বারান্দায় বসে থাকতেন। আমরা ফুল নিয়ে দিলে খুব খুশী। এটা আমাদের প্রায় প্রতিদিনকার কাজ ছিল বর্ষার সময়। কত ছোটখাটো ব্যাপারেই আমরা যখন তখন চলে যেতে পারতাম তাঁর কাছে। কোন বাধাই ছিল না।

এখানকার কঠিন গ্রীষ্মেও অনেক সময় এখানেই থাকতে দেখেছি তাঁকে। প্রচন্ড গরম হাওয়ার মধ্যেও জানলা-দরজা খুলে বসে লিখতেন। শুনেছি গ্রীষ্মে গরম হাওয়া গায়ে না লাগলে নাকি লেখা বের হতো না বলতেন। কার কাছে যেন গল্প শুনেছি, সত্যিমিথ্যে জানি না। শ্যামলীর পাশে আমগাছে খুব নিচুতে আম ধরেছে। এই কঠিন গ্রীষ্মের দুপুরবেলা কম্বল গায়ে দিয়ে বসে আম পাহারা দিচ্ছেন। গাছে মৌমাছির চাক আছে। কেউ যদি গাছে ঢিল ছোড়ে তাহলে তো মৌমাছি আক্রমণ করবে। তার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য এই কম্বল। প্রথমত এই কঠিন গ্রীষ্ম তার উপর কম্বল গায়ে কল্পনাও করা যায় কি?

মজার মজার সব কথা বলার কথাও শুনেছি অনেকের কাছে। বিশুবাবুর (বিশ্বরূপ বসু) কাছেই শুনেছি দুই একটা। ইরিসিপেলাসের পর বিশুবাবু গুরুদেবের কাছেই থাকতেন তাঁকে দেখাশোনা করার জন্য। তখনকারই কথা।

হঠাৎ একদিন বলছেন, 'বাঁ দোরটা বড় জ্বালাতন করছে।" বিশুবাবু কিছুতেই বুঝতে পারছেন না। "আঃ বুঝতে পারছিস না বাঁ দোরটা জ্বালাতন করছে।" বলে বাঁদিকের দরজাটা দেখিয়ে দিলেন। হাওয়াতে শব্দ করে বার বার বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল।

কোন ছোট ছেলে কাছে এসেছে। তাকে বলছেন ডাকাত দেখবি? একটা শ্লেটে 'ডা' লিখে শ্লেটটাকে কাত করে ধরলেন। 'ডা'কাত।

সুধাকান্তদার কাছে শুনেছি। একবার কি একটা কথার পিঠে সুধাদা গুরুদেবকে বলেছেন, "সকল পক্ষী মৎস্যভক্ষী মাছরাঙ্গাটাই কলঙ্কিনী।" তাই শুনে গুরুদেব ঐ কথার ধ্বনির সঙ্গে মিলিয়ে বললেন, "সবাই কলম ধার করে নেয় আমি শুধু কলম কিনি।"

নেপালবাবুকে নাকি একবার দণ্ড দিতে চেয়েছিলেন। প্রতিদিন গুরুদেবের সাথে যেমন দেখা করতে যান সেইরকম সেদিনও গেছেন। ফিরে যাবার পর খবর পাঠিয়েছেন গুরুদেব দেখা করার জন্য। জরুরী তলব। হন্তদন্ত হয়ে হাজির নেপালবাবু। গুরুদেব গম্ভীরভাবে বললেন, "আপনাকে দণ্ড দেব আজ।" শুনে নেপালবাবু খুবই সন্ত্রস্ত। বলেই গুরুদেব নেপালবাবুর সেদিনকার ভুলে ফেলে আসা লাঠিটা এগিয়ে দিলেন। এই ধরনের নানারকম গল্প তাঁর শুনেছি।

মাঝে মাঝে সন্ধ্যেবেলা ইংরেজ কবিদের কবিতা বাংলায় অনুবাদ করে শোনাতেন। সমস্ত বিভাগের বড় ছাত্রছাত্রী অধ্যাপক সকলেই উপস্থিত থাকতে পারতেন সেখানে। কত অনুষ্ঠানকত অভিনয় ইত্যাদি কত কিছুর মধ্যেই তাঁকে অত্যন্ত কাছে থেকে দেখেছি, পেয়েছি কত রকমভাবে দীর্ঘ দশ বছর। এখন এইসব মনে করতে গিয়ে কেবল মনে হয় এই তো সেদিন শান্তিনিকেতনে এসে-ছিলাম, এতই স্পষ্ট হয়ে সে সব দাগ কেটে আছে মনে। যখন ভাবি বসে বসে সেইসব দিনের কথা অপূর্ব-আনন্দে মন ভরপুর হয়ে থাকে। তাই তো বলি তাঁর পদতলে বসে যেসব দিনগুলি কাটিয়ে ধন্য হয়েছি, যে নতুন আলো দেখতে পেয়েছিলাম তাঁর আশ্রয়ে এসে সেই অমূল্য সম্পদের স্মৃতি নিয়েই বেঁচে আছি। তাঁর কৃপায় যে অমৃত সুধা পান করার সৌভাগ্য হয়েছে তাতেই মত্ত হয়ে সারা জীবন কাটিয়ে দেব আনন্দে। এখানকার দিগন্ত ছোঁয়া আকাশ আলো বাতাস গাছপালা সবকিছুর মধ্যে এমন কিছু আছে যা অনুভব করে

আনন্দে ভরে থাকে মন। তাই তো এখান থেকে কোথাও গিয়ে দুদিন থাকতে পারি না। কোথাও গেলে মন ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে কতক্ষণে যাব আমার পরম প্রিয় জায়গা শান্তিনিকেতনে। কী যে পেয়েছি এখানকার আবহাওয়া থেকে তা কি কাউকে বলে বোঝাতে পারব কখনও? এ যে আমার বাড়ি। তাই বাইরে কোথাও গেলে ফিরে এসে এখানকার মাটিতে পা দিয়েই যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচি।

এখানকার কথা যা বললাম কিছুই বলা হল না। কত কি বাদ রয়ে গেল। যা বলার নয় শুধু চুপ করে বসে অনুভব করার তা কি বলে ঠিক প্রকাশ করা যাবে?

গুরুদেবকে সবশেষ সেই দেখা যখন অসুস্থ হয়ে এখান থেকে কলকাতা চলে গেলেন। আশ্রমের ছোটবড় সবাইকে দেখতে চাইলেন। যেদিন রওনা হবেন সকালবেলা ছোটবড় আমরা সবাই উপস্থিত উদয়নের বারান্দায়। ছোট বাসের পেছনের দরজা দিয়ে শোয়া অবস্থায় ঢোকানো হ'ল। আশ্রমটা একবার ঘুরে দেখতে চাইলেন। ঘোরানো হল। তখন নতুন লাইটপোস্ট সব বসানো হয়েছে। তাই দেখে বলেছিলেন, ''এখন বুঝি পুরানো আলো গিয়ে নতুন আলো আসবে?" আর তো ফিরলেন না।

অস্ত্রোপচার করা হবে। আশ্রমের ছোটবড় সবাই উদ্বিগ্ন। সব সময় খবর আসছে কলকাতা থেকে। কখন কি হয়! শেষে যা হবার তাই হল। আগে থেকেই একটা থমথমে ভাব আশ্রমের, এখন একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। মনে আছে সেই দিনটির কথা যেদিন চিতাভস্ম আনা হল আশ্রমে। সুরেনবাবু হাতে করে চিতাভস্মের কলসী নিয়ে স্টেশন থেকে হেঁটে আসছেন চোখের জল মুছতে মুছতে। শিশুবিভাগের এবং আশ্রমের অন্যান্য ছোটদের থেকে আরম্ভ করে সবাই রাস্তার দুই ধারে দাঁড়িয়ে। সুরেনবাবু ঢুকলেন আশ্রমের পূর্ব দক্ষিণের প্রথম গেইট দিয়ে। তাঁর পিছু পিছু প্রথমে ছোটরা তারপর ক্রমে বড়রা লাইন করে তাঁকে অনুসরণ করে চলেছে খালি পায়ে। শুধু পায়ের আর চাপা কান্নার শব্দ। উদয়নের বারান্দায় রাখলেন সুরেনবাবু চিতাভস্মের কলসী আর একে একে সবাই প্রণাম করে নিঃশব্দে চলে গেল। একেবারে স্তব্ধ। কী নিদারুণ শূন্যতা!

গুরুদেবের শ্রাদ্ধের সময় খুব সুন্দর করে শ্রাদ্ধবাসর সাজিয়েছিলেন

মাস্টারমশাই। রথীদা মাথা মুড়িয়ে শ্রাদ্ধ করেছিলেন। অনেক গান হয়েছিল শ্রাদ্ধবাসরে। অনেকদিন বৃষ্টি নেই তার আগে থেকেই। বৃষ্টির জন্য হাহাকার পড়ে গিয়েছিল চারদিকে, কিন্তু শ্রাদ্ধের দিন সকাল থেকেই সমস্ত দিন ধরে কী বৃষ্টি! খেলার মাঠে সমস্ত দিনই কত দরিদ্রনারায়ণ খেয়েছিল! আমরা বাল্মীকি প্রতিভা অভিনয় করেছিলাম শ্রাদ্ধের সময় যতদূর মনে পড়ে পরের দিন সন্ধ্যাবেলা লাইব্রেরীর বারান্দায়। শ্রাদ্ধের সময় অভিনয়ের কথায় প্রথমে অনেকের কাছ থেকেই আপত্তি উঠেছিল। কিন্তু ক্ষিতিমোহনবাবু জোর দিয়ে বলেছিলেন অভিনয় করাতে। বলেছিলেন শ্রাদ্ধের সময় যে যা ভালবাসেন তাই দিতে হয়। গুরুদেব অভিনয় ভালবাসতেন তাই অভিনয় করাতে হবে। শান্তিদার নির্দেশনায় এবং পরিচালনায় যা জমেছিল বাল্মীকি প্রতিভা! শান্তিদা নিজে বাল্মীকির ভূমিকায় আর প্রধান দস্যু জাপানী ছেলে 'মাকী'। ওর গানগুলি আমি গেয়েছিলাম আগেই বলেছি। যা একখানা স্টেজ সাজিয়েছিলেন সুরেনবাবু আর মাসোজী! পাতাসুদ্ধ মোটা মোটা গাছের ডাল লাগিয়ে ঘন জঙ্গল আর তার মধ্যে কালীমন্দির। মন্দিরের গায়ে খাঁড়া চকচক করে ঝুলছে। বাণী নামে একটি ছোট্ট মেয়ে বালিকা সেজেছিল। "পথ ভুলেছিস সত্যি বটে? সিধে রাস্তা দেখতে চাস? এমন জায়গায় পাঠিয়ে দেব সুখে থাকবি বারো মাস। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ" ডাকাতদের এই অট্টহাসির সময় একেবারেই কেঁদে ফেলল সত্যি সত্যি ভয় পেয়ে ঐরকম মাস্টারমশাইর সাজিয়ে দেওয়া ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে ডাকাতদের। কী স্বাভাবিকই হয়েছিল!

ডাকাতদের মধ্যে 'সোয়েকোরো' নামে জাভার ছেলেটি যা কান্ড করেছিল। শিকারের সিনে "গেল গেল ঐ পালায় পালায়, চল চল ছোট রে পিছে আয় রে ত্বরা যাই।" এই গানের সঙ্গে সবাই ছুটে পালাবার সময় ও এক লাফে গাছের উপর উঠে এক পাক খেয়েই ঘুরেই আবার লাফিয়ে পড়েই দে ছুট্। সে এক দৃশ্য! আগেই কখন দেখে রেখে গেছে গাছ ঠিক শক্তভাবে বাঁধা আছে কিনা। কেউ জানতাম না আমরা ওর ঐ প্ল্যানের কথা। এত জমে গিয়েছিল তাতে ঐ শিকারের 'সিন'টা!

॥ ৯ ॥

৺রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর (রথীদা)—আমি তখন অল্পদিন হল কলাভবনে ভর্তি হয়েছি। পাঠভবনের ছেলেমেয়েদের এবং শিক্ষাসত্রের ছেলেদের ছবির একটা প্রদর্শনী হবে কলকাতায় 'হেয়ার স্কুলে'। সুরেনবাবু কলাভবন থেকে আমাদের কয়েকজন ছেলেকে নিয়ে গেলেন সাজাবার জন্য। সাজাতে গিয়ে দেখা গেল ছবি কম পড়ে গেছে। সন্ধ্যার ট্রেনে রথীদার কাছে একটা চিঠি দিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন সুরেনবাবু। সকালবেলা গিয়ে দেখা করলাম সেই চিঠি নিয়ে। সেই আমার প্রথম পরিচয় রথীদার সঙ্গে। বসিয়ে কত রকম পিঠে, মিষ্টি ইত্যাদি যত্ন করে খাওয়ালেন। যেন কত কালের পরিচয় আমার সাথে। ঠিক ঘরের ছেলের মত ব্যবহার করেছিলেন। পরে তো কত বছর ধরে কত কাছে পেয়েছি তাঁকে। দেখেছি তাঁর সহজ সরল মধুর ভদ্র ব্যবহার। যে কোন সময় দরকারে অদরকারে চলে গেছি তাঁর কাছে, কোন বাধাই ছিল না। আমরা যখন পার্টির সঙ্গে কোলকাতায় যেতাম, অভিনয়ের পর রাত্রে ঘরোয়া মজার আসরে রথীদাকে দেখতাম আমাদের মধ্যে বসে সেই সব উপভোগ করতে। কোন সংকোচই হতো না আমাদের।

ছবি আঁকতেন, চামড়ার কাজ তো বিলেত থেকে শিখে এসে রথীদাই চালু করলেন আর তাছাড়া তাঁর হাতের অপূর্ব কাঠের কাজের কথা সকলেরই জানা। চামড়ার কাজ এবং বাটিকের কাজ সর্বপ্রথম এখানেই আরম্ভ হয় এবং পরে সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। তবে চামড়ার মধ্যে এত রকমের টেকনিকের কাজ অন্য কোথাও হয় বলে জানা নেই। যখনই যেতাম তাঁর কাছে দেখতাম নানারকম হাতের কাজে মত্ত হয়ে আছেন আর এটা ওটা বার করে দেখাতেন যে সব করেছেন হালে। বুঝতাম এসবে কত আনন্দ তাঁর। কখনও কখনও ডেকে এনে নিজের করা নতুন নতুন ছবি দেখাতেন। আমি ছবির কতটুকু বুঝি কিন্তু আমাদেরও দেখিয়ে কত আনন্দ তাঁর।

একবার ওঁর ছবি এবং হাতের কাজের বিশেষ করে কাঠের কাজের প্রদর্শনী হয়েছিল দিল্লীতে। সে অবশ্য অনেক পরের কথা। তখন গুরুদেব বেঁচে নেই। আমাদের কয়েকজনের তখন বিনয়ভবনে নতুন চাকরি হয়েছে। তখন তো মোটে আরম্ভ হয়েছে, কোন কাজ নেই আমাদের। ভারতবর্ষের নানা জায়গায় সব প্রতিষ্ঠান ঘুরে দেখতে পাঠানো হয়েছিল। ঐ সময় আমি আর

সন্তোষদা যখন কুরুক্ষেত্রে গিয়েছিলাম সেই সময়ই প্রদর্শনী হয় রথীদার। আমাদের দুজনের উপর ভার পড়ল সাজাবার, সঙ্গে রথীদা তো আছেনই। তখনকার একটা ঘটনা। বিখ্যাত আর্ট ক্রিটিক Dr. Stella Kramrisch-কে আমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছেন রথীদা ওঁর প্রদর্শনী সাজিয়ে দেবার জন্য কিন্তু আমরা তা জানতাম না। সন্তোষদা ও আমি এ কয়দিন ধরে যে প্ল্যানে যত্ন করে সাজিয়েছি তিনি এসে সব ভেঙ্গে একেবারে অন্যরকমভাবে সাজাতে লাগলেন যা আমাদের একেবারেই পছন্দ হচ্ছিল না, অথচ কিছু বলতেও পারছি না। রথীদা ঠিকই বুঝতে পেরেছেন আমাদের মনের ভাব। ডেকে বললেন, "ও আজই চলে যাবে, কাল থেকে তোমাদের ইচ্ছেমত সাজিও। ওঁকে আমি নিমন্ত্রণ করে এসেছি, কি আর করব বল।" মনে আছে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সাজাতে দিয়েছিলেন, কোন জায়গায় এতটুকু নাক গলান নি।

৺মাস্টারমশাইর কাছেও এই জিনিসটাই আমরা দেখেছি। যখন কোনকিছু সাজাবার ভার কারো উপর দিতেন সম্পূর্ণ নির্ভর করতেন তার উপর। মাঝখানে কোনরকম উপদেশ দিয়ে বাধা সৃষ্টি করতে দেখিনি। একথা আগেও বলেছি বোধহয়।

শ্রীনিকেতনের চাকরি থেকে যখন বদলি হলাম বিনয়ভবনে তখন আপত্তি জানালাম ৺রথীদাকে। একেবারে নতুন ধরনের কাজ, আমার ভয় করছিল। "ভয় কি তোমার? আমি তো রয়েছি। সত্যি অসুবিধা হলে তখন দেখব।" এরকম আপন করে নিয়ে ক'জনকে বলতে দেখেছি? রথীদার অনেক গোপন দান ছিল। অনেকেই সে সব জানতে পারত না। দুঃসময়ে কতজনকে গোপনে সাহায্য করেছেন এবং কাউকে বলতে বারণ করে দিতেন এমন অনেক ঘটনা আমাদেরই জানা আছে।

কয়েকটা ঘটনার কথা লিখলেই ৺রথীদার উদার মনোভাব সম্বন্ধে জানা যাবে। একদিন দেখেন তাঁর চাকর লুকিয়ে তাঁর ক্ষুর দিয়ে দাড়ি কামাচ্ছে। দেখতে পেয়ে সেখান থেকে চুপি চুপি সরে গেলেন। পরে তাকে ডেকে সেটা দিয়ে দিয়েছিলেন।

ছেলেদের দল আম চুরি করতে এসে ধরা পড়েছে দরোয়ানের কাছে। রথীদা প্রথমে তাদের খুব শাস্তি দেবেন এই ভয় দেখিয়ে পরে অনেক কিছু খাইয়ে দিয়েছিলেন। ছেলেরা লাফাতে লাফাতে চলে যেত "আবার চুরি করব, আবার চুরি করব" বলতে বলতে। এ রকম তো প্রায়ই হতো।

রথীদার এক চাকর ছিল। কিছু কিছু লেখাপড়া জানত সে। ব্যাঙ্ক থেকে চেক ভাঙিয়ে আনা ইত্যাদি সেই করত। বহুদিন ধরে লুকিয়ে রথীদার সই নকল করা অভ্যাস করেছে। একদিন একটি চেক্ চুরি করে বহু টাকা তুলতে গেছে সই নকল করে। এখন হয়েছে কি, অত টাকা ছিল না অ্যাকাউন্টে। সেটা তো আর জানা নেই চাকরের। ব্যাঙ্ক থেকে রথীদাকে ফোনে জিজ্ঞেস করল যে অত টাকা তো নেই, কিছু কম পড়ে যাচ্ছে, দিয়ে দেবে কিনা বাকীটা। ফোন পেয়ে অবাক! চাকরকে বসিয়ে রাখতে বললেন। তারপর এসে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন ওকে। ছাড়তে চায় না ব্যাঙ্ক থেকে। পুলিশে দেবে। বলে কয়ে নিয়ে এসে বেশ কিছু টাকা দিয়ে চাকরটিকে বিদায় করে দিলেন।

রথীদার শৌখিন বাগানের কথা সকলেরই জানা। গাছপালা নিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা তাঁর নেশা ছিল। লতানো আমগাছ পেয়ারা গাছ অনেকেই দেখেছেন তাঁর বাগানে। আরও কত কি ছিল! ওঁর গোলাপ বাগান তো অনেকেই দেখে মুগ্ধ হতেন। বাগানে সারস ময়ূর প্রভৃতিও ছিল। নানারকম সখের শেষ ছিল না।

এই সঙ্গে বৌঠানের (৺প্রতিমা দেবী) কথা সহজেই এসে পড়ে! তাঁর স্নেহও কম পাইনি আমরা। যখনই তাঁর কাছে গেছি কত রকমের খাবার খাইয়ে দিতেন। খুব সহজ সম্পর্ক সকলের সঙ্গেই। রথীদারও যেমন হাতের কাজের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল, বৌঠানেরও তাই। নানারকম হাতের কাজ মেয়েদের মধ্যে চালু করা বিশেষ করে গ্রামের মেয়েদের মধ্যে এবং শ্রীনিকেতনেও, এ তো তাঁরই। শুনেছি বাটিকের কাজ প্রথমে তিনিই আরম্ভ করেন। এও শুনেছি তাঁর সঙ্গে তখনকার দিনের অনেকেই একাজ করতেন। ৺ডঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছেই শুনেছি তাঁর স্ত্রীও ঐ সময় প্রতিমা দেবীর সঙ্গে বাটিকের কাজ করতেন। বৌঠান ছবিও আঁকতেন; তাছাড়া নৃত্যনাট্যের সাজসজ্জাতেও তাঁর পরিকল্পনা থাকত আগেও বলেছি। প্রতিটা নৃত্যনাট্যের মহড়ার সময় সর্বদা উপস্থিত থেকে নানারকম 'সাজেস্ট্' করতেন। সর্বদা মাথায় অভিনয়ের অনেক রকম নতুন নতুন ভাবনা ঘুরতো। শরীর ভাল যেত না বলে সব করে উঠতে পারতেন না। শুনেছি গুরুদেবের কোন কোন নৃত্যনাট্যের পরিকল্পনা তাঁর মাথায়ই প্রথম আসে।



গুটি নাগেরমশাই এবং বিনোদদা আলাপরত



ক্যাম্পের সামনে একটা হরিণ এসে থমকে দাঁড়াল



পোঁবাকর সামনে টিলার উপর বটগাছ



নহবতখানা

৺ক্ষিতিমোহন সেন—শুনেছি পরম শ্রদ্ধেয় ক্ষিতিমোহনবাবু শান্তিনিকেতনে আসেন ১৯০৮ সনে। তাঁকে ছাড়া এখানকার উৎসব, অনুষ্ঠান, মন্দির পরিচালনার কথা ভাবাই যায় না। গুরুদেবের অনুপস্থিতিতে তাঁকেই এসব করতে দেখেছি। গুরুদেব থাকতেও উৎসব অনুষ্ঠানাদিতে তিনিও উপস্থিত থাকতেন গুরুদেবের সঙ্গে। ৭ই পৌষের মন্দির পরিচালনা গুরুদেব না থাকলে তিনিই করতেন।

লাইব্রেরীর উপরতলায় তাঁর কাজের ঘর ছিল। প্রতিদিন সকালবেলা এবং দুপুরে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সময়ে উপস্থিত হতে দেখেছি। কলাভবন এবং অন্যান্য বিভাগের কিছু বড় ছেলেমেয়েদের আবেদনে বাংলার ক্লাস নিতেন বিকেলে সপ্তাহে তিন দিন করে। এতই ভাল লাগত তাঁর ক্লাস যে আমরা কখনও অনুপস্থিত থাকতাম না। 'খেয়া' থেকে পড়াতেন। মাঝে মাঝে ছোট ছোট মজার গল্প বলে জমিয়ে রাখতেন। সেই সব গল্পের কিছু নমুনা নীচে দিলাম।

একজন এক বাঙ্গালকে দেখে বলছে, "এই বাঙ্গাল, তুই একটা পাঠা।" উত্তরে বাঙ্গাল বলল, "সেই পাঠাই তো খাও।"

"এক ঘটির বাড়িতে নেমতন্ন খেতে বসেছি। লুচি দিয়েছে খেতে। আমি জিজ্ঞেস করলাম ভাত আছে? তারা ঠাট্টা করে বলল "ভাউতা বাঙ্গাল," আমি বললাম, "তা ঠিক তবে তোমাদের মত লুইচ্চা না।"

"কলকাতায় একটা বাড়িতে যাব, নম্বরটা ঠিক মনে পড়ছে না। খুঁজে বেড়াচ্ছি। এমন সময় দেখি একটা বাড়ির দোতলায় দুজন মেয়ে খুব ঝগড়া করছে। মনে হল এরা নিশ্চয়ই দুই সতীন। অমনি নম্বরটা মনে পড়ে গেল দুইশ তিন।"

আর একটা গল্প—যখন গুরুদেবের সঙ্গে চীনে গিয়েছিলেন সেই সময়কার কথা। "ওদেশের লোকেরা ধরেছে গুরুদেবকে 'আফটার ডিনার' একটা 'টক্' দিতে হবে। গুরুদেব আমাকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন ঐ যে 'টকের' রাজা। খুব ভাল 'টক' দিতে পারেন। 'ডিনারের' পর সবাই ধরেছে আমাকে। আমি বললাম 'টক' তো দিতে পারব না, একটা গল্প বলি শোন। আগেকার যুগে কোন দেশে যখন প্রাণদণ্ড হতো তখন ফাঁসি না দিয়ে বাঘের সামনে ছেড়ে দিত। সাতদিন আগে থেকেই রটিয়ে দেওয়া হতো চারদিকে অমুক দিন অমুকের

সময় অমুক লোকের প্রাণদণ্ড হবে। যেখানে বাঘের সামনে ছেড়ে দেওয়া হতো আসামীকে তার চারধারে সব বসবার গ্যালারী থাকত দেখবার জন্য যেমন সার্কাসে থাকে। মাঝখানে লোহার খাঁচা, তার মধ্যে আসামীকে এনে বাঘকে ছেড়ে দেওয়া হতো তার সামনে। তার আগে কয়েকদিন না খাইয়ে রাখা হতো বাঘকে।

এই রকম একবার এক আসামীকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হবে। চারদিকে রটিয়ে দেওয়া হয়েছে তার আগে। নির্দিষ্ট দিনে 'গ্যালারীতে' গিজ গিজ করছে লোক। আসামীকে তো আগেই লোহার খাঁচার মধ্যে আনা হয়েছে। সবাই দম বন্ধ করে আছে। এখন বাঘকে ছাড়া হবে। এই শাস্তির নিয়ম হল প্রথমবারে যদি মৃত্যু না ঘটে তাহলে তার শাস্তি খারিজ হয়ে যায়। এখন সেই বাঘকে তো খাঁচা থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে আসামীর সামনে। হালুম করে লাফিয়ে সাতদিনের উপবাসী বাঘ একেবারে সামনে এসে পড়েছে। ধরে আর কি! লোকটি হাত দেখিয়ে তাকে থামতে বলল। বাঘ তো থামল। তারপর বাঘের কানে কানে কি যেন বলল। তাই শুনে বাঘ একেবারে ল্যাজ গুটিয়ে খাঁচায় গিয়ে ঢুকল। সবাই তো অবাক! কী বলেছে যার জন্য এইরকম কাণ্ড? আর তার শাস্তি হল না। "কি বলেছ তুমি" জিগেস করা হল। সে বলল, 'বিশেষ কিছুই বলিনি। আমি শুধু বলেছি, "খাচ্ছ খাও, আফ্‌টার ডিনার 'টক্‌' দিতে হবে কিন্তু।"

এই ধরনের মজার মজার গল্প প্রায়ই শুনতে পেতাম ওঁর কাছে। এমনিতেই তখনকার আশ্রমের সকল গুরুদের সঙ্গেই সব বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের অতি নিকট সম্পর্ক ছিল। আমরা তো তাঁর বাংলা ক্লাসের ছাত্রও ছিলাম তাছাড়া আমি যখন শ্রীনিকেতনে চাকরি নিয়ে গেলাম তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠ হবার সৌভাগ্য হয়েছিল। শ্রীনিকেতনের বিভিন্ন উৎসবের গান এবং মণ্ডসজ্জার ভার আমার উপর থাকাতে অনুষ্ঠানাদির গান অনুষ্ঠানসূচী প্রভৃতির ব্যাপারে তাঁর নির্দেশ নিয়েই কাজ করতে হতো।

সাধারণতঃ উৎসব মণ্ড সাজাবার সময় তিনদিকে তিনটি খাট পেতে তার উপরে তোষক দিয়ে তার উপর রঙ্গিন কাপড় দিয়ে ঢেকে কলাভবন থেকে কাঠিওয়ারি সুন্দর কাজ করা আসন পেতে সাজানো হতো। সামনে সাদা বা রঙিন আলপনা এবং আলপনার মাঝখানে ঘটে ফুল দিয়ে সাজান থাকত

আর থাকত তামার থালায় ফুলের মালা ফুল চন্দনের বাটি ইত্যাদি। চন্দনের বাটির মধ্যে একটি ফুলের কুঁড়ি রাখা থাকত যা দিয়ে টিপ পরিয়ে দেওয়া হতো। সামনে ধূপদানিতে ধূপ জ্বালিয়ে রাখা আছে। মাঝখানকার আসনে গুরুদেব একপাশের আসনে ক্ষিতিবাবু ও উল্টো দিকেরটায় অন্যান্য কেউ যাঁরা ক্ষিতিমোহনবাবুর সঙ্গে মন্ত্র উচ্চারণ করতেন। নীচে একপাশে গানের দল। সভাপতি, প্রধান অতিথি প্রভৃতিকে মালা চন্দন দেবার পর গান দিয়ে উৎসব আরম্ভ হতো। যে সব মেয়েরা মালা বা চন্দন দিত তাদেরও সাজিয়ে দেওয়া হতো বিশেষ সাজে। প্রতি উৎসবের আলাদা আলাদা গান বেছে দিতেন ক্ষিতিবাবু। মালা চন্দন দেবার সময় এবং অনুষ্ঠান শেষে শঙ্খধ্বনি করার নিয়ম ছিল।

আমি শ্রীনিকেতনে কাজে যোগ দেবার পর যতদূর মনে পড়ে গুরুদেব বছর দুই এখানকার উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর তিরোধানের পর ক্ষিতিবাবুই মাঝখানে গুরুদেবের আসনে বসে উৎসব অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন। এ সম্বন্ধে একটা ছোট ঘটনা আছে। গুরুদেবের পরলোকগমনের পরের বছর শ্রীনিকেতনের বাৎসরিক উৎসবের সময় মণ্ড সাজিয়েছি ক্ষিতিবাবুর নির্দেশ মত। গুরুদেব যেখানে বসতেন সেই মাঝখানকার আসনে ফুল দিয়ে সাজিয়ে একটি ঘট রেখে দিয়েছি। মাস্টারমশাই এসেই সেই ঘট সরিয়ে দিয়ে সেই জায়গায় ক্ষিতিমোহনবাবুকে ধরে নিয়ে বসিয়ে দিলেন। বললেন, "আসন শূন্য থাকতে পারবে না। আপনিই এখন আচার্য। সেই থেকে তাঁকেই শান্তিনিকেতন শ্রীনিকেতনের সমস্ত উৎসবে দেখেছি ঐ আসনে বসতে।

৺প্রমোদরঞ্জন ঘোষ—প্রমোদবাবু খুব সম্ভব এখানে আসেন ১৯১৪ সনে। সবাই মশাই বলেই ডাকত। এরকম সরল প্রকৃতির এবং নিষ্ঠাবান মানুষ কম দেখা যায়। কখনও ঠাট্টাচ্ছলেও মিথ্যা সহ্য করতে পারতেন না। একবারের কথাই শুনেছি—গুরুপল্লীর সব মাস্টারমশাইরা কোন জায়গায় বেড়াতে গিয়েছিলেন। নেপালবাবু আর প্রমোদবাবু একসঙ্গে কোথাও বেড়াতে বেরিয়ে বোধহয় পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন যার জন্য ফিরতে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। পাছে সেটা প্রকাশ হয়ে পড়ে তাই দুজনে পরামর্শ করে ঠিক করলেন মিছে করে কোন কোন জায়গার নাম করবেন। সেই সব জায়গা ঘুরে আসতে দেরি হয়ে গেছে। এত দেরি করে ফেরার জন্য স্বভাবতই সবাই

উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করায় নেপালবাবু খুব বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলতে আরম্ভ করলেন কোথায় কোথায় গিয়েছিলেন। যে সব জায়গার নাম ঠিক করেছিলেন আগে দুজনে মিলে পরামর্শ করে তার থেকে অনেক বেশি করে বলতে লাগলেন উচ্ছ্বাসভরে। এদিকে ছটফট্ করছেন প্রমোদবাবু। শেষপর্যন্ত আর সহ্য করতে পারলেন না। "বড্ড বেশি মিথ্যে বলা হয়ে যাচ্ছে। এত তো কথা ছিল না নেপালবাবু।" বলে চেঁচিয়ে উঠলেন।

খুব সাবধান সব সময় স্বাস্থ্য সম্বন্ধে। নাকে কাপড় বেঁধে চলতেন পাছে ধুলো যায় নাকে। আমাদের সকলের সঙ্গেই খুবই সহজ সম্বন্ধ ছিল। দেখা হ'লেই দুটো একটা কথা জিজ্ঞেস করবেনই। খুবই মজা লাগত ওঁর ছোট ছোট কথাগুলি শুনতে। বুধবারে মাঝে মাঝে আমাদের কলাভবনের ছেলেদের আশ্রমের অপরিষ্কার জায়গা সব পরিষ্কার করতে হতো আগেই বলেছি। একবারের কথাই বলি। গুরু পল্লীর পেছনটা পরিষ্কার করা হচ্ছে। নদমার জমে থাকা নোংরা হাত দিয়ে পরিষ্কার করছি। তাই দেখে বললেন, "তোমার নাম কি?" বললাম। "হুঁ ঘেন্নাকেতো বেশ জয় করেছ।"

আর একদিন মমতাকে চাঁদের আলোর পিকনিকের পর পৌঁছে দিতে যাচ্ছি ওঁর বাড়ির সামনে দিয়ে।

"কে যায়?"

"আমি।"

"আমি কে? তেত্রিশ কোটি আমি তুমি, তুমি কে?"

নাম বললাম।

"সঙ্গে কে?"

বললাম।

"কোথায় গিয়েছিলে?"

তাও বললাম।

"হুঁ বুঝেছি যাও।"

আর একদিন ওঁর বাড়ির সামনে দিয়ে সুশীলবাবুর বাড়িতে যাচ্ছি সরোদ শিখতে, হাতে যন্ত্র। দেখেই ডাক দিলেন।

"এটা কি যন্ত্র?"

"সরোদ।"

"একটু আনন্দ দান করতো।" এই ধরনের ছোট ছোট কথা বলতেন। খুব মজা লাগত আমাদের। কিছুদিন আগে মারা গেছেন।

৺নেপালচন্দ্র রায়—নেপালবাবু এখানে আসেন ১৯১০ সালের ২৭শে জুন ইংরেজীর অধ্যাপক হয়ে। পরে শিক্ষাভবনে ইতিহাস পড়াতেন। নেপালবাবু সকলেরই প্রিয় 'দাদামশাই'। ওঁকে দেখলেই সবাই দাদামশাই দাদামশাই বলে ছুটে এসে ঘিরে ধরত। সকলের সঙ্গেই অতি মধুর সম্পর্ক। অত্যন্ত আপন ভোলা ধরনের মানুষ ছিলেন। অনেক গল্প আছে দাদামশাইর ভুল করা সম্বন্ধে।

একবার নাকি বিকেলের গাড়িতে কলকাতা যাচ্ছিলেন। বর্ধমানে গাড়ি বদল করে তাড়াতাড়ি কলকাতা পৌঁছানো যেত। আবার ঠিক ঐ সময়েই কলকাতার থেকে বোলপুরে যাবার আর একটা গাড়ি এসে থামত। এদিকে নেপালবাবু করেছেন কি—কলকাতার গাড়িতে না উঠে বোলপুরের গাড়িতে উঠে বসে কাগজ পড়তে আরম্ভ করেছেন। গাড়ি তো ছেড়ে দিল, একটা স্টেশনে গাড়ি থামতেই বাইরে তাকিয়ে বলে উঠলেন "আবার গুসকরা?" বোলপুরে ফিরে এলেন আবার।

আর একবারের একটা গল্প শুনেছিলাম। ভাইপোকে কুকুরে কামড়েছিল। কুকুরটা মরে গেলে তার মাথাটা কেটে একটা হাঁড়িতে ভরে মেডিকেল কলেজে দেবার জন্য নিয়ে গেলেন কলকাতায়। বর্ধমান থেকে মিহিদানা কিনে নিয়েছেন জামাইর জন্য প্রথমে মেডিকেল কলেজে কুকুরের মাথার হাঁড়িটা দিয়ে পরে মেয়ের বাড়িতে মিহিদানার পাত্র রেখে বাড়ী চলে গেলেন। পরের দিন রিপোর্ট জানতে মেডিকেল কলেজে যেতেই ডাক্তাররা হেসে বললেন যে মিহিদানাটা ভালোই ছিল আপনার। এসবই আমার শোনা গল্প। এর মধ্যে কতটা বাড়ানো জানি না তবে তিনি যে খুব ভোলা প্রকৃতির লোক ছিলেন সেটা ঠিকই।

৺হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—শুনেছি হরিবাবু ১৯০২ সালে আসেন। লম্বা ছিপছিপে মোটা চশমা পরা হরিবাবুকে দেখেছি ঠিক ঘড়ির কাটা ধরে চলতে যেমন দেখেছি ক্ষিতিবাবু, মাস্টার মশাই অথবা অন্যান্য অধ্যাপকদের। তাঁরও কাজের ঘর ছিল লাইব্রেরীর ওপরতলায়। তাঁর সারাজীবনের বিরাট কাজ শব্দকোষ অভিধানের কথা সকলেরই জানা। প্রত্যেক দিন সকালে এবং

বিকেলে নিয়মিত ভ্রমণ করার অভ্যাস ছিল একটা নির্দিষ্ট পথ ধরে। গোয়ালপাড়ার রাস্তা ধরে গিয়ে একটা খেজুর গাছে লাঠি দিয়ে তিনটে আঘাত করে সাক্ষী রেখে আসতেন।

৺নিতাই বিনোদ গোস্বামী (গোসাইজী) এখানে আসেন বিশ্বভারতী হবার পর ১৯২০ কি ২১ সালে। অতি অমায়িক মধুর স্বভাবের মানুষ। পাণ্ডিত্য ছাড়াও অনেক গুণ ছিল। পাখোয়াজ, ব্যানজো, ক্ল্যারিওনেট খুব ভাল বাজাতে পারতেন আর তাছাড়া দুই হাতে চার টুকরো ছোট কাঠ দিয়ে এত সুন্দর তাল বাজাতে পারতেন গানের সঙ্গে, কানে লেগে আছে এখনও। ছোট বড় সকলেরই অতি কাছের মানুষ ছিলেন। 'তাসের দেশে' দহলা পণ্ডিতের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন খুব ভাল। আগে আগে অনেক অনুষ্ঠানেই পাখোয়াজ বা খোল বাজাতে দেখেছি। শেষ বয়সে শান্তিনিকেতন হাসপাতালে দীর্ঘদিন ভুগে মারা যান।

৺শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—প্রভাতদা খুব সম্ভব ১৯১০ সনের জানুয়ারী মাসে আসেন। লম্বা চওড়া দাড়িওয়ালা চেহারা। লাইব্রেরীর ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। এঁরও খুব সহজ সম্বন্ধ ছিল সকলের সঙ্গে। বেশ রসিয়ে গল্প বলতেন। একবার একটা মজার গল্প বলেছিলেন ওঁর এক অবাঙ্গালী ছাত্রের। ওঁর দাড়ি দেখে উৎসাহিত হয়ে সেই ছাত্রও দাড়ি রাখতে আরম্ভ করল। বেশ লম্বা হয়ে উঠেছে দাড়ি। একদিন হঠাৎ দেখা গেল সকালবেলা একেবারে 'ক্লিন শেভড্'। "কি হল, দাড়ি কামিয়ে ফেললে কেন হঠাৎ?" সে নাকি উত্তর দিয়েছিল, "স্যার, মাই ওয়াইফ্ হ্যাজ কাম।"

৺তনয়েন্দ্রনাথ ঘোষ—তনয়দা এখানে আসেন ১৯২৬ সনে পাঠভবনের অধ্যাপক হয়ে সাত বছর বয়সের মেয়ে নিবেদিতাকে সঙ্গে নিয়ে। বিপত্নীক ছিলেন।

এঁর কথা কি বলব? ওপরটা দেখে খুব কঠিন মনে হতো কিন্তু ভেতরটা নারকোলের শাঁসের মত ছিল। ছোটদের ক্লাস নিতেই ভালবাসতেন। খুব প্রিয় ছিলেন ছাত্রছাত্রী এবং আশ্রমের অন্যান্য সকলেরই। দেখেছি প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীরা আশ্রমে এসেই প্রথমেই তনয়দার খোঁজ করে দেখা করত। শিশুবিভাগের ছেলেদের সঙ্গে ছুটির দিনে প্রায়ই মার্বেল খেলতে দেখেছি। প্রায় বুধবারই বহু আগেকার ছাত্রছাত্রীদের পুরনো খাতাপত্র রোদে দিয়ে ঝেড়েপুঁছে রেখে

দিতেন যা বছরের পর বছর শেষ পর্যন্ত সযত্নে রক্ষিত ছিল ওঁর কাছে। কোনটাই ফেলে দিতেন না।

সব খেলাই বেশ ভাল খেলতে পারতেন বিশেষ করে ফুটবলে খুব নাম ছিল। আমি তো ওঁর ছাত্র ছিলাম না। কিন্তু আমাদের অন্যান্য অধ্যাপকদের মতই তাঁকে শ্রদ্ধা করতাম। খেলাধুলার ভেতর দিয়েই তাঁর সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ হয়েছিল। ছোট্ট একটি সাইকেল ছিল তাঁর। তনয়দার কথা মনে হলেই মনে পড়ে সাইকেল হাতে হেঁটে চলেছেন। আমি যখন শ্রীনিকেতনে থাকি মাঝে মাঝেই আমার বাড়িতে অনেককে নিয়ে পিক্‌নিক্‌ করতেন। ফিরতেন সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত কাটিয়ে। বেশির ভাগ সময় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে থাকতেই ভালবাসতেন। ভাল ছাত্র খারাপ ছাত্র কাউকেই ছোট করে দেখতেন না। সকলের সঙ্গেই সমান ব্যবহার আর কার ভেতর বিশেষ কি গুণ আছে তাই খুঁজে বার করার চেষ্টা করতেন। বড় ছেলেরা ত যেন ওঁর বন্ধুর মত ছিল। এই কথা বলতে গিয়ে বিশেষ করে মনে পড়ে অনু (৺অনুপানন্দ ভট্টাচার্য্য), গোরা (৺গোরাচাঁদ বসু) প্রভৃতির কথা। ভাল ছাত্র বলে মোটেই বলা যেত না, কিন্তু এদের কি ভালই বাসতেন। কারণ এরা খেলাধুলায় খুব ভাল ছিল।

ছাত্রজীবনের পরও বহু বছর পর্যন্ত অর্থাৎ যতদিন বেঁচেছিলেন দেখেছি একবার অনুর বাড়ি যাওয়া চাইই। যেন কোন বন্ধুর খোঁজখবর নিতে যাচ্ছেন। তনয়দাকে আশ্রম ছেড়ে কোথাও বড় একটা যেতে দেখিনি। একবার শুধু আমাদের কলাভবনের দলের সঙ্গে হেবেলি খড়্গপুরের লেকের ধারে এক্সকার্শনে গিয়েছিলেন।

এই এক্সকার্শনের কথা আগে বলা হয় নি। বার দুই এখানেও আমরা ক্যাম্প করেছি। প্রায় ১৮ মাইল লম্বা এই লেক। শুনেছি কোন নদীর মুখ বন্ধ করে দিয়ে এটা হয়েছিল। লেকের ধারে ধারে এবং মাঝে মাঝে ছোট ছোট পাহাড় আছে। বেশির ভাগই শালগাছের জঙ্গল। আমরা যেখানে ক্যাম্প করেছিলাম তার থেকে অনেকটা দূরে ঘন জঙ্গলের মধ্যে একটা খুব গরম জলের সরু নদী ছিল। নাম 'বার্কি কুন্ড'। জলটা এত গরম যে স্নান করা প্রায় অসম্ভব যেখান থেকে জলটা বের হচ্ছে সেখানে। অনেক নীচে নেমে এসে, তাও অতি কষ্টে স্নান করেছিলাম আমরা। সমস্ত দিন কাটিয়ে সন্ধ্যেবেলা

ফেরা হয়েছিল। সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল খাবার। দুই দলে ভাগ হযে দুদিনে যাওয়া হয়েছিল কারণ যে দুটো নৌকো এখানে ছিল তা যথেষ্ট বড় নয়। আমাদের ক্যাম্পের থেকে মাইল দুই তিন দূরে কানোয়া নামে একটা জায়গায় এই নৌকো দুটো থাকত। যেদিন যাওয়া হয়েছিল সেদিন মনে আছে অন্ধকার থাকতে উঠে আমি আর গোরা ঐ প্রচন্ড শীতের মধ্যে হেঁটে গিয়ে ছোট নৌকোটা বেয়ে নিয়ে এসেছিলাম কানোয়া থেকে। পরে বড় নৌকোটা নিয়ে এসেছিল মাঝিরা। আগেই বলেছি চারধারেই বড় বড় শালগাছে ভরা ছোট সব পাহাড় ছিল। নৌকোতে যেতে যেতে চিৎকার করে কিছু বললে গোটা কথাটাই প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসত। যাবার সময় সবাই তাই করছে, খুবই মজা লাগছিল। এখানেও ভীমবাঁধের মত ভল্লুকে ভরা।

তনয়দা সেবার এই এক্সকার্শনে থাকাতে আরও জমেছিল। মনে আছে আমাদের অনেককে নিয়ে পাথর ফেলে ফেলে কত বড় ঘাট তৈরী করেছিলেন ক্যাম্পের সামনে।

কি উৎসাহ সমস্ত কাজেই। খুব আনন্দে কাটিয়েছিলেন ঐ কয়দিন আমাদের সঙ্গে। এছাড়া শান্তিনিকেতনে আসার পর আর বাইরে কোথাও গেছেন বলে শুনিনি।

খেলাধুলায়, পিক্‌নিকে, ঘরোয়া বৈঠকে সব কিছুতেই ভরাট করে রাখতেন তনয়দা। একদিনের কথা মনে পড়ে। আমি তখন শ্রীনিকেতনে বড় বাড়ির দোতলায় গানের ক্লাস করছি। সকাল থেকে বৃষ্টি চলেছে তো চলেছেই। থামবার নাম নেই। আগে আগে তো বৃষ্টি নামলেই ক্লাস ছুটি হয়ে যেত আর সবাই এক জায়গায় কোন বড় ঘরে জড় হয়ে খুব গান হতো একটার পর একটা। আমি তো ক্লাসের থেকে শুনতে পেলাম নীচের থেকে কে যেন ডাকছে, "এই শিশির নেমে এস আর ক্লাস করতে হবে না।" যেন তনয়দার গলা! ওপর থেকে তাকিয়ে দেখি ঠিক তাই। তনয়দা, সেবকবাবু, পূর্ণময়বাবু আরও কেউ কেউ সব ভিজতে বের হয়েছেন। বেরিয়ে পড়লাম ওঁদের সাথে। ওখান থেকে বল্লভপুরে আমার কুটিরে গিয়ে ওখান থেকেই জিনিসপত্র যোগাড় করে খিচুড়ি রান্না হয়েছিল। কি জমাই জমেছিল সেদিন!

আশ্রমে কলাভবনের বাইরে যেসব শিক্ষককে খুব কাছে পেয়ে ধন্য হয়েছি, শিখেছি অনেক, তাঁদের মধ্যে তনয়দার নাম বলতে হয় প্রথমেই। তাঁর সঙ্গে

অনেক মধুর ঘটনার স্মৃতি চিরজীবন প্রাণ সঞ্চার করবে এ আমার নিজের সত্যিকারের অনুভূতি। আজ অনেক বছর গত হয়েছেন। কিন্তু এখনও প্রতিক্ষণেই তাঁর অভাব অনুভব করি।

৺জগদানন্দ রায়—১৯০১ সনে আসেন ব্রহ্মচর্য আশ্রমের প্রথম শিক্ষক হয়ে। এঁকে দূর থেকেই দেখেছি। ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ হয়নি। মালতী লতার তলায় গেইটের কাছেই ক্লাস নিতেন। শুধু এইটুকুই মনে পড়ে পাকান চেহারা, ভয় লাগত খুব দূর থেকে। শুনেছি খুব কড়া প্রকৃতির শিক্ষক ছিলেন।

একটা গল্প শুনেছিলাম তাঁর সম্বন্ধে। বড়দাদা (৺দ্বিজেন্দ্রনাথ) থাকতেন নীচু বাংলায়। ৺জগদানন্দবাবুর ক্লাসের পাশ দিয়ে বেরিয়ে ফেরবার সময় দেখতে পেলেন একটি ছেলেকে খুব মারছেন। তাই দেখে বাড়িতে এসে ছোট্ট একটি কবিতা লিখে পাঠিয়ে দিলেন।

"শুনহ জগদানন্দ দাদা,
গাধাকে পিটিলে না হয় অশ্ব
অশ্বকে পিটিলে হয় গাধা।"

৺দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর—ওঁকে আমি বছর তিনেক পেয়েছিলাম। তারপরেই কলকাতায় চলে যান। আর আসেন নি। দিনুদার কাছে অল্প কিছুদিন শেখার সুযোগ পেয়েছি আগেই লিখেছি। তখন বেলা তিনটের সময় তাঁর ক্লাস হতো কলাভবন মিউজিয়ামে। খুব বেশি ছাত্রছাত্রী তো ছিল না তখন। কারণ আশ্রমের লোকসংখ্যাই বা আর কত! এই আর একজনকে দেখেছি সকলের কাছে কী প্রিয়ই ছিলেন। দেখলেই সবাই ছুটে এসে ঘিরে ধরত। যে কয়টা উৎসব অনুষ্ঠানে দেখেছি. খুব ভাল করেই মনে আছে। গানের দলটি ভরাট হয়ে যেত তিনি উপস্থিত হলেই। খুব জমাটি লোক ছিলেন তো। খুব মোটা ছিলেন বলে মেয়েরা মজা করে জিগেস করত, "দিনুদা আপনার ওজন কত?" উত্তরে বলতেন, "এক মন বিরাশি সের।" কখনও তিন মন দু'সের বলতেন না।

একটা গল্প শুনেছিলাম সাবিত্রীদির কাছে। 'বাসন্তী হে ভুবনমোহিনী' গানটা যখন তৈরী হল তখনকার ঘটনা। সাবিত্রীদিকে ডেকে গুরুদেব ওঁর কাছ থেকে শোনা ওঁদের দেশের যে গানটির সুরের উপর কথা বসিয়ে গানটি

বেঁধেছিলেন সেই গানটি বার বার গাইতে বলছেন আর গুরুদেব কথা রচনা করছেন গানটির। এই রকম ভাবে অনেক বেলা হয়ে গেছে। খাবার ঘন্টা পড়ে গেছে অনেকক্ষণ। উস্‌খুস্‌ করছেন সাবিত্রীদি, কিছু বলতে পারছেন না। গুরুদেব সেটা লক্ষ্য করেছেন। "তোর খাবার এখানে তৈরী আছে। তুই ভাবছিস কেন?" গানটি যখন তৈরী হয়ে গেল তখন ডেকে পাঠালেন দিনুবাবুকে স্বরলিপি করার জন্য। বেলা অনেক হয়েছে তখন। বিরক্তিভরে এলেন। গানের কথাগুলি শুনে একেবারে মুগ্ধ, "কোথা থেকে পাও তুমি কথাগুলি বলতো!" গুরুদেবও মৃদু হেসে পা দোলাতে দোলাতে বললেন, "ঐ তো, ঐ তো।"

৺শ্রীমতী রমা কর (নুটুদি)—৺শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের মেয়ে এবং ৺সন্তোষ মজুমদার মহাশয়ের বোন। ৺সুরেন্দ্রনাথ করের স্ত্রী। আমি যখন এখানে এলাম তখন দিনুবাবু ছাড়া গুরুদেবের গান শেখাতেন নুটুদি এবং শান্তিদা। নুটুদি এবং শান্তিদার কাছ থেকে গান শিখলেও এঁরা তখনকার মাইনে করা শিক্ষিকা বা শিক্ষক ছিলেন কিনা জানি না। তবে নিয়মিতভাবে এঁদের কাছে শিখতাম আগে বলেছি। প্রসঙ্গত এখানে তখনকার কোন কোন ভাল গাইয়ে বন্ধুর কথাও উল্লেখ করতে হয় যাদের কাছেও কিছু কিছু গান শিখেছি। যেমন সাগরময় ঘোষ (শান্তিদার ভাই) এবং পিনাকীন ত্রিবেদীর কথাই মনে পড়ে। এদের দুজনের গানের গলা খুবই ভাল ছিল। পিনাকীনের কথা আগেই উল্লেখ করেছি।

৺নুটুদির কাছে মাঝে কিছুদিন রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর মিউজিয়ামের বারান্দায় আমরা কয়েকজন শিখতাম সে তো বলেছি। তাঁর হাতের লেখা দু'তিনটে গান এখনও আমার কাছে সযত্নে রক্ষিত আছে। খুব বেশিদিন আমরা তাঁকে পাইনি। অসুস্থ হয়ে যখন কলকাতা গেলেন আমাকে তাঁর বাড়ি পাহারা দেবার জন্য বলে গিয়েছিলেন। আর তো ফিরলেন না। এখানকার অনুষ্ঠানাদিতে বিশেষ দেখবার সুযোগ হয়নি। নতুন গান তৈরী হলেই যেমন শান্তিদার ডাক পড়ত গুরুদেবের কাছ থেকে সেই রকম নুটুদিরও ডাক পড়ত দেখেছি। খুব মিষ্টি গানের গলা ছিল এবং খুব প্রিয় ছিলেন গুরুদেবের।

শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ—৺কালীমোহন ঘোষের বড় ছেলে একেবারে

ছোটবেলা থেকে এখানকার মাটিতে মানুষ। শান্তিদা সম্বন্ধে আলাদা করে লেখার দরকার করে না। আশ্রমজীবনে নানা নৃত্যনাট্য বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান, প্রাত্যহিক বৈতালিক প্রভৃতি শান্তিদাকে ছাড়া ভাবাই যায় না। এক কথায় আশ্রমজীবনে ওঁর অবদান সকলেরই জানা।

৺অক্ষয়বাবু পদবীটা মনে নেই। অল্পদিনই দেখেছি। হাসপাতালে রোগীদের দেখাশোনার কাজ করতেন খুব দরদ দিয়ে। অতি ভালমানুষ। খুব বড় গোঁফ ছিল। মাস্টারমশাইর খুব বন্ধু ছিলেন। কলাভবনের পিকনিকে অথবা এমনিতেও প্রায়ই আমাদের মধ্যে থাকতেন। সবাই ভালবাসত তাঁকে।

অক্ষয়বাবুর কথায় মাস্টারমশাইর একটা ঘটনার কথা মনে পড়ল। আমরা পিকনিকে গেছি শ্রীনিকেতনে। অক্ষয়বাবুও আছেন আমাদের সঙ্গে। বিড়ি খেতেন খুব। মাস্টারমশাই সঙ্গ দেবার জন্য কখনও সখনও এক আধটা ধরাতেন। তখন গোঁফ ছিল মাস্টারমশাইরও। অক্ষয়বাবু একটা বিড়ি ধরিয়ে মাস্টারমশাইকেও দিয়েছেন একটা। এখন হয়েছে কি একটু পরে মাস্টারমশাইর বিড়ি গেছে নিভে। বার বার দেশলাই জেবলেও ধরাতে পারছেন না। কাঠি পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। ভয়, পাছে আগুন ধরে যায় গোঁফে। এইরকম দুই তিনটে কাঠি পুড়ে যেতে দেখে বনবিহারীদা আর থাকতে না পেরে আর একবার যখন ধরাতে যাচ্ছেন তখন আস্তে করে হাতটা ঠেলে লাগিয়ে দিয়েছেন। "থাম হে গোঁফ পুড়ে যাবে।" প্রায় লাফিয়ে উঠেছেন মাস্টার-মশাই। পোড়া বিড়ি ততক্ষণে চট করে ধরে গেছে।

শ্রীযুক্ত তেজেশচন্দ্র সেন—১৯০৯ সনে শান্তিনিকেতনে আসেন। আমরা তাঁকে মন্দিরের কাছে তালধ্বজে থাকতে দেখেছি। এই বাড়ি খড়ের চাল-ওয়ালা। একটি তালগাছকে মাঝখানে রেখে তার চারদিকে ঘুরিয়ে তৈরী এই গোলাকার মাটির বাড়ি। ছোটদের ভূগোল আর গাছপালা সম্বন্ধে পড়াতেন। সদা হাসিমুখ। গাছপালা খুব ভালবাসতেন এবং বিশেষ জ্ঞানও ছিল গাছপালা সম্বন্ধে। আশ্রমের গাছপালা বাগান ইত্যাদি দেখাশোনার ভার তাঁরই উপর ছিল। অবসর সময় বেহালা বাজাতেন। অক্ষয়বাবুরই মত ইনিও মাস্টারমশাইর খুব বন্ধু ছিলেন। আশ্রমের ছোটবড় সকলেরই খুব প্রিয় ছিলেন।

একদিন খুব চাঁদের আলোয় আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি বন্ধুরা মিলে অনেক রাত পর্যন্ত। সকলের খুব ইচ্ছে হল মুরগির মাংস খেতে হবে। কোথায় পাওয়া যায় মুরগি? আমাদেরই এক বন্ধু রমেন সরকারের একটা বড় মোরগ ছিল। সেটা চুরি করে আনা হল কিন্তু তাতে তো কুলোবে না। আশ্রমের নানা জায়গায় সব বুনো পায়রার আস্তানা ছিল। নীচুবাংলোয়, লাইব্রেরীর ছাদে, মন্দিরের চালের তলা প্রভৃতি জায়গায়। ঠিক হল পায়রা জোগাড় করতে হবে ঐসব জায়গা থেকে। প্রথমে নীচুবাংলোয় যাওয়া হল, পাওয়া গেল না। লাইব্রেরীর ছাদে ওঠা হল দেয়াল বেয়ে। ছাদের পাশে পাশেই মস্ত বড় বড় সব কুলঙ্গি ভরা পায়রার বাসা। হাত দিয়ে তার শেষ পর্যন্ত নাগাল পাওয়া যায় না। সেখানেও পাওয়া গেল না। শেষ চেষ্টা মন্দিরে। গোরার কাঁধে চেপে পায়রা ধরব। চেপেছি কাঁধে, আর যাবে কোথায়, ফট্ ফট্ শব্দ করে একটার পর একটা মুখের উপর পাখার ঝাপটা দিয়ে দিয়ে সব উড়ে পালাতে লাগল। ঐ শব্দে তেজেশদার ঘুম গেছে ভেঙ্গে। ছুটে বের হয়েছেন মন্দিরের দিকে। আমরাও পড়িমরি করে দে ছুট। শেষ পর্যন্ত ঐ এক মোরগের মাংসই রান্না করে খাওয়া হয়েছিল অতি কষ্টে তেল নুন প্রভৃতি সব জিনিসপত্র যোগাড় করে রাত তিনটের সময়। বাঃ বাঃ, ভুলব না কোনদিন তেজেশদার কাছ থেকে সেই তাড়া খাওয়ার কথা।

শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত রায় চৌধুরী—সুধাকান্তদা হলেন নিশিকান্তের বড় ভাই। বহুকালের শান্তিনিকেতনের বাসিন্দা। ঠিক কখন এখানে এসেছেন জানি না। গুরুদেবকে যাঁরা দেখাশোনা করতেন তাঁদের মধ্যে সুধাদাকেই দেখেছি বেশি। খুব ভালবাসতেন গুরুদেব। নিশিকান্তর মতই খেতে খুব ভালবাসতেন এবং ভাইএর মতই নানা রকম মাংস খাবার ঝোঁক ছিল। শুনেছি একবার বাঘের মাংস খেতে চেয়েছিলেন যে বাঘ নেপালী ছেলে নরভূপের ভোজালির আঘাতে মারা পড়েছিল গোয়ালপাড়া গ্রামে বহুবছর আগে। আমি তখন আসিনি। আশ্রমের সব ছেলেরা লাঠিসোটা নিয়ে দল বেঁধে সেই বাঘ মারতে গিয়েছিল। শুনেছি সেই বাঘ মারার গল্প। অবশ্য শেষ পর্যন্ত সুধাদার সেই বাঘের মাংস খাওয়া হয় নি।

একবার সকালবেলায় গুরুদেবের সরবৎ খাওয়া দেখে খুব লোভ হয়েছে। গুরুদেব সেটা অনুমান করে এক গ্লাস এনে দিতে বললেন। এক চুমুক

দিয়ে জব্দ অথচ ফেলতেও পারছেন না আর পারছেন না মুখও বিকৃতি করতে। আসলে সেটা ছিল নিমপাতার।

খুব জমিয়ে গল্প বলার অসম্ভব শক্তি ছিল। ইংরাজী, হিন্দি, উর্দু প্রভৃতি অনেক রকম ভাষায় অতি সুন্দর সুন্দর বক্তৃতা দিতে পারতেন। কিছু-কাল আগে মারা গেছেন।

৺গুরুদয়াল মল্লিক (মল্লিকজী)—বেঁটেখাটো একদম সাদা চুল দাড়ি ও খুব ফর্সা প্রশান্ত চেহারার মানুষ। আশ্রমের ছোট বড় সকলের সঙ্গেই খুব সহজ মধুর সম্পর্ক। কলাভবনে আমাদের হস্টেলেই থাকতেন যদিও ইংরাজী পড়াতেন শিক্ষাভবনে। খুব ভোরে অন্ধকার থাকতে উঠে উদাত্ত কন্ঠে ভজন গাইতেন। দরদ দিয়ে গাওয়া সে গান আজও কানে বাজছে। কয়েক বছর আগে মারা গেছেন এখান থেকে চলে যাবার পর।

৺কালীমোহন ঘোষ—সম্ভবত কালীমোহনবাবু এখানে আসেন ১৯১০ সনে কি তার পর। অন্যান্য অনেকের মতই দেখেছি এই দেবতুল্য মানুষকে। সদা আপন ভোলা কাজপাগল ছিলেন। শ্রীনিকেতনের গ্রামের কাজের ভারপ্রাপ্ত কালীমোহনবাবুর কথা বলতে বহু গ্রামের লোকেরা আজও পঞ্চমুখ তাঁর প্রশংসায়। শুনেছি গ্রামেই কাটাতেন বেশির ভাগ সময় যার জন্য গ্রামের লোকের সঙ্গে গভীর আত্মীয়তা ছিল। এতই ভোলা মানুষ ছিলেন যে শুনেছি অনেক সময় মানুষকে খাবার নেমন্তন্ন করে একেবারেই ভুলে যেতেন বাড়িতে বলতে। এমনও নাকি হয়েছে যে নিমন্ত্রিতরা এলেও অনেক সময় মনেও পড়ত না তাঁর। আমার নিজের কথা মনে আছে। বার বার মনে করে দেওয়া সত্ত্বেও হীরেন বলে ডাকতেন আমাকে। "হীরেন নয় মাস্টারমশাই, শিশির।" "ও হ্যাঁ, শিশির শিশির।" পরে আবার সেই 'হীরেন'। সবাইকে বলতে শুনেছি, "এমন গ্রামদরদী মানুষ দেখিনি।"

৺অনিলকুমার চন্দ—শুনেছি ছোটবেলায় এখানকারই ছাত্র ছিলেন। আমরা শিক্ষাভবনের অধ্যক্ষ হিসেবে দেখেছি খুব সম্ভব ধীরেনদার পর। পরে গুরুদেবের সেক্রেটারি হয়েছিলেন। খুব জমাটি লোক ছিলেন। সব সময়ই মজার মজার গল্প বলে জমিয়ে রাখতেন। কিছুদিন আগে মৃত্যু হয়েছে।

এই রকম আরও অনেককে দেখেছি। দেখেছি অঙ্কের অধ্যাপক ৺নগেন আইচ মশাইকে। শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়কে। ইনিও খুব ভাল ফুটবল

খেলতে পারতেন আর পারতেন ভাল ছোট লাঠির খেলা খেলতে। মনাদা ছিলেন ছোরা, লাঠিখেলা, কুস্তি প্রভৃতির শিক্ষক। জাপানী ভদ্রলোক টাগা-কাগি ছিলেন যুযুৎসুর মাস্টার। হিরণদি রান্নাঘরের দেখাশোনা করার জন্য ছিলেন। ছেলেমেয়ে বয়স্ক সকলের কাছেই খুব প্রিয়। আরও ছিলেন সরোজিনীদি খুব কড়া প্রকৃতির, ইনিও রান্নাঘরের দেখাশোনা করতেন। ৺সত্য মুখোপাধ্যায় লাইব্রেরীতে কাজ করতেন; অতি অমায়িক মিস্টভাষী লোক। আরিয়েমদা শিশুবিভাগের ছেলেদের দেখাশোনার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। আশাদিও শিশুবিভাগের ছেলেদের দেখাশুনা করতেন। পরে আশাদিকে বিয়ে করেছিলেন আরিয়েমদা। তখন শ্রীসদনের ভারপ্রাপ্তা ছিলেন হেমবালাদি (সেন)। খুব কড়া ছিলেন বলে মেয়েরা সব ভয় করত খুব। বড় মেয়েরা একটা উপায় আবিষ্কার করেছিল তাঁকে জব্দ করবার। দেরি করে অসময়ে ফিরলে বকুনি দিতে আরম্ভ করলেই মেয়েরা ইংরাজীতে কথা বলতে আরম্ভ করত হেমবালাদির সঙ্গে আর অমনি চুপ হয়ে যেতেন তিনি। ইংরাজীতে কথা বলতে ভয় ছিল তাঁর। শিক্ষাভবনের অধ্যক্ষ ছিলেন নলিন গাঙ্গুলীমশাই আর গুরুদেবের কুটুম্ব প্রমোদ গাঙ্গুলীমশাই ছিলেন গেস্টহাউস ম্যানেজার। এই রকম আরও অনেককে দেখেছি যাঁদের একজনকেও বাদ দিয়ে শান্তি-নিকেতনের কথা ভাবা যায় না। যে যার কাজে মত্ত।

তখনকার অফিস ছিল রান্নাঘরের পাশে ছোট্ট বাড়িতে। কজনই বা ছিলেন অফিসের কাজে! আশ্রম সচিব ছিলেন সুরেনবাবু (কর)। একবার কিছু-দিনের জন্য প্রমোদবাবুও (ঘোষ) হয়েছিলেন। কর্মসচিব রথীদা।

সিংহসদন—তখনকার যা কিছু অনুষ্ঠানাদি এখানেই হতো। একটা ছোট স্টেজ ছিল এখানে অভিনয়াদির জন্য। কখনও কখনও লাইব্রেরীর বারান্দায়ও অভিনয় হতো। এই বাড়ির ছাদের উপরেই ঘন্টা আছে। তার সঙ্গে দড়ি বেঁধে নীচে ঝুলিয়ে দেওয়া এবং ওখান থেকেই সেই দড়ি ধরে টেনে ঘন্টা বাজান হয়। তার আগে ঘন্টা ছিল ৺জগদানন্দবাবুর গেইটের তলায় ক্লাসের কাছেই বড় বটগাছতলায়। বাঁধান বেদীর উপর সেই ঘন্টা ঝোলান ছিল খুব বড় এবং ভারী। হাতে করেই তা বাজানো হতো। শুনেছি সম্প্রতি সেটা চুরি হয়ে গেছে। এখনও সেই বেদী আছে। ঘন্টা আরও একটি আছে মন্দিরে। আশ্রমের ঘন্টার নানারকম সংকেত আছে। এক দুই তিন করে

তিনবার বাজান হয় সাধারণতঃ সব কিছুর আগে যাকে বলে ওয়ার্নিং, যেমন উপাসনা, খাবার সময় অথবা অন্য কিছুর আগে। এক দুই তিন চার করে চারটে চারটে ঘন্টা বহুবার বাজান হয় কোন সভা, অভিনয় ইত্যাদির আগে। এই রকম করেই পর পর অনেকক্ষণ ধরে যখন পাঁচটা পাঁচটা বাজান হয় তখন বোঝা যায় কোন বিপদ হয়েছে। আগুন লাগলে, আশ্রমের বিশিষ্ট কেউ মারা গেলে অথবা অন্য কোনরকম বিপদ হলে পাঁচটা পাঁচটা ঘন্টা পড়ে। সাধারণতঃ ঘন্টা বাজাবার ভার থাকত পালা করে পাঠভবনের বড় ছেলেদের উপর। তবে পাঁচটা পাঁচটা বিপদসংকেতের ঘন্টা যে কেউ বাজাতে পারে। এইসব ঘন্টার সঙ্গে আমাদের এমনই পরিচয় হয়ে গিয়েছিল যে এই পাঁচটা পাঁচটা ঘন্টা শুনলেই চমকে উঠে সবাই ছুটে বেরিয়ে পড়তাম খোঁজ নিতে কোথায় কি হয়েছে।

শুনেছি শ্রীনিকেতনের বড় বাড়িটা যখন কিনে নিলেন গুরুদেব গ্রামের কাজের উদ্দেশ্যে লর্ড সিংহের কাছে থেকে তখন তিনি সেই টাকাটা দান করে দিয়েছিলেন গুরুদেবকে এবং ঐ টাকাতেই সিংহসদন তৈরী হয়েছিল।

বেণুকুঞ্জ—খেলার মাঠের পাশেই এই খড়ের চালওয়ালা বাড়িতে ৺বিধুশেখর শাস্ত্রী মশাইকে থাকতে দেখেছি। তনয়দাও পরে কিছুদিন এখানে ছিলেন এবং আরও কেউ। এই বাড়ি খেলাধুলার উদ্দেশ্যেই ব্যবহার হত। ক্রীড়াবিভাগের অফিস। সম্প্রতি পুড়ে গেছে।

চাচক্র (দিনান্তিকা)—বেণুকুঞ্জের পাশেই। এখানে দিনের শেষে কর্মক্লান্ত কর্মীরা উপস্থিত হয়ে গল্পগুজব করতেন এক কাপ চা সহযোগে। গুরুদেবের 'হায় হায় হায় দিন চলি যায়' গানে আশ্রমের অধ্যাপক ও কর্মীদের সম্বন্ধে উল্লেখ আছে নাম না করেও বোধহয় আগেই বলেছি।

তালধ্বজ—এর বর্ণনা আগেই দিয়েছি। এখানে এখন কারুসঙ্ঘের নানারকম হাতের কাজ হয়।

নহবতখানা—উত্তরায়ণের পূর্বদিকের মাঠে আগে পৌষমেলা হতো। সেই মাঠের উপর দিয়ে দক্ষিণদিকে যে রাস্তা গেছে এবং হাসপাতালের দিক থেকে পশ্চিমদিকের রাস্তার সংযোগস্থলে চৌমাথার উপরে চারটে তালের খুঁটির উপর এই নহবতখানা ছিল। মেলার সময় সানাই বাজত। একদিন কালবৈশাখীর ঝড়ে ভেঙ্গে পড়ে। আর তৈরী হয়নি।

গেষ্টহাউস—মন্দিরের দক্ষিণে বড় দোতলা বাড়িই এখানকার সবচাইতে পুরানো "শান্তিনিকেতন"। এই বাড়িতেই তখনকার গেস্টহাউস ছিল।

আম্রকুঞ্জ—গেস্টহাউসের দক্ষিণে। বসন্তোৎসব, সাহিত্যসভা প্রভৃতি নানা অনুষ্ঠান এখানে হয়। রাত্রিবেলাতে আলো দিয়েও অনেক অনুষ্ঠান হ'তে দেখেছি। গুরুদেব সে সবের অনেক অনুষ্ঠানেই উপস্থিত থাকতেন বলাই বাহুল্য। তখনতো সমাবর্তন হতো না। এখন সমাবর্তন এখানেই হয় সকলেরই জানা।

বীথিকা—শালবীথিকার ধারে আমবাগানের দক্ষিণে লম্বা খড়ের চালওয়ালা মাটির বাড়ি ছিল। বড় ছেলেদের হস্টেল হিসেবেই ব্যবহার হ'তে দেখেছি। এখন আর সে বাড়ি নেই।

সংস্কার ভবন—আম্রকুঞ্জের পূর্ব উত্তরে লম্বা খড়ের ঘর ছিল। দুঃস্থ ছেলেরা সাধারণতঃ এখানে থাকতেন। কমখরচে নিজেদের রান্নাঘর আলাদা-ভাবে চালাতেন। এই বাড়ির উত্তরদিকে বড় পুকুরের মত গর্ত ছিল এবং বর্ষাকালে জল জমে বেশ বড় পুকুরই হয়ে যেত। প্রায় ছ মাস জল থাকত এই পুকুরে। সেই সময় সংস্কার ভবনের ছেলেরা এখানে মাছ ছাড়তেন। পুজোর ছুটির সময় মাছগুলি বেশ বড় হয়ে উঠত। আমরা সেই মাছ ছোট ছোট ছিপ্ দিয়ে ধরতাম। অনেক সময় মাস্টারমশাই দু'চারটে নিয়ে যেতেন খাবার জন্য। এখন সে পুকুর বুজিয়ে দেওয়া হয়েছে। ৺সুধীর কর মশাই এই সংস্কারভবন পরিচালনা করতেন এবং যতদূর মনে পড়ে ইনিই এর প্রতিষ্ঠাতা, ঠিক মনে নেই।

এই সুধীরবাবু সম্বন্ধে আগে বোধহয় বলিনি। এঁকে দেখেছি নানারকম গ্রামের কাজ করতে খুব নিষ্ঠা সহকারে। গরীবদের কথা ভাবা, 'নাইট্ স্কুল' করা প্রভৃতি কাজ নিজে থেকেই অতি উৎসাহভরে করতেন একেবারে অন্তর থেকে। কোন ফাঁকি ছিল না সেখানে।

ওর আরও গুণ ছিল। গাইয়ে ছিলেন। গুরুদেবের বহু গান জানতেন এবং তাঁর অনেক গানেরই স্বরলিপি সুধীরবাবুর করা। বোলপুর গার্লস্ স্কুলে বহুদিন গান শিখিয়েছেন। আমরাই দেখেছি এস্রাজ কাঁধে ঝুলিয়ে সাইকেলে অথবা হেঁটে চলেছেন গান শিখাতে হয়ত কোন গ্রামে অথবা কোন প্রতিষ্ঠানের ডাকে। ক্লান্তি বা বিরক্তি বলে কোন জিনিস কখনও

দেখিনি। একবার মনে আছে কোন উপলক্ষে শ্রীনিকেতনের ছেলেমেয়েদের অনেকগুলি কীর্তনাঙ্গের গান শিখিয়ে দিয়েছিলেন খুব পরিশ্রম করে। রোজ কষ্ট করে সেই ভুবনডাঙ্গা থেকে আসতেন। গুরুদেবের কীর্তন এবং বাউল অঙ্গের গান খুব প্রিয় ছিল। নিজেও কবি ছিলেন। ওঁর নিজের তৈরী অনেক গান আছে। বেশ কিছুদিন গুরুদেবের একান্ত সচিবের কাজ করেছেন। বাঙ্গাল বলে সম্বোধন করতেন গুরুদেব। বাড়ি খুব সম্ভব কুমিল্লায় ছিল।

পাঠভবনের ছাত্রাবাস ছিল সিংহসদনের দুই পাশে এবং সামনে উত্তরদিকে প্রাক্‌কুটীর, শমীন্দ্রকুটীর প্রভৃতি নামে। এখন আগেকার সে সব বাড়ির জায়গায় নতুন সব বাড়ি তৈরী হয়েছে। শিশুবিভাগ বীথিকার দক্ষিণে। আগেই বলেছি বীথিকা নামে সেই বাড়ি এখন আর নেই। পাঠভবনের ছেলেদের হস্টেল এখন অন্য সব নতুন বাড়িতে হয়েছে।

গুরুপল্লী একেবারে আশ্রমের দক্ষিণপ্রান্তে। সব বাড়িই মাটির, খড় অথবা টিনের চাল। এখনকার মত পাকাবাড়ি ছিল না কারোরই। পূর্বদিক থেকে আরম্ভ করি যাঁরা থাকতেন তাঁদের নাম।—(১) মাস্টারমশাই, (২) জগদানন্দবাবু, (৩) সত্যবাবু, (৪) প্রভাতবাবু, (৫) প্রমোদবাবু, (৬) হরিবাবু, (৭) ক্ষিতিমোহনবাবু, (৮) নেপালবাবু। এঁরা ছাড়া আর যে দুতিন বাড়ি, সেখানে অধ্যাপক কেউ ছিলেন না। নিশিকান্তর গুরুপল্লীনামা গানে এঁদের সকলের কথারই উল্লেখ আছে।

ছাতিমতলা—শ্বেতপাথরের বাঁধান বেদী ছিল। এখন তার অনেক বদল হয়েছে। চারদিকে শালগাছের ছায়া। ৭ই পৌষ এবং অন্যান্য মন্দিরের অনুষ্ঠান খোলা জায়গায় এখানেই হয় কারণ এখন লোকসংখ্যা বেড়ে যাওয়াতে আগের মন্দিরে (কাঁচ ঘর) আর স্থান সংকুলান হয় না।

খেলার মাঠ—শ্রীসদনের (মেয়েদের হস্টেল) দক্ষিণদিকে মস্ত বড় খেলার মাঠ। গুরুপল্লীর উত্তরেও খোলামাঠ ছিল। তারই একেবারে উত্তরদিক ঘেঁষে দুটো পাশাপাশি বাঁধান টেনিস কোর্ট ছিল এবং তাছাড়া উত্তরায়ণে আর একটি। এটি এখনও আছে।

নানারকম খেলাধুলায় ছেলেমেয়েরা মেতে থাকত। এখানকার ফুটবল টিম খুবই ভাল ছিল। বাইরের থেকে প্রায়ই অনেক টিম খেলতে আসত এবং বড়

একটা জিততে যেতে পারত না কেউ। মোহনবাগানের মত টিম দুবার এসে হেরে গেছে। এখানকার বহু ছেলে পরে বাইরে বড় বড় টিমে খেলে নাম করেছেন।

বড়দের মধ্যে যাঁরা বিশেষ উৎসাহী ছিলেন খেলাতে তাঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় বীরেনদা (সেন), তনয়দা, ধীরেনদা, বিশ্বনাথদা প্রভৃতির। ফুটবলে যারা নাম করা প্লেয়ার তাদের মধ্যে এঁরা ছাড়াও ছাত্রদের মধ্যে অনু (অনুপানন্দ ভট্টাচার্য, ৺জগদানন্দবাবুর দৌহিত্র), রেণ্টু (প্রশান্ত ভট্টাচার্য, ৺জগদানন্দবাবুর দৌহিত্র), রোজলি (জাভার ছেলে), রমেন সরকার (৺সরোজিনীদির ছেলে), কান্তেশ রায় (সুন্দরদির দেওরের ছেলে), মন্টু শান্তিপ্রিয় রায় (সুন্দরদির এবং বিখ্যাত মোহনবাগানের প্লেয়ার ৺প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের পুত্র) ৺অসীম চৌধুরী ৺সরোজদার ছেলে। সরোজদা এখানকার প্রাক্তন ছাত্র এবং কর্মীও ছিলেন। নামকরা ফুটবল প্লেয়ারও ছিলেন। সুখময় মিত্র (কলাভবনের ছাত্র), শ্রীসন্তোষ রায় (শ্রীনিকেতনের কর্মী ছিলেন। অতি নিপুণ হাতে কাঠের কাজ করেন)। শ্রীহীরালাল মুখার্জী (শ্রীনিকেতনের কর্মী ছিলেন) জহর দাস (শিক্ষাচর্চার ছাত্র ছিল), সুধীর দাস (শিক্ষাচর্চার ছাত্র ছিল), শ্রীরবি ঘোষ (কলেজের ছাত্র ছিলেন) প্রভৃতি অনেকেই। এছাড়াও অনেক ছিলেন, সকলের নাম মনে পড়ছে না। গৌরদা (৺গৌরগোপাল ঘোষ), সরোজদা, এঁদের খেলা দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। শুনেছি খুব নামকরা প্লেয়ার ছিলেন।

একেকটা ম্যাচের পরই আশ্রমের এবং বাইরের সব প্লেয়াররা গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। খুব খুশী হতেন তিনি।

যদিও ফুটবলই প্রধান আকর্ষণ ছিল ছোটবড় সকলের কাছে, কিন্তু অন্যান্য খেলাতেও বড় কম ছিল না। টেনিস, ক্রিকেট, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন, ধাপসো, হাডুডু প্রভৃতিতেও প্রায় সমান উৎসাহ ছিল। টেনিস ও ভলিবল টুর্নামেন্ট হতো বিভিন্ন দলের সঙ্গে। টেনিস টুর্নামেন্টের খেলা হতো উত্তরায়ণের কোর্টে। রথীদা, তনয়দা, জ্যোৎস্না ডাক্তারবাবু, প্রমথদা (সেন) প্রভৃতি বড়রাও আমাদের সঙ্গে যোগ দিতেন। অ্যানড্রুজ মেমোরিয়েল কাপ খেলা হতো; অ্যানড্রুজ সাহেবের নামে এই কাপ ছিল। আমি আর অনু পার্টনার ছিলাম। পর পর দুবার আমরা 'চ্যামপিয়ান হয়েছিলাম। একবারের কথা মনে আছে। আমাদের উল্টোদিকের দলে ছিল কলেজের রমেন দেববর্মন ও মধু

(গুরুপ্রসন্ন) তারাও খুব ভাল খেলে। আমি আর অনু উপস্থিত হয়ে দেখি দর্শকে ঠাসা মাঠ। ফাইনাল খেলা। খুব উত্তেজনার মধ্যে খেলা শেষ হল। প্রত্যেক বছরই ফাইনাল খেলার দিন রাত্রে রথীদা সব দলকেই খুব খাওয়াতেন। কলকাতা থেকে মিষ্টি এবং পান আসত তবক দেওয়া।

ভলিবলেও এই রকম টুর্নামেন্ট হতো। কলেজ, কলাভবন, শিক্ষক কর্মী, শ্রীনিকেতন, প্রাক্তন ছাত্র প্রভৃতির বিভিন্ন দলের মধ্যে এমনকি বোলপুরের দলও যোগ দিত মাঝে মাঝে। বোলপুরের দলের সঙ্গে আমাদের প্রায়ই ম্যাচ হতো ভলিবলের এবং ফুটবলের। একটা জিনিস দেখতাম, যখন বাইরের কোন দল ফুটবল খেলতে আসত, বোলপুরের লোকেরা সর্বদাই বাইরের দলকে সাপোর্ট করত। খেলার সময় চীৎকার করে ওদের উৎসাহ দিত দল বেঁধে।

এসব খেলা ছাড়াও যুযুৎসু, লাঠি, ছোরা খেলা প্রভৃতিও ছিল। যুযুৎসুর জন্য সিংহসদনে মোটা খড়ের মস্তবড় গদি পাতা ছিল মেঝেতে। এসবেই ছেলেদের সঙ্গে মেয়েরাও যোগ দিত বিশেষ করে যুযুৎসু ও ছোরা খেলায়। এমনকি বাইরেও কোন কোন জায়গায় ছেলে এবং মেয়েরা এইসব খেলা দেখাতে যেত।

মাঝে মাঝেই সকল শিক্ষক কর্মীদের আনাড়ি দলের সঙ্গে ম্যাচ হতো আশ্রমের নিয়মিত ফুটবল টিমের। সে এক মজার জিনিস। যে যার স্বাভাবিক পোষাক পরেই, কেউ কেউ হয়ত ছাতা হাতেই স্যাণ্ডেল পায়ে নেমে পড়েছেন মাঠে। মাস্টারমশাই তাঁর পায়জামা গুটিয়ে, গোঁসাইজী তাঁর লম্বা জোব্বা পরে এবং অন্যান্যরাও তাই। সবাই একসঙ্গে বলের দিকে ছুটছেন, কিন্তু বল ছুঁতেও পারছেন না কেউ। খুব মজার ব্যাপার।

তখনকার দিনে আশ্রমের যেখানে সেখানে ধোপাদের গাধা ঘুরে বেড়াতো প্রচুর। গাধার বিকট চিৎকারে অস্থির সব সময়। একবার সেই সব গাধার পিঠে চেপে পোলো খেলা হয়েছিল খেলার মাঠে হকি স্টিক হাতে নিয়ে। কেউবা বল মেরেছেন আর একজন কিছুতেই পেঁছতে পারছেন না বলের কাছে। গাধা ঠায়ে দাঁড়িয়ে আছে একই জায়গায় প্লেয়ারকে পিঠে করে, ; অথবা চাবুক খেয়ে এমনই লাফিয়ে উঠেছে অথবা দৌড় লাগিয়েছে যে মাটিতে গড়াগড়ি হকিস্টিক হাতে প্লেয়ার। সমস্ত মাঠময় মানুষ পিঠে সব গাধার ছড়াছড়ি। চাবুক খেয়ে হয় লাফিয়ে উঠছে নয়ত পেছু হটছে, এগোচ্ছে না কোনটাই। সে এক মজার দৃশ্য। মাঠময় দর্শক ছেলেমেয়েদের গড়াগড়ি হাসির চোটে।

একবারের একটা দুর্ঘটনার কথা বলি। খুবই অস্বস্তিকর ব্যাপার ঘটেছিল। খেলার মাঠে নানা দল নানা রকম খেলায় মত্ত। কলেজের কয়েকটি অবাঙ্গালী ছেলে হাতীপুকুরে গেছে সাঁতার কাটতে। আমরা ভলিবল খেলছি। হঠাৎ দুতিনটি ছেলে ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল একটি ছেলে ডুবে গেছে। আমরাও ছুটলাম সঙ্গে সঙ্গে। ঝাঁপিয়ে পড়লাম জলে। খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করলাম পুকুর তোলপাড় করে। হঠাৎ অনু একেবারে হাঁটুজল থেকে টেনে তুলল ছেলেটিকে। সাঁতার শিখতে গিয়েছিল। অন্য ছেলেরা সাঁতারে ব্যস্ত ওর প্রতি নজর ছিল না। কতক্ষণ পর তাকিয়ে দেখে সে নেই। তোলা তো হল কিন্তু কিছুতেই বাঁচান গেল না বহু চেষ্টা করেও।

বহু বছর আগে এইরকমই জলে ডুবে মারা গিয়েছিল বিকেলবেলা বেড়াতে বেরিয়ে শ্রীনিকেতনের 'ফার্মে'র পুকুরে ৺জগদানন্দবাবুর নাতি পটলদার ছেলে। শিক্ষাসত্রের হস্টেলেই থাকত। তখনকার দিনের এই দুটি জলে ডুবে মারা যাওয়ার ঘটনার কথা মনে পড়ে।

আর একটা অঘটন ঘটেছিল, সেও বহুদিনের কথা। অজিনদার (ঠাকুর) বন্দুকের গুলিতে গুরুতরভাবে আহত হয়েছিল একটি শিশুবিভাগের ছেলে। কুকুর মারতে গিয়ে এই দুঘটনা ঘটেছিল। তখনই তাকে নিয়ে বর্ধমান রওয়ানা হয়ে গিয়েছিলেন তিনি, তাই ছেলেটি রক্ষা পেয়েছিল কিন্তু তার মুখটা বোধহয় বেঁকে গিয়েছিল যতদূর মনে পড়ে।

॥ ১০ ॥

নাচগান অভিনয় নানা উৎসব ইত্যাদি যেমন পুরোদমে চলত সেইসঙ্গে চলত নানারকম খেলাধুলাও সমান উৎসাহেই। এখানকার সমস্ত বিভাগের মাস্টার ছাত্রছাত্রী কর্মীরা যেন একই পরিবারের ; এক সুরে বাঁধা সকলের মনপ্রাণ। সব বিভাগের মাস্টারমশাইদের সঙ্গে সব বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ আত্মীয়তা ছিল। হস্টেলের ছেলেরা যেন বাড়ির ছেলের মত সমস্ত মাস্টারমশাইদের। একবারের কথাই মনে পড়ে। পুজোর ছুটিতে আমরা কয়েকজন হস্টেলে ছিলাম বাড়ি না গিয়ে। একদিন সন্ধ্যেবেলা খেতে এসে দেখি রান্না

হয় নি। রান্নার লোকটি বাড়ি গিয়েছিল, ফেরে নি। আমাদের হস্টেলের পিছনেই ৺কালীমোহনবাবুর বাড়ি। সাগর গিয়ে এই খবরটি দিয়ে দিয়েছে তার মার কাছে। সাগর তারপরেই এসে বলল যে তার মা আমাদের খেতে বলেছেন তাঁর বাড়িতে। মাগুর মাছের ঝোল রান্না করে খাইয়েছিলেন খুব যত্ন করে।

আমার একবার দাঁতে ব্যথা। শক্ত জিনিস চিবোতে কষ্ট। খবর জানতে পেয়ে সুন্দরদি পাতলা খিচুড়ি রান্না করে ডেকে পাঠিয়ে খাইয়েছিলেন। তাই বলছিলাম আমরা তো সব মাস্টারমশাইদের ঘরের ছেলের মত ছিলাম। মাস্টার-মশাইর (নন্দবাবু) বাড়িতে এইরকমভাবে কত খেয়েছি তা আর কত বলব!

আর একটা জিনিস এখানে এসে দেখে অবাক হয়েছিলাম। 'জেনারেল কিচেন' এবং কলাভবনের রান্নাঘরের কথা বলছি। আমরা বাইরে দেখেছি হিন্দু, মাহিষ্য, মুসলমান প্রভৃতি সকলের আলাদা হস্টেল এবং রান্নাঘর। ব্রাহ্মণ কায়স্থরা একসঙ্গে পাশাপাশি বসে খায় না। ব্রাহ্মণকে খাবার সময় ছুঁয়ে দিলে তার খাওয়া তো নষ্ট হতোই প্রায়শ্চিত্ত পর্যন্ত করতে হতো। এখানে এসে দেখলাম সবাই একই সঙ্গে বসে খাচ্ছে কি রান্নাঘরে কি পিকনিকে। ফেকু তো জাতে মেথর ছিল। রান্নার লোক না থাকলে সেও তো আমাদের কলাভবন কিচেনে কত রান্না করে দিয়েছে, বোধহয় আগেই বলেছি। কারুর মনেই কোন প্রশ্ন জাগত না। জাতিভেদ এখানে আপনা থেকেই উঠে গেছে। হিন্দু মুসলমান অথবা সমস্ত জাতের ছেলেমেয়েরা একই সঙ্গে বসে খেত এতই স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল এটা এখানে।

তখন বছরে একবার কি দু'বার 'জেনারেল পিকনিক' হতো আশ্রমের সমস্ত ছাত্রছাত্রী অধ্যাপক কর্মীরা মিলে কাছাকাছি বাইরে কোথাও গিয়ে। মনে পড়ে শ্রীনিকেতনের উত্তরের আমবাগানের পিকনিকের কথা চিপকুঠীর কাছে। এই চিপকুঠীর ভগ্নাবশেষ এখনও আছে। এখন যত বিষাক্ত সাপের আস্তানা। জঙ্গলে ঢেকে গেছে পুরোনো ভাঙ্গা বাড়িগুলি। সকলেরই জানা এখানেই নীলকুঠী ছিল। চিপকুঠীর তিনদিক ঘিরে খোয়াই। এখানকার মধ্যে এটাই ছিল সবচাইতে বড় খোয়াই। এই খোয়াইরই উত্তর দিকে বল্লভপুর গ্রাম। বিখ্যাত সুরেন্দ্র ডাকাতের বাড়ি ছিল এই গ্রামেই। এই খোয়াইর ভেতরে ঠেঙাড়ের আক্রমণের কথা শোনা যায় আগেকার দিনে।

এখন যেখানে বিনয়ভবন তার দক্ষিণে মস্তবড় শালবন ছিল। সেখানেও কত পিক্‌নিক হয়েছে। ঐ শালবনের ভেতর আম গাছও ছিল অনেক। আম গাছগুলি রেখে শাল গাছ সব কেটে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। এখন সেই সুন্দর শালবন আর নেই। সাক্ষী হয়ে দুচারটে গাছ এখনও দাঁড়িয়ে আছে মাত্র।

শান্তিনিকেতন থেকে শ্রীনিকেতনে যেতে পশ্চিমে এবং পূবে মস্তবড় মাঠ ছিল। কোন বাড়িঘরই ছিল না আশেপাশে। শুধু শান্তিনিকেতন থেকে বেরিয়েই দুটো সাঁওতাল গ্রাম, পিয়ার্সন পল্লী আর কালিগঞ্জ। বিনয়ভবনের একেবারে পূবদিকে সুরুলের ৺কার্ত্তিক সরকার মশাইর নিজের হাতের করা বিরাট নানা রকম অতি উৎকৃষ্ট আমের বাগান এখনও আছে। শান্তিনিকেতন শ্রীনিকেতনের মাঝখানের বিরাট মাঠেও ঠেঙাড়ের উৎপাতের কথা শোনা যায়। আমি যখন শ্রীনিকেতনে চাকরী নিয়ে গেলাম তখন রোজ বিকেলবেলা শান্তি-নিকেতন যেতাম। সুশীলবাবুর বাড়িতে গানবাজনা করে অনেক রাত্রে ফিরতাম ঐ মাঠের উপর দিয়ে। এমনও হয়েছে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার টিপ্‌ টিপ্‌ বৃষ্টি পড়ছে তার মধ্যেই ফিরেছি রাতের পর রাত সুরুলের শ্মশানের পাশ দিয়েই। ভয় যে করত না তা নয়, গা ছম্‌ ছম্‌ করত তবে ঠেঙাড়ের দেখা পাইনি কখনও। তবে অনেকেই পেয়েছে বিশেষ করে শ্মশানের কাছে শুনেছি। যত রাত্রেই ফিরতাম দেখতাম আজিজ তার পান বিড়ির দোকানে আলোটি জেলে বসে আছে। "সেলাম হুজুর", নামকরা ডাকাত ছিল এই আজিজ।

হ্যাঁ যা বলছিলাম। বিনয়ভবনের পাশের ঐ শালবনের মধ্যেই গান্ধীজী অ্যানড্রুজ মেমোরিয়াল হসপিটালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। বছরটা ঠিক মনে নেই তবে গুরুদেবের মৃত্যুর পর। সেই অনুষ্ঠানের কথা খুব ভাল করে মনে আছে। মাস্টারমশাইর নির্দেশমত সাজান হয়েছিল বসবার এবং অনুষ্ঠানের জায়গা। নীচে বারখানা খাট, তার উপর আটখানা, চারখানা তার উপর এবং সব উপরে দুখানা। রঙীন কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল সব খাটগুলি বসবার জায়গায় কাঠিওয়ারী আসন পেতে দেওয়া হয়েছিল। ওপরে ওঠবার জন্য সিঁড়িমত করে দেওয়া হয়েছিল ছোট ছোট ডেস্ক্‌ পেতে। যতদূর মনে পড়ে অনুষ্ঠানের জায়গায় আলপনা দিয়েছিলেন গৌরীদি। কলাভবন

থেকে থালা ঘট জলের ঝারি ফুল দিয়ে সাজাবার ঘট ইত্যাদি আনা হয়েছে। খুব সম্ভব দুপুর দুটো কি আড়াইটের সময় অনুষ্ঠান। আমরা সাজিয়ে গুজিয়ে তৈরী। দূর থেকে দেখতে পেলাম গান্ধীজী হাতে লম্বা লাঠি হন্ হন্ করে হেঁটে আসছেন সবার আগে আগে আর দলবল সব পেছন পেছন। আশ্রমের ভেতর গান্ধীজী গাড়ি চড়তেন না। ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সময় এসে পেঁাছলেন। অনেক লোক সব জড় হয়েছে বিশেষ করে আশপাশের সাঁওতাল এবং গ্রামের লোক। গান্ধীজী লম্বা লম্বা পা ফেলে টপ্‌কে উঠে গেলেন বসবার জায়গায়। কোথায় পড়ে রইল সব কষ্ট করে তৈরি করা সিঁড়ি। পিয়ার্সন পল্লীর খুব লম্বা চেহারার সাঁওতাল একজনকে ঠিক করে রাখা হয়েছিল মাস্টারমশাইর নির্দেশমত। সে-ই মালা চন্দন দিয়েছিল। গান্ধীজীর পাশে রথীদা বসা। সব শেষে যখন ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হবে, ক্ষিতিমোহনবাবুর মন্ত্রপাঠ শেষ, তখন এক কান্ড। জলের ঝারির থেকে জল দিতে গিয়ে দেখেন জল নেই অতে। তলায় ফুটো থাকায় সব পড়ে গেছে। তখন তাড়াতাড়ি ফুল দিয়ে সাজান ঘট থেকে জল দেবেন বলে সেটা এগিয়ে দেওয়া হল, ওমা— সেটাও ফাঁকা। দুটোই ফুটো। তখন তাড়াতাড়ি ছুটে কাছের বাঁধ থেকে আনা হল জল। গান্ধীজী হেসে সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছিলেন সত্যি শেষ পর্যন্ত হাসপাতাল হবে কিনা। হলও ঠিক তাই। পরিকল্পনামত সে কাজ আজও হয়নি।

॥ ১১ ॥

আমি তখন কিছুদিন হল ১৯৩৯ সনের ১লা এপ্রিলে শ্রীনিকেতনে এসেছি কাজ নিয়ে। আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে মাঠের মধ্যে গাছের বাড়িতে। দুটো বড় বড় অশ্বত্থ গাছ মাঠের মাঝখানে আজও আছে। সেই বাড়ি ঐ দুটো গাছের সঙ্গে লাগিয়ে তোলা হয়েছিল ঠিক গাছের একেবারে নীচে। এখান-কার লোকেরা বলে পাকুড়তলার বাড়ি। বাড়িটা দোতলা। শুনেছি প্রথমে এই গাছের ডালের উপরে কিনতারা কাসাহারা নামে এক জাপানী ভদ্রলোক একটি খুব সুন্দর ছোট ঘর তৈরী করেছিলেন সম্পূর্ণ কাঠের। ঘরের

ভেতরটা খুব সুন্দর করে ফিনিশ করা হয়েছিল মাদুর ইত্যাদি দিয়ে। এই ঘরের নাম ছিল 'কবির নীড়'। কবির নীড়ের আগেকার কোন শিল্পীর আঁকা ছবি দেখেছি বোধহয় কাল্পনিক। আসল বাড়ির সঙ্গে কোন মিল ছিল বলে মনে হয় না। এই কাসাহারা সাহেব খুব ভাল কাঠের কাজ জানতেন। আমার দেখার সুযোগ হয়নি এই কবির নীড়।

৺কাসাহারা সাহেবকেও আমি দেখিনি। তাঁর স্ত্রীকে দেখেছি ছিপ দিয়ে মাছ ধরতেন সুকসায়র থেকে। ৺জগদানন্দ রায় মশাইর ভাইপো শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র ৺ধীরানন্দ রায় কাসাহারা সাহেবের মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। ৺ধীরাবাবু শ্রীনিকেতনের কর্মী ছিলেন এবং অনেক পরে এখানকার অধ্যক্ষও হয়েছিলেন। শুধু কাঠের কাজে নয় শুনেছি কাসাহারা সাহেবের বিখ্যাত ফল ও তরকারীর বাগানের কথা অনেকের কাছেই। তাঁর হাতের লাগান অনেক ফলের গাছ এখনও ফল দেয়। রাত থাকতে উঠে প্রচন্ড খাটতেন বাগানের পেছনে। তখন সব বাড়িতে খাটা পায়খানা ছিল। সেই সব বাড়িতে ময়লা নিজের হাতে জোগাড় করতেন এবং সেই সার সব গাছের গোড়ায় দিতেন। অনেকগুলি টিন ছিল এবং কোন টিনে কবেকার ময়লা সংগ্রহ করা আছে সব তারিখ দিয়ে লেখা থাকত তার গায়ে এত নাম ছিল তাঁর বাগানের যে বহু দূর দূর গ্রাম থেকে লোকেরা এই বাগান দেখতে আসত। শুনেছি গাছের গোড়া থেকে ওপর পর্যন্ত ইয়া বড় বড় পেঁপে, বিরাট আকারের ফুলকপি, বাঁধাকপি ওলকপি প্রভৃতি নানারকম তরকারীতে বাগান ভরে থাকত।

পরে যে বাড়ী তৈরী হয়েছিল ঐ গাছতলায় সেও শুনেছি ৺কাসাহারা সাহেবের হাতেরই। ঐ বাড়ির সামনের মাঠের থেকে খুঁড়ে খুঁড়ে পুরানো আমলের ইঁট যোগাড় করে তৈরী হয়েছিল। তারপর 'কোনো' সাহেব নামে আর একজন জাপানী কাঠের মিস্ত্রী আরও বাড়ান এবং সব শেষে ৺লক্ষ্মীশ্বর সিংহ মশাইও খুব সম্ভব আরও কিছু যোগ করেন। পরে আরও কিছু অদল বদল করা হয়েছিল। কাজেই এই বাড়ি একটু অদ্ভুত ধরনের ছিল। চালটা ছিল খড়ের। দোতলার মেজে ছিল অর্ধেকটা কাঠের এবং বাকীটা সিমেন্টের। এই বাড়িতে কয়েকটা জিনিসের খুব উপদ্রব ছিল। নানারকম বিষাক্ত সাপ ছিল আর ছিল কাঁকড়াবিছে। বাথরুমে গেছি রাত্রে সেখানে সাপ। জানালা খুলতে বা বন্ধ করতে গেছি সাপ জড়িয়ে আছে গরাদের মধ্যে। দুপুরে

শুয়ে বিশ্রাম করছি হঠাৎ চোখে পড়ল চালের ফাঁক দিয়ে সাপ ঢুকছে। কাঁকড়া-বিছে যে কত মারা পড়েছে অথবা ধরা হয়েছে তার ঠিকঠিকানা নেই। আর একটা সব থেকে মারাত্মক জিনিস ছিল, বড় বড় ডেয়োপিঁপড়ের উৎপাত। না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না সে কি অবস্থা। বিশেষ করে রাত্রেই এর আবির্ভাব হতো বেশি এবং নীচের ঘরে। একেক দিন দেখতাম বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে যেন বিছানা পাতা রয়েছে পিঁপড়ের। তার উপর পা পড়লে আর উপায় নেই। আবার প্রায়ই দেখতাম সকালে বিশেষ থাকত না অথবা মাথা কাটা হয়ে মরে পড়ে আছে। এই মাথাকাটা অবস্থা সম্বন্ধে পরে আবিষ্কার করেছিলাম। ওদের নিজেদের মধ্যে লড়াই লেগে এই অবস্থা হতো।

আর একট জিনিসও শ্রীনিকেতনে খুব বেশি ছিল। হনুমান। এর উৎপাত থেকেও রেহাই নেই। সকালবেলায় তাদের প্রথম আবির্ভাব হতো এই বাড়ির চালে অথবা গাছে। বলতে ভুলে গেছি, এই বাড়ির মস্তবড় চাতালওয়ালা বারান্দার অর্ধেকটা ঢাকা ছিল টিন দিয়ে। প্রথমেই সেই টিনের চালের উপর দড়াম দড়াম প্রচণ্ড শব্দ করে করে লাফিয়ে খুব ভোর থেকে উৎপাত আরম্ভ করত। তারপর ক্রমে এখান থেকে সমস্ত শ্রীনিকেতনে ছাড়িয়ে পড়ে সকলের বাগান নষ্ট করে দিত। মাঝে মাঝে ঘরে ঢুকে দেখতাম ভেতরে ঢুকে বসে আছে একটা বা দুটো ওপরতলায়। ঢোকবার মত যথেষ্ট ফাঁক ছিল। আগেই বলেছি অদ্ভুত এই বাড়ি।

হনুমান সম্বন্ধে আরও অভিজ্ঞতা আছে। আমার বাড়িতে একজন মানিক নামে বাচ্চা চাকর ছিল। আমার এক বৌদিও তখন আমার বাড়িতেই ছিলেন। আমি আর আমার ভাইপো দুপুরবেলা খেতে বসেছি নীচের ঘরে। ভাইপো শান্তিনিকেতনে কলেজে পড়ত আমার বাড়িতে থেকে। এখন হয়েছে কি—মানিক বাইরে বারান্দায় বসে আছে। হঠাৎ তার বিকট চীৎকারে আমরা ছুটে বেরিয়ে দেখি ভয়ে মুখ একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। কী ব্যাপার? না—একটা হনুমান নাকি ওর পাশেই গাছের আড়াল থেকে কালো মুখ বের করে ওকে দেখছিল। যাইহোক জলটল খাইয়ে তো ওকে সুস্থ করা হল। আমরা খেয়ে উঠেছি মোটে মানিক ওপরতলার থেকে আমার বালিশ আনবে, নীচের ঘরে বিশ্রাম করব। বালিশ আনতে গিয়ে আবার সেইরকম বিকট চীৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে নীচে নেমে এসেছে। আবার কি হল রে বাবা! সেই হনুমানটা

নাকি ওকে ধরবার জন্য ওপরতলার সিঁড়ির ওপর দুই হাত হাঁটুর উপরে রেখে বসে অপেক্ষা করছিল। পরে বুঝলাম নীচে ঐরকম ওর চেঁচামেচিতে ভড়কে গিয়ে পালিয়ে ওপরে উঠে বসেছিল।

এরও অনেক আগের কথা। ৺তারকবাবু ঐ গাছেই একটা হনুকে গুলি করেছিলেন। তাতে জখম হয়ে অনেকদিন আমার ঘরের মধ্যে ঢুকে বসেছিল। আমি ঘরে ঢুকলেই ভয়ে দাঁত বের করে মুখ বিকৃত করত বিশ্রীভাবে কিন্তু নড়তে পারত না জায়গা থেকে।

এই হনুমানের আর একটা গল্প মনে পড়ল। ঘটনাটা শান্তিনিকেতনের। ওখানেও কম ছিল না। মেয়েদের হস্টেলে ঢুকে প্রায়ই উৎপাত করত। একটি মেয়ে ওপরতলায় ঘুমোচ্ছে দুপুরবেলা। তার সেতারটা রাখা আছে দেয়ালের কোণে দাঁড় করান অবস্থায়। হঠাৎ সেতারের টুং টাং শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেছে। চোখ মেলে দেখে একটি হনুমান ঐ কাণ্ড করছে আর তার লম্বা লেজটি মেয়েটির বুকের উপর এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত পড়ে আছে। এখন কি অবস্থা মেয়েটির। না পারছে চিৎকার করতে, না পারছে শুয়েও থাকতে।

এই বাড়ি সম্বন্ধে আরও নানারকম অভিজ্ঞতা আছে। একদিন কাল-বৈশাখীর ঝড় উঠেছে। আমি তখন আমার বাড়ির পেছনেই শিক্ষাসত্রের হস্টেলে ছিলাম। ঝড়ের পরে ঘরে এসে দেখি আমার সবসময় খাটিয়ে রাখা মশারি নেই। কি হল, কোথায় গেল? অনেক খোঁজাখুঁজির পর দেখতে পেলাম চালের তলা দিয়ে বাইরে ঝুলছে। কী করে হল? পরে আন্দাজ করতে পারলাম যে ঝড়ের সময় চালটা উঠে গিয়েছিল আর সেই সময় ঐ ফাঁক দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে ঝুলেছিল।

আর একবারের ঘটনা খুবই সাংঘাতিক। বেড়িয়ে ফিরে এসেছি শান্তিনিকেতন থেকে, রাত ন'টা হবে তখন। আমার রান্নার লোকটির নাম নরেশ। খাবার দিয়েছে। ওপরে বসেই খাচ্ছি। খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে গেছে। বাইরে মুষলধারে অবিরাম বৃষ্টি পড়েই চলেছে। হঠাৎ দুম করে একটা প্রচণ্ড শব্দ। জীবনে এত জোর শব্দ শুনিনি কখনও। ভীষণ চমকে গেছি। সঙ্গে সঙ্গে আলো নিভে গেছে। টর্চ খুঁজে পাই না, পাই না দেশলাই আর অনবরত চিৎকার করে ডাকছি নরেশকে। কোন উত্তর নেই। হয়ত বৃষ্টির জন্যই

শুনতে পাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত টর্চ খুঁজে পেয়ে নীচে নেমেই চোখ ছানাবড়া। বাথরুমের দরজা খোলা। শুধু দুটো পা দেখা যাচ্ছে মাটিতে পড়ে আছে। তখনও মানুষটাকে সম্পূর্ণ দেখতে পাচ্ছি না। তাড়াতাড়ি দৌড়ে কাছে গিয়ে দেখি নরেশ অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। তখনই ঐ প্রচন্ড বৃষ্টির মধ্যে ছুটে বেরিয়ে ডাকাডাকি করে সবাইকে জড়ো করলাম। এলেন শৈলেন ডাক্তারবাবু। নরেশের জ্ঞান ফিরল এবং ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠল। কিন্তু আমার হল এক বিপদ। মেঘ দেখলেই ভয় করে। তারপর থেকে অনেকদিন পর্যন্ত সন্ধ্যের আগেই শান্তিনিকেতনে সুশীলবাবুর বাড়িতে পালিয়ে যেতাম। ওখানেই খাওয়াদাওয়া এবং রাত কাটিয়ে সকালে ফিরতাম। এই ভয় আমার অনেকদিন পর্যন্ত ছিল।

শান্তিনিকেতন শ্রীনিকেতন এবং চারপাশেই যেন বাজ পড়ে বেশি। আমি যে কত তালগাছ আগুন ধরে পুড়ে যেতে দেখেছি বাজ পড়ে, তার কোন হিসেব নেই। যাইহোক সেদিন খুব রক্ষা পেয়ে গিয়েছিলাম আমরা।

১৯৪২ সনের মেদিনীপুরের ঝড়ের কথা মনে আছে। সেই প্রচন্ড ঝড়ের ধাক্কা এখানেও কম লাগেনি। সন্ধ্যার পর থেকেই ক্রমে বাতাসের জোর বাড়তে লাগল। রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর শুয়েছি ওপরতলায়। চালের তলার ফাঁক দিয়ে এত বাতাস ঢুকতে লাগল যে আর ওপরে থাকা গেল না। তখনও জানি না অত বড় ঝড় আসছে। নীচের তলায় 'প্যাসেজের' পাশেই দেয়ালের সঙ্গে লাগান মস্ত বড় বড় চওড়া সিমেন্টের তাকওয়ালা খুব বড় একটা আলমারি ছিল। বাতাসের জন্য ঘুমোতে অসুবিধা হওয়ার কারণে বিছানাপত্র নিয়ে নীচের সেই আলমারির তাকের উপর বিছানা পেতে শুয়ে রইলাম একটা লন্ঠন জেলে রেখে। সমস্ত রাত ধরে সে কি প্রচন্ড ঝড়! ঘুম তো দূরের কথা, সমস্তক্ষণই ভয় যদি গাছ একবার কাত হয়ে উপড়ে পড়ে তাহলে একেবারে চেপটা। কোনরকমে রাত কাটল। সকালবেলা দরজা খুলে বেরিয়েছি। দাপট কমলেও তখনও বেশ ঝড় চলছে। চাতালের উপর দেখি অনেক বাদুড় সব মরে পড়ে আছে। পল্লীর সকলেরই ভয় ছিল আমার বাড়ি সম্বন্ধে। বারান্দা থেকে দেখতে পেলাম সব বাড়ির থেকেই হাত তুলে আমাকে ওখান থেকে চলে আসার জন্য ডাকছেন। দেখি গাছের আড়ালে একটা বক আশ্রয় নিয়ে বসে আছে। আমি তো ঝড়ের মধ্যেই এক দৌড় লাগালাম তারকবাবুর বাড়ির

দিকে। আমাকে দেখে ভয় পেয়ে বকটা যেই উড়ে পালাতে গেছে ঝড়ের ধাক্কায় আছাড় খেয়ে গলাটি ভেঙে মাঠের উপরেই মরে পড়ে রইল।

এইরকম নানা বিপদ, নানা জিনিসের উপদ্রব নিয়ে চৌদ্দ বছর কাটিয়ে গেছি এই বাড়িতে। কখনও কিছু হয় নি। সাপেও কাটেনি, কাঁকড়াবিছে হুলও ফোটায়নি কখনও, শুধু দু'চারটে পিঁপড়ের কামড় ছাড়া। সম্প্রতি এই বাড়ি ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে।

এই বাড়ি যে এতদিন ছিল এবং গাছ দুটো যে এখনও আছে তার কারণ আছে একটা। সেই গল্প বলি। আমি তো ঐ বাড়িতে থাকি আগেই বলেছি। তখনকার শিক্ষাসত্রের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক আমাকে একদিন বললেন, "এই গাছ দুটো কেটে ফেলে এবং বাড়িটা ভেঙ্গে সুন্দর খেলার মাঠ তৈরী হবে।" শোনামাত্র তখনই ছুটলাম মাস্টারমশাইর কাছে এবং বললাম সব। তখনই মাস্টারমশাই সোজা গুরুদেবের কাছে গিয়ে বললেন, "ঐ গাছদুটোর জন্যই শ্রীনিকেতনে যাই। ওদুটো কেটে ফেলা হলে আর ওখানে যাব না।" তারপরই বন্ধ হল গাছ কাটা।

পরে ঐ গাছের তলা সুন্দর করে সিমেন্ট দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অনেকেই এর শীতল ছায়াতে বেদির উপর বসে বিশ্রাম করতেন। সাহিত্যসভা, শিল্পোৎসব, দোলউৎসব প্রভৃতি এই বেদীর উপরই হতো। কতরকমের পাখীর আসা যাওয়া এই গাছে সমস্ত দিন ধরে। কতদূর থেকে দেখা যায়। পাতা ঝরে গেলে এক রকম চেহারা আবার নতুন কচি পাতায় ভরে গেলে আর এক রূপ। এমন চোখ জুড়ান দৃশ্য, কত সুন্দর সুন্দর পাখীর ডাক সমস্ত দিন, এই সব কোথায় হারিয়ে যেত মাস্টার মশাই না থাকলে।

॥ ১২ ॥

এখন আমার শ্রীনিকেতনের চাকরী জীবনের দিনগুলির কথা যতটা মনে পড়ে বলি। আগেই বলেছি ১৯৩৯ সনে এপ্রিল মাসে এখানে আসি। তার আগে কিছুদিন 'পার্ট টাইম' গান শেখাতাম শিক্ষাসত্রের ছেলেদের একথাও আগে বলেছি। একটা কথা মনে পড়ে। শ্রীনিকেতনের চাকরীর সময় আমাকে কোন

নিয়োগ পত্র দেওয়া হয়নি। রথীদার মুখের কথাই আমার নিয়োগপত্র ছিল। তখনকার অনেকের ক্ষেত্রেই এরূপ হতো শুনেছি তবে সেটাও আমার জানা ছিল না তখন। অর্থাৎ চাকরীর সময় যে একটা নিয়োগপত্র দেবার নিয়ম আছে সেটা পরে জানা থাকলেও সে সম্বন্ধে অত আগ্রহ ছিল না তখন এবং শেষ পর্যন্ত সেটা নেবার কথা মনেও হয়নি অথচ এটা যে কোন সময় দরকার হতে পারত। যাইহোক শিক্ষাসত্রে গান ও ছবি আঁকা শেখানোর ভার পেলাম।

জনা পঁচিশেক ছাত্র। সবাই হস্টেলে থাকে। আমি গাছের বাড়ির ওপর তলায় থাকি আর আমার ক্লাস হয় নীচের তলায়। ক্রমে আরও কাজের ভার পড়ল। গার্লস্ স্কুলের গান ও ছবি আঁকার ক্লাস ছাড়াও পল্লীর ছেলেমেয়েদের এবং বাড়ির মহিলাদেরও গানের ক্লাস নিতে হতো। যে বছর থেকে এখানকার কাজের ভার পেলাম সেই বছর থেকেই এখানকার উৎসবাদির গান এখানকার ছেলেমেয়েরাই করত। তার আগে পর্যন্ত শান্তিনিকেতন থেকে শান্তিদার পরিচালনায় আমরাই এখানকার সব উৎসবে গান গাইতাম। রাত্রে এবং ভোরের বৈতালিকের জন্য আগের দিন সন্ধ্যাবেলা এসে তাঁবুতে থাকতাম। আমাদের জন্য আগে থেকেই খাটান থাকত তাঁবু। রাত্রে ও ভোরে বৈতালিক করে এবং সকালের অনুষ্ঠানের গান গেয়ে ফিরে যেতাম। ১৯৩৯ সন থেকে সমস্ত উৎসবের গান এখানকার ছেলেমেয়েরাই চালাত। শান্তিদা, মাসোজী, অশেষবাবু এবং শ্যাম এস্রাজ এবং খোল বাজিয়ে সর্বদা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতেন। ভোরের বৈতালিকের সঙ্গে এস্রাজ বাজাবার জন্য অন্ধকার থাকতে সাইকেলে করে তাঁর বিরাট এস্রাজ নিয়ে চলে আসতেন মাসোজী শান্তিনিকেতন থেকে।

কলাভবন থেকে আলপনার দলবল নিয়ে এখানকার বাৎসরিক উৎসব অথবা হলকর্ষণের আগের দিন সকালে চলে আসতেন মাস্টারমশাই। সমস্ত দিন থেকে আলপনা দিয়ে সন্ধ্যাবেলা ফিরে যেতেন। খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা এখানেই হতো।

শ্রীনিকেতনের উৎসবের মধ্যে প্রধান ছিল বাৎসরিক উৎসব। ৬ই ফেব্রুয়ারী। হলকর্ষণ—আগে সুবিধামত এই অনুষ্ঠানের দিন স্থির করা হতো। এখন ৮ই অগাস্ট বৃক্ষ রোপণের পরের দিন হয়। আগে শিল্পোৎসব ছিল না। বিশ্বকর্মা পুজোর দিন শিল্পসদনে ফলমূল দিয়ে পুরোহিত ডেকে পুজোই

হতো প্রায়। শুধু কোন প্রতিমা থাকত না। নানারকম যন্ত্রপাতি সব সাজিয়ে দেওয়া হতো এবং পুজোর পর প্রসাদ বিতরণ করা হতো। একবার মাস্টারমশাই শিল্পসদনে যে সব জিনিস তৈরী হতো সে সবও সাজিয়ে দিয়েছেন। তার ভেতর অন্যান্য চামড়ার জিনিসের মধ্যে জুতোও ছিল। পুরোহিত চামড়ার জিনিস, বিশেষ করে জুতো পুজো করতে অস্বীকার করলেন। তখন সুশীলবাবুকে বসিয়ে দেওয়া হল পুরোহিতের জায়গায়। সেতার বাজিয়েই পুজো হল সেবার। তারপর থেকে শিল্পোৎসব চালু হয়েছিল। বলাই বাহুল্য ক্ষিতিমোহনবাবু মন্ত্র গান প্রভৃতি ঠিক করে দিয়েছিলেন আর উৎসবের জায়গা সাজাবার পরিকল্পনা মাস্টারমশাইর। গুরুদেব থাকতে এই উৎসব চালু হয় নি।

চারুবাবু আসার পর চালু হয়েছিল নবান্ন উৎসব এবং এরও গান মন্ত্র ইত্যাদি ক্ষিতিবাবুই ঠিক করে দিয়েছিলেন এবং তিনিই পরিচালনা করতেন এই সব উৎসব, যতদিন সক্ষম ছিলেন। বিশ্বকর্মা পুজোর দিনই শিল্পোৎসব হয় সকলেরই জানা। প্রথমে শিল্পীরা যন্ত্র হাতে শোভাযাত্রা করে আসেন। "যিনি সকল কাজের কাজী" গান গাইতে গাইতে আসেন গানের দল শিল্পীদের আগে। সঙ্গে নাচতে নাচতে আসে নাচের মেয়েরা। তারপর অন্যান্য নির্বাচিত গান এবং মন্ত্র দিয়ে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। নানারকম হাতের কাজের প্রদর্শনী হয় আর তাছাড়া খেলাধুলোর ব্যবস্থা থাকে সমস্ত দিন ধরে।

এখানে একটা কথা না বললে সম্পূর্ণ হবে না এই সব উৎসব সম্বন্ধে বলা। হলকর্ষণ এবং শিল্পোৎসবে নাচের কথাই বলছি। আগে আগে নাচ হতো না। এই সব উৎসবে নাচ চালু করার মূলে শান্তিদা। চলতি অনুষ্ঠানের পরিবর্তন করতে আমরা ভয় পাচ্ছিলাম কিন্তু শান্তিদার যুক্তি হল উৎসব হল আনন্দের জিনিস। নাচ বাদ গেলে সম্পূর্ণ হবে না উৎসব। তাই আমার মনে হয় নাচ চালু করে এই সব উৎসবের রূপ সম্পূর্ণ হল।

নবান্ন উৎসব বেশী দিন চলেনি। যতদূর মনে পড়ে বছর দুই হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। এই অনুষ্ঠান নাচ ছাড়া (কারণ তখন অন্যান্য উৎসবে নাচ চালু হয়নি) অন্যান্যগুলির অনুকরণে হলেও একটু অন্যরকম ছিল। অনুষ্ঠানের পর চালের গুঁড়ো, দুধ কলা একসঙ্গে মেখে প্রসাদের মত বিতরণ করা হতো, কলার পাতায় করে। সবাই লাইন করে বসে তাই খেত নিমন্ত্রণ বাড়ির মত।

আগে আগে হলকর্ষণ উৎসব দেখেছি মাঝে মাঝে স্থান পরিবর্তন করে বিভিন্ন জায়গায় হতে, যেমন বৃক্ষরোপণ উৎসব হয়। বহু আগে দেখেছিলাম পিয়ার্সন পল্লীতে হলকর্ষণ উৎসব। যতদূর মনে পড়ে চার জোড়া গোরু সেবার হলের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। গুরুদেব হল ধরেছিলেন।

এই উৎসবও আরম্ভ হয় 'ফিরে চল মাটির টানে' গান দিয়ে। শোভাযাত্রার আগে আগে গানের দল খোল-কর্তাল সহ এই গান গাইতে গাইতে আসে। পেছনে গোরু লাঙল নিয়ে এবং বিভিন্ন চাষের যন্ত্রপাতি হাতে চাষীর দল হলুদ রঙে ছোপান বস্ত্র পরে। দুজন সাঁওতাল মেয়ে আগে আগে ফুল ছড়াতে ছড়াতে যায়। প্রতি বছরই বিভিন্ন গ্রামের নামকরা বড় কোন চাষীকে আমন্ত্রণ জানান হয় হল চালনার জন্য। 'আমরা চাষ করি আনন্দে' গানের সঙ্গে এই হল চালনা এবং পিছন পিছন দুজন বীজ ছড়াতে ছড়াতে যায়। অনুষ্ঠান-সূচীর মাঝে কোন গানের সঙ্গে নাচের ব্যবস্থা থাকে।

এই সব উৎসব অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে শান্তিনিকেতনের সঙ্গে শ্রীনিকেতনের একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। উৎসবের যাবতীয় সাজাবার জিনিসপত্র কলাভবন থেকে আসত এবং সাজাতে সাহায্য করতেন মাস্টারমশাই থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকরা। শিক্ষকদের মধ্যে বিশেষ করে নাম করতে হয় মাসোজী, বিশ্বরূপবাবু, পেরুমল প্রভৃতির। এঁদের সহযোগিতা ছাড়া আমার পক্ষে এই সব উৎসবের কাজ করা অসম্ভব হতো।

আর একটা জিনিস তখন দেখেছি। এই সমস্ত উৎসবেই আশ্রমের সব ছাত্র-ছাত্রী অধ্যাপক কর্মীরা অতি উৎসাহের সঙ্গে মেতে যেতেন। ভোরের বৈতালিকের পরই ছেলেমেয়েরা ফুল তুলছে, মালা গাঁথছে, উৎসব প্রাঙ্গন সাজানোতে সাহায্য করছে। আবার ঠিক সময়মত সেজেগুজে সবাই উপস্থিত যার উপর যে কাজের ভার তার জন্য। গানের দলের মেয়েরা সবাই সাদা শাড়ি পরে খোঁপায় ফুল গুঁজেছে আর ছেলেরা সাদা ধুতি পাঞ্জাবী পরেছে, যে মেয়েদের উপর মাল্য চন্দন দেবার ভার তারা বিশেষ সাজে সেজে উপস্থিত। উপস্থিত, যে শাঁখ বাজাবে, যারা ধূপ জেলে শেষ পর্যন্ত ঠিক রাখবে সবাই। এ তো তাদেরই উৎসব, এই ভাব সকলেরই মধ্যে। প্রায় একমাস আগে থেকে গানের মহড়ার জন্য ছেলেমেয়েদের কত উৎসাহ দেখেছি।

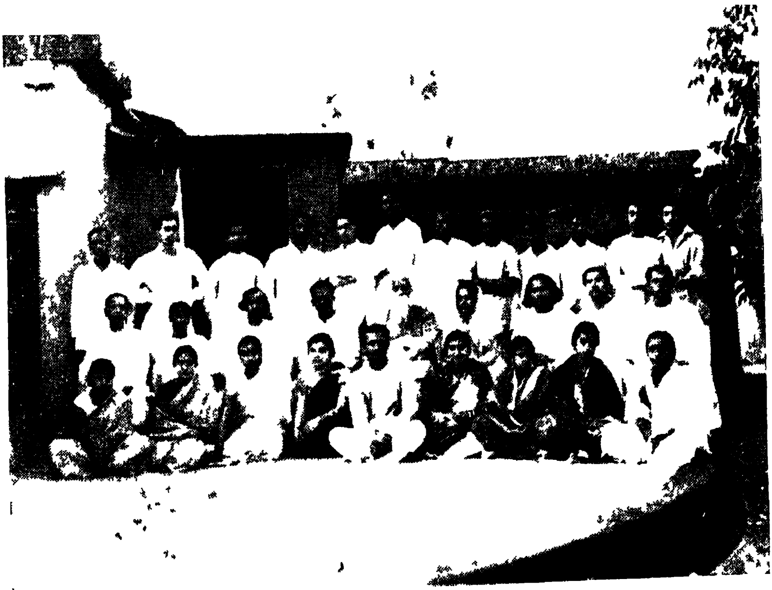
বহু আগের কথা শুনেছি। দোল উৎসবের দিন শান্তিনিকেতন থেকে

বড়দের দল গাড়ি করে এখানে আবির খেলতে আসতেন। পরে মুড়ি জিলিপি খেয়ে আনন্দ করে ফিরে যেতেন। শান্তিনিকেতনের সঙ্গে শ্রীনিকেতনের পরমাত্মীয়তার যোগ ছিল।

আমি এখানে আসার আগে পল্লীর মহিলাদের গানের ক্লাস হতো এবং শান্তিদাই সে ক্লাস নিতেন। অমিতা সেনও (খুকু) শুনেছি ঐ ক্লাস কিছুদিন নিয়েছিলেন।

গান ছাড়া শিক্ষাসত্রে এবং গার্লস্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের যে সব ছবি আঁকা এবং নানারকম হাতের কাজ শেখাতাম সে সব কাজেই মাস্টারমশাই নিজে থেকেই আমাকে সাহায্য করতেন। কি করে শেখাতে হবে, কখন কি কাজ দিতে হবে, এ সবই তাঁর পরামর্শ নিয়ে তবে করতাম। 'ওয়াটার কালার' 'প্যাসটেল', 'লিনো কাট', মাটির কাজ, নানা 'টেকনিকে' মুখোশ তৈরী, সাহিত্য-সভার জায়গা সাজানো, 'স্টেজ' সাজানো প্রভৃতি বিবিধ কাজ তাঁরই নির্দেশমত শেখাতাম। শ্রীনিকেতন মেলার সময় ছেলেরা বাঁশ খড় ইত্যাদি দিয়ে বেশ কয়েকবার তোরণ তৈরী করেছিল। অনেক রাত পর্যন্ত আলো জেলে গান গেয়ে আনন্দের সঙ্গে এসব কাজ হতো। নীচেই 'গেইটের' টুকরো টুকরো কাজগুলি তৈরী করে পরে খাটানো হতো। মাস্টারমশাই পরে এসে এটা ওটা যোগ করে সাজিয়ে দিতে বলতেন, তাতে আরও কত সুন্দর হয়ে উঠত। একবার বললেন, "শিরীষের শুকনো ফল দড়ির সঙ্গে বেঁধে ঝুলিয়ে দাও। হাওয়াতে ঝুনঝুন করে বাজবে।" আর একবার বললেন, "ঝালরের খড়ের ঝোটাগুলোর ডগগুলি চুনে ডুবিয়ে ঝুলিয়ে দাও, দেখবে বহুদূর থেকে ঝক্‌ঝক্ করবে।" এই ধরনের আরও কত!

একবার ছেলেদের 'প্যাস্টেলে' ছবি করাতে বললেন। একই মাপে সকলকে 'পেস্টবোর্ড" কেটে দিয়ে দিলাম আর কি করে প্যাস্টেল লাগাতে হয় তাই দেখিয়ে দিলাম তাঁর কথামত। অনেক ছবি করেছিল ছেলেরা খুব অল্পদিনের মধ্যে। খুব সুন্দর সুন্দর ছবি। দেখালাম নিয়ে গিয়ে মাস্টারমশাইকে। খুব খুশী হয়ে কলাভবন 'মিউজিয়ামে' সাজিয়ে দিতে বললেন সকলের দেখবার জন্য। তার পাশে পাঠভবনের ছেলেমেয়েদের ছবিও সাজিয়ে দিলেন। শিক্ষাসত্রের ছেলেরা সব ছবিগুলিই আড়াআড়িভাবে করেছে আর পাঠভবনের ছেলেমেয়েরা বেশির ভাগ করেছে লম্বালম্বি খাড়া করে। তাই দেখে খুব



সংগীতভবনের শিক্ষক, ছাত্রছাত্রীদের সংগে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ, মাস্টারমশাই (বাঁয়ে)
এবং প্রতিমাদেবী (ডাইনে)। লেখক বাঁদিক থেকে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয়।



মাসোজী এমনি করে করাত বাজাতেন



'তাসের দেশ' নাটকে (বাঁদিক থেকে) সাগরময় ঘোষ, লেখক শান্তিদেব ঘোষ
ও শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

সুন্দর তুলনামূলক আলোচনা করেছিলেন। "দেখ শিক্ষাসত্রের ছেলেরা গ্রামে থাকে তাই এরা সব সময় দিগন্ত দেখে অভ্যস্ত, তাই সব ছবিই আড়াআড়ি 'কমপোজ' করেছে। আর ছবির বিষয়ও ওরা যা দেখতে পায় তাই করেছে। গাছপালা, মাঠ, নদী, খড়েরঘর ইত্যাদি। আর পাঠভবনের সব সহরের ছেলেমেয়ে। খাড়া খাড়া উঁচু বাড়িঘর দেখে অভ্যস্ত তাই লম্বালম্বি দাঁড় করান 'কমপোজিশন'। এদের বিষয়ও উঁচু উঁচু দালান কোঠা ইত্যাদি।

এখন হয়েছে কি দুই তিন বছর পর আবার সেই ছবিগুলির প্রদর্শনী করতে বললেন। আমি নিয়ে গেলাম। "না না এগুলি নয়। সেই যে এত বড় বড় করে করেছিল সব" বলে দুই হাত ছড়িয়ে দেখালেন। আমি বললাম যে এইগুলিই। আসলে বাঁধিয়ে না রাখলে প্যাস্টেলের রং নষ্ট হয়ে যায় ধুলো পড়ে। তাই তখন আর রঙের জলুস ছিল না। বললেন, 'দেখ, যে জিনিস ভাল সেটা মাথায় বড় হয়ে থেকে যায়।"

মাস্টারমশাই প্রায় প্রত্যেক বুধবারেই নিজে থেকেই চলে আসতেন সকাল-বেলা আমার বাড়িতে। "কই হে, দক্ষিণ হস্তের বন্দোবস্ত আছে তো?" বলতে বলতে ওপর তলায় উঠে আসতেন। সমস্ত দিন থেকে বিকেলবেলা চলে যেতেন। দুপুরবেলা শিক্ষাসত্রের ছেলেদের নিয়ে বসে নানারকম কাজ করাতেন। 'পেপার টিয়ারিং মুখোশ তৈরী ইত্যাদি! কোন কোন দিন শুধু গল্প করা। ছেলেদের ছবি আঁকা, নানারকম হাতের কাজ প্রভৃতি শেখান সম্বন্ধে সব সময়ই ভাবতেন। মাঝে কিছুদিনের জন্য একটা ব্যবস্থা করেছিলেন। আমার ঘরের নীচের তলায় একটি 'সিট' রাখা হয়েছিল। কলাভবনের ছাত্ররা মাঝে মাঝে পালা করে এখানে বসে নিজের কাজ করবে। উদ্দেশ্য, একটা ছবি আঁকার আবহাওয়া তৈরী করা। ছেলেরা ঘুরে ফিরে তার কাজ দেখবে। কিছুদিন এই রকমভাবে কলাভবন থেকে নিয়মিতভাবে ছেলেরা এসে এখানে বসে নিজের কাজ করত। প্রায়ই কলাভবনে যে সব প্রদর্শনী হতো তা দেখাবার জন্য নিয়ে যেতাম তাঁরই নির্দেশমত। ছেলেরা মুখোশ, মাটি দিয়ে হাতে গড়া নানারকম জিনিস তৈরী করে নরুন দিয়ে নক্সা করত সে সবের উপরে। তারপর সেই মাটির জিনিস দেশী প্রথায় অর্থাৎ কুমোররা যে ভাবে পোড়ায় সেইভাবে ভাটী তৈরী করে পুড়িয়ে নিত। বিভিন্ন গড়নের কত রকমের সুন্দর সুন্দর কৌটো, পেন্সিল কলম প্রভৃতি রাখবার ছোট ছোট ঢাকনাওয়ালা বাক্স,

ফুলদানি ইত্যাদি তৈরী হয়েছিল। এসব হাতের কাজের এবং ছবির ছোট ছোট প্রদর্শনী সাজাত ছেলেরা নিজেই এবং আশ্রমের সকলকে নিমন্ত্রণ করে আসত দেখবার জন্য। মনে আছে রথীদা থেকে আরম্ভ করে অনেকেই এইসব হাতের কাজের খুব প্রশংসা করেছিলেন। একবার বিকেলবেলা নিজেদের তৈরী মুখোশ পরে নানা সাজে সেজে আশ্রমের ভেতরে সমস্ত রাস্তায় ঘুরে ঘুরে দেখিয়েছিল সকলকে নানারকম অঙ্গভঙ্গী করে করে। খুব মজা লেগেছিল সকলের।

ক্লাসঘরের দেয়ালে সবাই একটা করে ছবি করেছিল দেশী রং দিয়ে। কি করে রং তৈরী করতে হয়, কতটা আঠা মেশাতে হবে, কতটা মোটা করে রং লাগাতে হবে এসবই শেখা হয়ে যেত। তাছাড়া প্রতিবছর যখন কলাভবন থেকে আলপনা দিতে আসত তখন তাদের কাজে সাহায্য করতে হতো এদের। তা থেকেও অনেক কিছু শেখা হয়ে যেত। এসব কাজই মাস্টারমশাইর পরামর্শে এবং তাঁর নির্দেশেই হতো বলাই বাহুল্য। তাই বলছিলাম ছাত্রজীবনে যেমন শিখেছি তাঁর কাছে চাকরীজীবনেও আমার শিক্ষা চলতে লাগল। শুধু শিক্ষকতার শিক্ষা নয়, প্রায়ই ছবি এঁকে নিয়ে দেখাতাম আর তিনি শুধরে দিতেন। যতদিন পর্যন্ত সক্ষম ছিলেন ততদিন পর্যন্ত আমার শিক্ষা চলেছিল তাঁর কাছে। এমন ভাগ্য কজনের হয়!

এসব কাজ ছাড়াও ছেলেরা অভিনয়, সাহিত্যসভা ইত্যাদি করত। ছেলেদের মধ্যে কেউ কেউ নাটক লিখত এবং সমীরণবাবু সেইসব ঠিকঠাক করে দিয়ে সেই নাটকের মহড়া দিয়ে অভিনয় করাতেন। ঐ সব অথবা অন্যান্য নাটকের সাজ যেমন নানারকম গহনা মুকুট প্রভৃতি তৈরী করত ছেলেরাই পেস্টবোর্ড, নানা রঙের 'মার্বল পেপার', জগ্‌জগা প্রভৃতি কেটে কী উৎসাহভরে! নিজেরাই স্টেজ সাজাত। আমরা সঙ্গে থেকে সহায়তা করতাম মাত্র। পরে নিজেরাই সব গুটিয়ে গুছিয়ে রেখে দিত। স্টেজের কাপড় এবং পোষাকপরিচ্ছদ মোটামুটি শিক্ষাসত্রেরই ছিল দরকার হলে বাড়তি যা কিছু কলাভবন থেকে নিয়ে আসা হতো।

গ্রামে ত তখন যাওয়া হতো প্রায়ই। ছেলেরা ও শিক্ষকরা সাধারণভাবে হেঁটেই যেতেন; গোরুরগাড়ি অথবা সাইকেলেও অনেক সময়। মাঝে মাঝে রাত্রিবাসও করা হতো। ক্যাম্প ফায়ার ইত্যাদি ত ছিলই। মুরগীপালন,

গোপালন, মাছের চাষ এবং বাগান করা ইত্যাদিও। মাছের চাষ হতো সুরুকসায়রে শিল্পসদনের পশ্চিমে। ফুটবল, ভলিবল থেকে আরম্ভ করে কতরকম খেলাই খেলত আর তাছাড়া ব্রতীবালকের ড্রিল্ এবং নানারকম শিক্ষা ত ছিলই। তখনকার ছেলেদের সঙ্গে শুধু মাস্টারদেরই নয় শ্রীনিকেতনের সব বিভাগের কর্মীদের সঙ্গেও বিশেষ আত্মীয়তা স্থাপন হবার খুব সহজ সুযোগ ছিল। আমার শুধু বলার কথা এত রকমের কাজ তখন হয়েছে ; কত রকমের পরীক্ষানিরীক্ষা শিক্ষা নিয়ে হয়েছে কিন্তু আজ তার কোন রেকর্ডই নেই মনে করি। এখন কেউ জানে না এসব সম্বন্ধে।

স্বয়ং গুরুদেব যতদিন সক্ষম ছিলেন শিক্ষাসত্র সম্বন্ধে সর্বদা খোঁজখবর রাখতেন, একথা অনেকের কাছেই শুনেছি। একবারের একটা ঘটনার কথাই শুনেছিলাম। অনেক আগেকার কোন ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক গুরুদেবকে গিয়ে বললেন, "একটি ছেলের বড্ড বেশি চুরি করার অভ্যাস। এর পকেট ওর পকেট থেকে পয়সা চুরি করে, আমরা টের পেয়েছি। ভাবছি ছেলেটিকে তাড়িয়ে দেব।" গুরুদেব নাকি বলেছিলেন, "আমার ত মনে হয় তার আগে তোমারই চলে যাওয়া উচিত। কতগুলি ভাল ছেলে নিয়ে তুমি স্কুল করবে? ভাল করে খোঁজ নিয়ে দেখ কেন ও চুরি করে। খুব সহানুভূতি নিয়ে কথা বল ওর সঙ্গে। ওর দোষগুলি যদি না সারাতে পার তবে স্কুল করার সার্থকতা কোথায়?" পরে খোঁজ নিয়ে জানা গেল সেই ছেলেটির খুব লজেন্স খাবার ঝোঁক, তাই পয়সা চুরি ক'রে লজেন্স কিনে খায়। তাই শুনে গুরুদেব ওর পকেট ভরতি করে লজেন্স দিয়ে দিতে বলেছিলেন। এই রকম কয়েক বার করাতে ওর লজেন্স খাবার শখ মিটে গেলে চুরি করাও বন্ধ হয়ে গেল।

আমি যখন প্রথম শ্রীনিকেতনে এলাম তখন প্রত্যেকদিন বিকেলে শান্তিনিকেতনে বেড়াতে যেতাম এবং ফিরতাম রাত ন'টার পর যদি এখানে কোন অনুষ্ঠান কিছু না থাকত। আমার বন্ধুবান্ধব সব শান্তিনিকেতনে, ওখানে আট বছর ছাত্রজীবন কাটিয়েছি ; দিনে একবার অন্তত ওখানে না গেলে বাঁচি না। তাই দেখে শিক্ষাসত্রের কোন ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক মাস্টারমশাইর কাছে নালিশ করেছিলেন। মাস্টারমশাই তাঁকে বলেছিলেন. "শিশির ওর বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেয় আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে এটা ত আপনাদের পক্ষে খুবই ভাল মনে করি। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডার ভিতর দিয়ে মতের

আদান প্রদান হয় তাতে করে জ্ঞান বাড়ে। যেদিন থেকে আমাদের সঙ্গে যোগা-যোগ বন্ধ করবে জানব ওর সর্বনাশ হয়েছে আর তাতে করে আপনাদেরও ক্ষতি। ও আমাদের কাছে যায় আমরাও তাই ওর কাছে আসি তাতে একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এটা ত খুবই ভাল। শান্তিনিকেতনের সঙ্গে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠবে এই যোগাযোগের ভেতর দিয়ে এটাই ত বাঞ্ছনীয়।"

গান শেখান সম্বন্ধে আমার এখানকার অভিজ্ঞতার কথা একটু বলি। যদিও শিক্ষাসত্রেই গান শেখান আমার প্রধান কাজ ছিল কিন্তু এখানকার বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানের গানের দল তৈরী করতে হতো প্রধানতঃ পল্লীর ছেলেমেয়েদের নিয়ে কারণ শিক্ষাসত্রে ছেলেদের মধ্যে গানের গলা খুব কমই ছিল। গানের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে শিক্ষাসত্রের একটি ছেলেরই নাম করতে হয় বিশেষ করে। নৈহাটী থেকে এসেছিল কচি ফুটফুটে ফরসা চেহারার ছোট্ট ছেলে মিতুন (মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়), কানে কম শুনত। যখন গানের ক্লাসে সবাই মোটামুটিভাবে গাইছে তখন বুঝতে পারতাম না কোথা থেকে একটা গোঁ গোঁ শব্দে কেউ গাইছে। পরে বুঝতে পারলাম মিতুন। ক্লাসের পরে আলাদা করে ডেকে বললাম ওকে, "এখন তুমি গান না গেয়ে শুধু চুপ করে বসে শুনবে। পরে আমি যখন বলব তখন গাইবে কেমন ? প্রায় মাসখানেক পর ওকে বললাম গাইতে। কী সুন্দর গলা! সব গানই শেখা হয়ে গেছে খুব ভালভাবে। কোথায় গেল সেই গোঁ গোঁ শব্দ! একেবারে অবাক। মিতুনই ত ওদের মধ্যে সেরা প্রধান গাইয়ে হয়েছিল। কি সুন্দর 'সোলো' গাইত আর কোরাস গানের ত ওই 'লিডার'। পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছি ওর বাবা ভাল গায়ক ছিলেন।

এইসঙ্গে গার্লস্কুলের ছাত্র বল্লভপুরের নিতাই ভট্টাচার্যের কথা না বললে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে আমার শ্রীনিকেতনের গানের ক্লাসের অভিজ্ঞতার কথা। কী সুন্দর গলা একেবারে ছোটবেলা থেকে আর কত তাড়াতাড়ি শিখে ফেলত। অনেক গানই শিখেছিল। এখান থেকে চলে যাবার পর মাথা খারাপ হয়ে যায়। একেবারে উন্মাদ। রাস্তায় ঘুরে বেড়াত আবোলতাবোল কথা বলে আর মাঝে মাঝে কি সুন্দর গান গাইত দুই এক লাইন করে। মাঝে কয়েকবার আমার বাড়ির সামনে দিয়ে যাবার সময় আমাকে দেখে দাঁড়িয়ে তার মিষ্টি গলায় উদাত্ত কন্ঠে পুরো গানই গেয়ে শুনিয়ে গেছে "আমার নয়ন

ভুলানো এলে।" "এই সকালবেলার বাদল আঁধারে" ইত্যাদি। শুনেছি এখন আর বাড়ির থেকে বের হয় না, তাই অনেকদিন তার গলার সেই মিষ্টি গান আর শোনা হয়নি।

শিক্ষাসত্রে যখন এলাম তখন ধীরেনদা (ডঃ ডি. এম. সেন) ছিলেন ভারপ্রাপ্ত। গান, ছবি, হাতের কাজ, অভিনয়, সাহিত্যসভা প্রভৃতি বিভিন্ন কাজে তাঁর উৎসাহ এবং পূর্ণ-সহযোগিতার কথা ভুলব না। তাছাড়া সমস্ত পরিবেশকেই এমন ঘরোয়া করে তোলার মূলে তাঁর অবদান অনেক। তাঁর সঙ্গে যতদিন কাজ করেছি আড়ষ্টভাব কোনদিন ছিল না। কাজে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল, তাই ত এত আনন্দে কাজ করতে পেরেছি। মনে পড়ে বাৎসরিক উৎসবের নানা ধরনের কাজের কথা। এক মাস আগে থেকে গানের মহড়া দেওয়া, রাত জেগে ছেলেদের দিয়ে তোরণ তৈরী করানর কাজ, মেলার আগের সমস্ত দিন ধরে আলপনার দলের সঙ্গে থেকে সাহায্য করা, সন্ধ্যেবেলা থেকে মেলার প্রদর্শনী সাজান, রাত ন'টার সময় ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বৈতালিক করান, খেয়েদেয়ে এসে আবার প্রদর্শনী সাজিয়ে শেষ করা রাত দু'টো আড়াইটে পর্যন্ত এবং তারপরেই একেবারে অন্ধকার থাকতে উঠে আবার বৈতালিক। শেষে পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন হয়ে উৎসব প্রাঙ্গণ সাজিয়ে এস্রাজ বেঁধে গানের দলকে নিয়ে গান গাওয়ান। সব শেষে উৎসবমণ্ড গুটিয়ে তবে তখনকার মত ছুটি। আবার দুপুরবেলা ব্রতীবালকের খেলার আগে ও পরে গান। পরের দিন হয়ত আরও কোন কোন অনুষ্ঠানে গান গাওয়ান। যেমন গ্রাম-সম্মেলন অথবা মহিলা সমিতি ইত্যাদিতে।' এত করেও ক্লান্ত লাগত না। কারণ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারার ঐ মজা। এটা শুধু ধীরেনদার আমলের কথাই বলছি না। আমার চৌত্রিশ বছর চাকরীজীবনে এটাই পেয়েছি। এটা শুধু আমার বেলাতেই নয়। কি শান্তিনিকেতন কি শ্রীনিকেতন সব জায়গার অধ্যাপক কর্মীদের বেলাতেও একই কথা। এত স্বাধীনতা অন্য কোথাও আছে বলে জানি না। আর স্বাধীনতা আছে বলেই এত কাজ করেও কোন নালিশ নেই কারণ নালিশটা কার বিরুদ্ধে? কেউ ত পেছন থেকে তদারকি করে করাচ্ছে না।

এখানকার অর্থাৎ শান্তিনিকেতন শ্রীনিকেতনের সমস্ত বছর ধরে নানা উৎসব অনুষ্ঠানের সময় ছুটি থাকে কিন্তু ঐসব উৎসব অনুষ্ঠানের সময়েই ত বেশি

কাজ। বিভিন্ন ধরনের কাজের ভার থাকে অধ্যাপক কর্মী এবং ছাত্রছাত্রীদের উপর। এসব কাজ যার যার নিয়মিত কাজের বাইরে। যেমন প্রথমেই বলতে হয় পৌষ উৎসবের কথা। মন্দিরের ভার কারো উপর, গানের দল ত কবে থেকে মহড়া দিচ্ছে মন্দির থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন দিনের কত অনুষ্ঠানের জন্যই। মেলারই ত কত রকমের কাজ! নানা রকমের দোকান, সার্কাস প্রভৃতির জন্য জমি বিলি করা মাপ করে করে ক'দিন আগে থেকেই ঘুরে ঘুরে সুরু হয়েছে। বিনোদনের ব্যবস্থার ভার একদলের উপর। কবিগান, যাত্রা, কীর্তন, বাউল, সানাই, তরজা প্রভৃতির ব্যবস্থা করা সে ত এক বিরাট কাজ। প্রদর্শনীর ভার কোন দলের উপর। প্রদর্শনীর অথবা অন্যান্য কাজের ঘর মেলার জন্যই, সে ত কত আগে থেকেই তৈরী হচ্ছে বাঁশ তালপাতা অথবা অন্য কিছু দিয়ে। বিনোদনের মধ্যে আবার ভাগ আছে। একদলের উপর কবিগানের ভার, একদলের যাত্রা, কোন দলের উপর কীর্তন, বাজির ভার, সাঁওতালদের খেলা-ধুলার ভার। এইরকমই কত বলব! ৭ই পৌষ উৎসবের বিরাট কাজ। এইসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেন বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপক, কর্মী, ছাত্রছাত্রীরাই শুধু নন, আশ্রমের পুরোনো অন্যান্য আবাসিকরাও সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা করে এই উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলেন। এত বড় না হলেও শ্রীনিকেতনের বাৎসরিক উৎসব সম্বন্ধেও একই কথা। অন্যান্য উৎসবের এত কাজ না থাকলেও তবু অনেককেই খাটতে হয়। কাজেই বলছিলাম ছুটি থাকলেও এই সবের কাজ আরও অনেক বেশি। কত আন্তরিক ইচ্ছা এবং চেষ্টাতে তবে এত বড় এক একটা উৎসব হতে পারে!

অনেক ছোট হলেও বৃক্ষরোপণ, বসন্তোৎসবের কথাই বলি। একেবারে ছোট ছোট ছেলেমেয়ের থেকে আরম্ভ করে বড়রা পর্যন্ত অত বড় একটা নাচের দোল উৎসবের শোভাযাত্রা শালবীথিকার পাশ দিয়ে আমবাগানের মধ্য দিয়ে, অথবা অন্য কোন জায়গায় বৃক্ষরোপণের নাচের শোভাযাত্রা গানের সঙ্গে সঙ্গে এ কি অন্য কোনখানে সম্ভব? কতদিনের পরিশ্রম উৎসাহভরে এর পিছনে থাকলে তবে সম্ভব হয়। 'খোল দ্বার খোল' গানের সঙ্গে ছোটর থেকে বড়দের অত বড় নাচের দল যখন এসে পৌঁছল তখন আমবাগানের অপূর্ব পরিবেশে বসন্তের নানা গান ও আবৃত্তির অত সুন্দর অনুষ্ঠান কোথায় আর সম্ভব!

এই আমবাগানেই গুরুদেব থাকতে বসন্তোৎসব দেখেছি। এখনকার মত

এত বড় নাচের দল তখন ছিল না যারা শোভাযাত্রা করে আসে। কিন্তু তখনকার উৎসবের ছাপ মনের মধ্যে দাগ কেটে আছে। এখনকার মত এরকম ভিড়ও তখন ছিল না। শুধু আশ্রমের সবাইকে নিয়ে সে উৎসব। মাঝে এক পাশে গুরুদেব আলো করে বসে আছেন আলপনার সামনে। আলপনার মাঝখানে আবীরের থালা রাখা আছে। নাচ গান আবৃত্তি। উৎসব শেষে প্রথমে গুরুদেবের পায়ে আবীর দিয়ে প্রণাম করে আরম্ভ হতো আবীর খেলা। গুরুজনদের পায়ে আর বন্ধুবান্ধব এবং অন্যান্যদের কপালে দেওয়া, এই ছিল তখনকার আবীর খেলার নিয়ম। পরে অবশ্য এই নিয়মের মধ্যেই আর সীমাবদ্ধ থাকেনি তবে আবীর ছাড়া অন্য রং এখানে কোনকালেই ব্যবহার হতো না। এমনকি এমনও দেখেছি কেউ আপত্তি করলে জোর করে তাকে দেওয়া হতো না। এই দোল উৎসবের সবচাইতে আকর্ষণ ছিল উৎসবের শেষে দল বেঁধে ছেলেমেয়েদের নাচ গানের আসর জমান কোন গাছতলার ছায়ায় বসে। গানের পর গান নাচের পর নাচ যেন আর থামতে চায় না। এটির জন্যই অপেক্ষা করে থাকতাম আমরা।

কোথার থেকে কোথায় এসে গেলাম বলতে বলতে। শ্রীনিকেতনের কথায় ফিরে আসি।

সুকুমারবাবু (৺সুকুমার চট্টোপাধ্যায়)—আমি এসে সুকুমারবাবুকে এখানকার অধ্যক্ষ হিসেবে পেয়েছিলাম। দেখেছি একজন কাজ পাগল সৎ মানুষকে, শুনেছি তখনকার সরকারের বড় চাকরী ছেড়ে দিয়ে গ্রামের কাজ করতে এসেছিলেন। কাজের পদ্ধতি হয়ত একটু অন্য ধরনের ছিল যার জন্য অনেকেই পছন্দ করতেন না। কিন্তু তাঁর আন্তরিকতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই ওঠে না, একথা জোরের সঙ্গে বলা যায়। দুপুরবেলা সুরুসায়র থেকে স্নান করে খালি পায়ে খালি গায়ে পৈতে ঝুলিয়ে গীতার শ্লোক আওড়াতে আওড়াতে লম্বা ফর্সা চেহারার মানুষটি যখন আসতেন সেই দৃশ্য এখনও চোখে লেগে আছে।

শিক্ষাসত্রের ছেলেদের কি ভালই না বাসতেন। প্রায়ই গ্রামে যেতেন। সেখান থেকে ফিরে প্রথমেই শিক্ষাসত্রে ঢুকে হাঁকডাক আরম্ভ করে দিতেন, "কই সব কোথায়?" ছেলেরা সব বের হতেই সকলের হাতেই প্রচুর পেয়ারা ভাগ করে দিয়ে দিলেন। গ্রামের থেকে ওদের জন্য নিয়ে এসেছিলেন। প্রায়ই

দেখতাম ওদের হস্টেলে আসতে, খাওয়াদাওয়া প্রভৃতি সব রকম সুবিধে অসুবিধের সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে।

আমি আসার কয়েকদিন পরই মস্তবড় এক গানের তালিকা পাঠিয়ে দিলেন। ছেলেদের শেখাতে হবে। দেখে ত আমার চোখ ছানাবড়া। আমরাই গাইতে পারব না ওসব গান, কঠিন কঠিন সুর ও তালের সব ব্রহ্মসংগীত থেকে বেছে দিয়েছেন। গেলাম, "এসব ত অত্যন্ত কঠিন গান, আমরাই পারব না গাইতে।" শুনে হেসে বললেন, "ও আচ্ছা, আমি গানের কথা দেখে বেছে দিয়েছিলাম। সুর তালের কথা তোমরা বুঝবে।" এরকম সরল মনের লোক খুব কম দেখেছি।

কিন্তু দুঃখের কথা এরকম একজন খাঁটী মানুষকেও চলে যেতে হল এখান থেকে আমাদেরই জন্য। সরকারের উঁচু পদের চাকরী ছেড়ে যে সদিচ্ছা নিয়ে কাজ করতে এসেছিলেন তা পূর্ণ হল না। তাঁর কাজের পদ্ধতি অনেকেরই পছন্দ হতো না যার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে গণসই করে তাঁর চলে যাবার ব্যবস্থা করা হল। এ সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ দেবার দরকার নেই; আমার শুধু দুঃখ বাধ্য হয়ে আমাকেও সই করতে হয়েছিল অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও। আজও মনের সে খোঁচা আমার রয়ে গেছে।

আমি আসার পরই ৺সুকুমারবাবুর আমলে এখানে প্রথম সকালবেলার প্রাত্যহিক বৈতালিক আরম্ভ হয়। মন্ত্র দিয়ে প্রার্থনা সুরু করে গান দিয়ে দিনের কাজ আরম্ভ যেমন শান্তিনিকেতনে হয়ে থাকে। আমার বাড়ির নীচে গাছতলায় এই বৈতালিক হতো। আশ্রমের সব কর্মী অধ্যাপক ছাত্ররা উপস্থিত হতেন নিয়মিত। কোন কর্মী বা অধ্যাপককে দু'দিন অনুপস্থিত দেখলেই সুকুমারবাবুর তাগাদার চোটে উপস্থিত হতে হতো তাঁকে। সুকুমারবাবু সর্বদা নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন ঠিক সময়ে। বৈতালিকের গান করত শিক্ষাসত্রের ছেলেরাই।

তখন প্রায়ই রাত্রে অথবা শেষরাত্রে নানা উপলক্ষে বৈতালিকের দল বের হতো। পল্লীর ছেলেমেয়েরাও নিয়মিত যোগ দিত অতি উৎসাহ ভরে। একবারের একটা ঘটনার কথা বলি। তখন ত শান্তিনিকেতন এবং শ্রীনিকেতনে প্রচুর সাপের উপদ্রব ছিল। সাপ মাত্রেই সবই প্রায় নানা জাতের। গোখরো, কেলে, দুধ-খরিস, মেটে খরিস, তেঁতুলে খরিস প্রভৃতি নানা রকমের গোখরো

যেখানে সেখানে বের হতো। এখন যেখানে খেলার মাঠ, শিল্পসদনের সামনের থেকে একটা উঁচু রাস্তা ঐ মাঠের ওপর দিয়ে সোজা দক্ষিণদিকে চলে গিয়েছিল। তার দুই দিকেই নানারকম ফলের গাছ। বৈতালিক আরম্ভ হতো শিল্পসদনের সামনের থেকে। পশ্চিম দিকের রাস্তা ধরে এগিয়ে বাঁয়ে দক্ষিণদিকের পল্লীর ভেতরকার রাস্তা দিয়ে গিয়ে বাঁদিকে ঘুরে শিল্পসদনের দিকের রাস্তা ধরে ফেরা হতো। হাতে টর্চ থাকত কারো কারো কাছে। একদিন শেষরাত্রে বৈতালিক বেরিয়েছে। পশ্চিমদিকে কিছুটা এগিয়ে যেই আমতলায় এসেছি অমনি সাপ সাপ বলে চেঁচিয়ে উঠেছে কে যেন। টর্চের আলোতে দেখা গেল একটি মস্তবড় গোখরো একেবারে রাস্তার মাঝখানে ফণা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। খগেন নামে একটি শিক্ষাসত্রেরই ছেলে মুহূর্তে লাফিয়ে একটা গাছের ডাল ভেঙে মেরেছিল সেটাকে।

ধীরেনদা এখান থেকে চলে যাবার পর অনেকেই শিক্ষাসত্রের ভারপ্রাপ্ত হয়ে আসেন পর পর। কিছুদিন থেকেই তাঁরা চলে যান। মার্জরি সাইকস্ নামে এক বিদেশী মহিলাও ছিলেন খুব অল্পদিনের জন্য। আরও দুই এক-জনের পর যতদূর মনে পড়ে এলেন ৺সুনীলচন্দ্র সরকার এবং তারপরেই বোধহয় শ্রীযুক্ত সুখেনলাল ব্রহ্মচারী। এঁরা সকলেই যার যার মত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন শিক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষাসত্রের ছেলেদের নিয়ে। সকলেই খুব অল্পদিন থাকায় কারোরই প্ল্যান অনুসারে কাজ বিশেষ এগিয়েছিল বলে মনে করি না।

শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন শ্রীযুত তারকচন্দ্র ধর, শ্রীসমীরণ চট্টোপাধ্যায় এবং আমি। তারকবাবু এবং সমীরণবাবু দুজনেই খুব উৎসাহী শিক্ষক ছিলেন। এঁদের কাছ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা পেয়ে উপকৃত হয়েছি আমার কাজে।

৺মণি রায়—শিল্পসদনে কাজ করতেন। অত্যন্ত সৎ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন এবং এখানকার সকলেরই খুব প্রিয়। ১৯২২ সনে এখানে আসেন। অনেক দিন কাজ করার পর অবসর নিয়ে এখানেই ছিলেন। এখানে আসার আগে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়ে অনেক কাজ করেছেন শুনেছি। কয়েক বছর আগে মারা গেছেন।

৺মণি সেন—শিল্পসদনে তাঁতের ভারপ্রাপ্ত কর্মী ছিলেন। কয়েক বছর হল অবসর গ্রহণ করে এখানেই বসবাস করছিলেন। সম্প্রতি মারা গেছেন।

শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার ভঞ্জ চৌধুরী—এরকম একজন উৎসাহী প্রাণবন্ত মানুষ আমি খুব কম দেখেছি। শিল্পসদনের ভারপ্রাপ্ত কর্মী হয়েছিলেন কিছু দিনের জন্য। চামড়ার কাজ, পোরসিলিনের কাজ, তাঁতের কাজ প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজে একেবারে পাকা। গান, বেহালা, নলতরঙ্গ প্রভৃতি সম্বন্ধে আগেই বলেছি। আগে শ্রীনিকেতনেই থাকতেন পরে শান্তিনিকেতনে বাড়ি তৈরী করে সেখানেই বাস করেন এবং সেখান থেকেই যাতায়াত করে শ্রীনিকেতনে চাকরী করতেন। পাকা অভিনেতা ছিলেন। শান্তিনিকেতনে বহু অভিনয়ে প্রধান ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেছেন। 'তাসের দেশের' রাজার ভূমিকায় অভিনয়ের কথা আগেই বলেছি।

এই সঙ্গে তাঁর বিখ্যাত বাগানের কথা না বললে তাঁর সম্বন্ধে বলা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কত রকমের ফুলের গাছ যে তাঁর বাগানে আছে তা বলে শেষ করা কঠিন। শুধু ফুলের গাছ কেন তাছাড়াও বিভিন্ন রকমেব গাছ আছে। শান্তিনিকেতন শ্রীনিকেতনের মধ্যে এত রকমের গাছ আমি কারো বাড়িতে দেখিনি। এই বাগানকে একটা ছোটখাট 'বটানিকেল গার্ডেন' বলা যায়। ফুল ফল আরও রকমারি গাছগাছড়া ছাড়াও কত রকম তরিতরকারি হয় সমস্ত বছর ধরেই এমনকি নানারকম মশলাপাতি পর্যন্ত। কত বলব ওঁর সম্বন্ধে! গোরু আছে—দুধ হয় প্রচুর, মুরগি ত আছেই বরাবর দেখেছি। শুধু নেই পুকুর, থাকলে মাছের চাষও বাদ যেত না।

শ্রীনিকেতনে যখন ছিলেন তখন বড় বিশেষ জাতের একরকমের ছাগল পুষতেন। এ সম্বন্ধে একটা গল্প ওঁর কাছেই শুনেছিলাম।

কঞ্চির বেড়ার ঘরে থাকে সেই ছাগল। একবার পুজোর সময় ৺বিজয়া দশমীর দিন অনেক রাতে ঘুম ভেঙে গেছে অদ্ভুত রকমের ছাগলের ক্রমাগত ডাকে। ঠিক যেন ছাগলের ডাকের মতও নয় অথচ ম্যা—ম্যা— করে ডেকেই চলেছে। সন্দেহ হওয়ায় উঠেছেন, উঠে দেখেন বেড়ার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলোয় একটি লোক ছাগলের পাশে চার হাত পায়ে ভর দিয়ে উপুড় হয়ে ঐরকম ডেকেই চলেছে। "কে কে?" কোন উত্তর নেই—শুধু ম্যা—ম্যা—। তখন সন্তোষদা চিৎকার করে ডাকছেন "দারোয়ান—দারোয়ান—" তাই শুনে লোকটা বেড়া ভেঙে ম্যা ম্যা করতে করতে ছুটে পালিয়ে গেল দরজা দিয়ে না বেরিয়ে। দারোয়ান এল। সবাই মিলে বেরিয়ে খোঁজাখুজি করে কাউকে

কোথাও পাওয়া গেল না। শুধু মণি সেন মশাইর চাকর অঘোরে ঘুমোচ্ছে বারান্দায় দেখা গেল মশারির ভেতর। কি ব্যাপার কিছুই বোঝা গেল না। পরের দিন খবর পাওয়া গেল মণিবাবুর চাকর নাকি কাকে বলছিল, "কাল অনেক রাত্রে সুরুল থেকে ফিরছি, বাবুর বাড়ির কাছে আসতেই মনে হল আমি যেন ছাগল হয়ে গিয়েছি। তাই বাবুর ছাগলের পাশে দাঁড়িয়ে ডাকতে আরম্ভ করলাম, আর বাবু দরোয়ানকে ডাকতে আরম্ভ করলেন চিৎকার করে। আমি অমনি ছুটে পালালাম।" আসলে সিদ্ধির মাত্রাটা একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল।

একদিন সকাল থেকে অবিরাম বৃষ্টি পড়েই চলেছে। ঘর থেকে বের হওয়া যায় না। সন্তোষদা খুব সম্ভব তখন শিল্পসদনের ভারপ্রাপ্ত। সেই প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে বর্ষাতি গায়ে দিয়ে সাইকেলে করে এসে হাজির ঠিক সময় মত। ঐরকম বৃষ্টির মধ্যে কেউ আসেনি সেদিন। হঠাৎ দেখি সন্তোষদা আমার বাড়িতে। আমি ত অবাক। "কি ব্যাপার সন্তোষদা, এই বৃষ্টির মধ্যে? আজ ত ফেরা হবে না। এখানেই যা হয় একটু ডাল ভাত খাবেন।" বের হলাম ছাতা মাথায় দিয়ে একটা মুরগি পাওয়া যায় কিনা। যারা মুরগি পোষে জানা আছে তাদের কাছে গিয়ে দেখি সবাই সকালবেলা সব ছেড়ে দিয়েছে। একজন অতি কষ্টে একটা ধরে দিল। তাই দিয়ে মুরগির ঝোল আর ভাত হল।

বিকেলবেলা বৃষ্টি প্রায় ধরে এলেও একেবারে থামেনি। সন্তোষদা বললেন, "চলুন আমার ওখানে আজ 'ফাউল ডে' করা যাক।" চললাম দুজনে বর্ষাতি গায়ে সাইকেলে। রাস্তায় যাবার সময় দেখি দুটো সাঁওতাল দুই ঝুড়ি চুনো মাছ মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টির মধ্যে কোথা থেকে যেন ধরে এনেছে। "এই মাঝি মাছ বিক্রি করবি?" জিগেস করলাম।

"বিক্রি ক্যানে করব বাবু?"

"তবে এমনি দিবি?"

"তা-লে।"

বর্ষাতির বড় বড় দুই পকেট ভরতি করে নিয়ে গেলাম। তাই দিয়ে বাটি চচ্চড়ি আর মুরগির মাংস দিয়ে 'ফাউল ডে' করা হল। রাত্রিটা ওখানেই থেকে ভোরবেলায় ফিরলাম। বালিশের পাশে গৌরীদি বেল ফুল রেখে দিয়েছিলেন

আজও মনে পড়ে। সেই মিষ্টি গন্ধেই বোধহয় তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

৺সন্তোষ রায়—শিল্পভবনে কাঠের কাজের বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। খেলাধুলায় বিশেষ করে ফুটবলে খুব নাম ছিল। খুব প্রাণবন্ত লোক। পরে এখানকার কাজ ছেড়ে দিয়ে টাটাতে কাজ নিয়ে জামশেদপুরে চলে গিয়েছিলেন। এখন অবসর গ্রহণ করে এখানেই বসবাস করছিলেন, সম্প্রতি গত হয়েছেন।

৺সন্তোষ মিত্র—আমাদের সকলের সন্তোষদা। শ্রীনিকেতনের কথা লিখতে গিয়ে সন্তোষদার কথা বাদ দেওয়া যায় না। কিন্তু কোন্ সন্তোষদার কথা আগে লিখব? আর্টিস্ট সন্তোষদার, না চাষা সন্তোষদার?

আর্টিস্ট হিসেবে তাঁর কথা যা শুনেছি তাই আগে লিখি। আমি যখন শান্তিনিকেতনে আসি যখন তাঁকে শ্রীনিকেতনের কর্মী হিসেবেই জানতাম। তাঁকে ছবি আঁকতে আমরা দেখিনি। তবে শুনেছি খুব ভাল ছবির হাত ছিল এবং খুব তাড়াতাড়ি স্কেচ্ করতে পারতেন। গাছপালা, ফুল, ফল, সাঁওতালদের জীবনের নানারকম ছবি অনবরত এঁকে যেতেন পাগলের মত। তাঁর সময়কার অনেকেই যাঁরা নাম-করা শিল্পী হয়েছিলেন পরে, তাঁদের অনেকের থেকেই নাকি সন্তোষদার হাত অনেক ভাল ছিল, একথা অনেকের কাছেই শুনেছি। ১৯১০ সনে শান্তিনিকেতনের তখনকার স্কুলে ড্রইং শেখাবার জন্য অবনীবাবু তাঁকে পাঠিয়েছিলেন। পনেরোর বেশী বয়স নয়। তখনকার নিয়ম অনুযায়ী এখানকার স্কুলে পড়াশুনাও করতেন এবং ছেলেদের আবশ্যিক ড্রইং ক্লাসে আঁকাও শেখাতেন। খুব কড়া মাস্টার এবং শেখানোতে কোনরকম ফাঁকি ছিল না। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁকে আমি কখনও আঁকতে দেখিনি এবং তাঁর কোন ছবি দেখার সৌভাগ্যও হয়নি।

আমরা তাঁকে চাষা সন্তোষদা হিসেবেই দেখেছি। এল্‌ম্‌হার্স্ট সাহেব যতবার এখানে এসেছেন পরে, তখন শ্রীনিকেতনের কথা বলতে গিয়ে সন্তোষদাকে চাষা সন্তোষ বলেই উল্লেখ করতেন। আমরা যখন এসেছি তখন তাঁর শ্রীনিকেতনের বিশেষ কোন কাজ দেখার সুযোগ হয়নি। তবে শুনেছি তখনকার অক্লান্ত অসম্ভব পরিশ্রমী একজন খাঁটি কর্মী ছিলেন। কিন্তু

দেখেছি তাঁর নিজের ছোট ডেয়ারির কাজ করতে। বড় রান্নাঘর থেকে বাঁকে করে মাড় বয়ে আনছেন। লম্বা লাঠি হাতে টোকা মাথায় প্রখর রৌদ্রের মধ্যে গোরু চরাচ্ছেন। গোয়াল পরিষ্কার করা, গোরু স্নান করান ছাড়া কোদাল দিয়ে মাটি কুপিয়ে বাগান করা প্রভৃতি সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত সময় কোথায়? যখন গোরু চরাচ্ছেন একটার পর একটা গুরুদেবের গান গেয়ে চলেছেন অথবা রাস্তা দিয়ে সাইকেলে বা হেঁটে যাবার সময় হয় বড় বড় কবিতা আবৃত্তি করছেন, নয়ত গান গাইছেন একটার পর একটা। এরকম নিরহংকার পরিশ্রমী লোক আমি দেখিনি। সদা প্রফুল্ল। দেখা হলেই কুশল প্রশ্ন। খুব ভাল অভিনয় করতে পারতেন। তাঁর সঙ্গে তাসের দেশে এক সঙ্গে অভিনয় করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। সন্তোষদা ছক্কা আর আমি পঞ্জা। ছক্কা, পঞ্জা, তিরি, দুরি এদের একটা নাচ ছিল 'তোলন নামন' গানটির সঙ্গে। খুবই সহজ নাচ। তখন বয়স হয়েছে সন্তোষদার তাই সব মনে থাকত না। রোজ মহড়ার আগে একবার করে আমার সাথে আলাদা করে অভ্যাস করে নিতেন তা না হলে রোজই ভুল হয়ে যেত। আবার আমাকে বলতেন, "আমার কিছু ভুল হলে তুমি কিন্তু বেলীকে বলে দিও না; ও বড্ড বকে আমাকে।" ওঁর ছোট মেয়ে বেলাও অভিনয়ের দলে ছিল তখন। সন্তোষদার সব কথা বলে শেষ করা যাবে না। তাঁর সাথে আশ্রমের ছোটবড় সকলেরই খুবই মধুর সম্পর্ক ছিল। কিছুদিন আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

৺কেদারেশ্বর গুহ—কেদারবাবু শ্রীনিকেতনের ফার্মের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। প্রাণ দিয়ে গাছপালা ভালবাসতেন। এখন সমস্ত আশ্রমে যত ফলের এবং অন্যান্য গাছ আছে সমস্তই প্রায় কেদারবাবুর হাতের লাগানো। এখন যেখানে খেলার মাঠ শিল্পসদনের সামনে, আমরা সেখানে নানারকম ফলের মস্তবড় বাগান দেখেছি তাঁরই করা। পেয়ারা, ডালিম, লেবু প্রভৃতি প্রচুর ফলত। এখনকার পল্লী-শিক্ষাসদনের পশ্চিমদিকে খোয়াইয়ের ধারে মস্তবড় কাজুবাদামের বাগান এখনও আছে। এখন যত্নের অভাবে এসব গাছে বেশি ফল হয় না। কেদারবাবু চুপচাপ লোক ছিলেন। এরকম নীরব নিষ্ঠাবান কর্মী বিরল।

৺গৌরগোপাল ঘোষ—আমি এখানে এসে গৌরদাকে শিল্পসদনের ভারপ্রাপ্ত হিসেবে পেয়েছি। শুনেছি গৌরদা নামকরা ফুটবল প্লেয়ার ছিলেন

মোহনবাগান ক্লাবের। এখানেও খেলতেন শুনেছি, আমার দেখার সুযোগ হয়নি। আমি আসার কিছুদিন পরেই মারা যান 'থ্রমবসিস' হয়ে।

শ্রীহীরালাল মুখোপাধ্যায়—শিল্পসদনে পোরসিলিনের কাজ করতেন। অত্যন্ত ভালমানুষ। ভাল ফুটবল খেলতেন। যে বছর এখানকার নতুন খেলার মাঠের উদ্বোধন হল তখন মোহনবাগানের সঙ্গে খেলা হয়েছিল বিশ্বভারতীর। আমাদের হয়ে যাঁরা খেলেছিলেন তাঁদের মধ্যে হীরালাল একজন। সেবার মোহনবাগান তিন এক গোলে হেরে গিয়েছিল।

আরও অনেকে ছিলেন যাঁদের ছাড়া তখনকার শ্রীনিকেতনের কথা সম্পূর্ণ হয় না।

৺**অমর ঘোষ**—অফিসের কাজে ছিলেন। খুব ভাল অভিনয় করতেন। কিছুকাল আগে মৃত্যু হয়েছে।

৺**পরেশ নাথ বসু**—এখানকার ক্যাশিয়ার ছিলেন। চুপচাপ মানুষ। সম্প্রতি মারা গেছেন।

৺**ভোলানাথ পাল**—গ্রামের কাজ করতেন ৺কালীমোহনবাবুর সঙ্গে। খুব মজার মজার গল্প বলে জমিয়ে রাখতেন। কাজে দেরী করে এলে কালীমোহনবাবু রেগে গেলে সরলপ্রাণ দেবতুল্য মানুষটিকে কি করে খুব সহজ পন্থায় ঠাণ্ডা করতেন মজা করে করে সেই সব গল্প বলে সকলকে খুব হাসাতে পারতেন। ও'র ছেলেমেয়েরা খুব ভাল গুরুদেবের গান গায়। হঠাৎ হার্টের অসুখের আক্রমণে মারা যান।

শ্রীহিমাদ্রি সেন—শিল্পসদনের আর্টিস্ট ছিলেন। অর্নামেণ্টাল ডিজাইনে ভাল হাত ছিল। শিল্পসদনে এখনও বেডকভার পর্দা ইত্যাদি যে সব তৈরী হয় তার প্রায় সবগুলিরই ডিজাইন তাঁরই করা। সম্প্রতি অবসর নিয়ে এখানেই নিজের বাড়িতে বসবাস করছেন।

ডাক্তার ইন্দুজ্যোতি ঘোষ—আমার অল্প কিছুদিন পরেই এখানকার ডাক্তার হয়ে কাজে যোগ দেন। এরকম অক্লান্ত পরিশ্রমী লোক কম দেখা যায়। যেমন রোগীদের জন্য খাটেন তেমনি তাঁর ফুলবাগানের জন্য। ইন্দুবাবুর অতি সুন্দর বাগানের কথা এখানকার সকলেরই জানা। বিশেষ করে চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া আর গোলাপ তাঁর বাগান আলো করে থাকে শীতকালে। অবসর নিয়েও এখনও বিশ্বভারতীর সঙ্গে যুক্ত আছেন।

সমস্ত শ্রীনিকেতনের সবাই ছিল যেন একই পরিবারের লোক। সবাই যেন এক মন এক প্রাণ। একের বিপদে আর সবাই ছুটে আসতেন।

আমার শ্রীনিকেতনে আসার খুব অল্পদিন পরের একটা ঘটনার কথা মনে পড়ল। দুপুর বেলা ওপরতলায় বসে ছবি আঁকছি। নীচের দরজা খোলা। শুনতে পাচ্ছি গট্ গট্ জুতোর শব্দ। কে যেন ঢুকছে! ওপর থেকেই প্রথমে আস্তে জিগেস করলাম, "কে?" কোন উত্তর নেই। আরও কাছে শুনতে পাচ্ছি জুতোর শব্দ। বেশ ধমকের সুরেই বলে উঠলাম "কে?" বসে বসেই শুনতে পাচ্ছি শব্দ ক্রমে মিলিয়ে গেল অর্থাৎ যে ঢুকেছিল সে বেরিয়ে যাচ্ছে। কে দেখবার জন্য তাড়াতাড়ি ছুটে বেরিয়ে দেখি – সর্বনাশ, অ্যানড্রুজ সাহেব চলে যাচ্ছেন। বোধহয় বাড়িটা দেখতে এসেছিলেন। চলেছেন শান্তিনিকেতনের দিকে। অত্যন্ত সরল প্রকৃতির ঋষির মত চেহারার এই মানুষকে দেখেছি। মাস্টারমশাইর আঁকা ওয়াটার কালারের ওয়াশ টেক্‌নিকে আঁকা অতি সুন্দর পোট্রেট আছে। আছে অবনীবাবুরও আঁকা একই টেকনিকে। প্রায়ই এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতে দেখতাম আশ্রমে অথবা সাঁওতাল গ্রামে একা একা।

যাক, যে কথা বলছিলাম। ৺সুকুমারবাবু চলে যাবার পর যখন ৺চারুবাবু (৺চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য) এলেন তখন যেন আরও জমে উঠল। গানে অভিনয়ে খেলাধুলায় পিক্‌নিকে আশ্রম জমজমাট। কথায় কথায় রাত্রে এবং ভোরের বৈতালিক ত লেগেই থাকত। আশ্রমের সবাই মিলে চাঁদের আলোয় কতই না পিক্‌নিক্। অভিনয় ঋতু উৎসবাদিতে খুব উৎসাহ ৺চারুবাবুর। তাঁর বাড়ির সবাই বিশেষ করে তাঁর স্ত্রী আশ্রমের সমস্ত বাড়ির সবাইকে একেবারে নিজের পরিবারের মত করে নিয়েছিলেন। আমার নিজের কথাই বলি। একা থাকতাম। প্রায়ই নানারকম তরকারী রান্না করে পাঠিয়ে দিতেন। আর একটা জিনিস দেখেছি এইসব খাবার কখনও চাকরের হাতে পাঠাতেন না। তাঁর ছেলে ৺অজিতকেই দেখতাম সাধারণতঃ থালায় করে বয়ে আনতে। এ শুধু আমার বাড়িতেই নয়। সব বাড়িতেই কোন-না-কোন দিন কিছু ঢাকা দিয়ে নিয়ে দিয়ে আসতেন চারুবাবুর স্ত্রী নিজেই।

৺চারুবাবু আসার পর দোল উৎসব খুব ভালভাবে আরম্ভ হয়েছিল। প্রথমে কতকগুলি গানের দল পৃথক পৃথকভাবে বের হয়ে নাচতে-নাচতে গাইতে-গাইতে

আশ্রম পরিক্রমা করত। গুরুদেবের গানের দল, বাউলের দল, মহিলাদের দল। পরিক্রমা শেষে সব দল এসে মিলিত হতো পাকুড়তলায়। সেখানে একটার পর একটা গান নাচ। ৺চারুবাবু নিজেও সেখানে উপস্থিত অন্যান্য সকলের সঙ্গে। সব শেষে সকলে একসঙ্গে 'যা ছিল কালোধলো গান নাচের সঙ্গে গেয়ে মুড়ি গরম জিলিপি খেয়ে শেষ করা হতো। খুব জমত। শুধু আমার একটা নালিশ ছিল মনে মনে সকালবেলার শান্তিনিকেতনের নিয়মিত অত সুন্দর অনুষ্ঠান থেকে বঞ্চিত হতাম।

শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের সকলের কথা যতটা পারলাম বললাম। কিন্তু অনেকের কথাই বাদ পড়ে গেল। ছাত্রজীবন যেমন আনন্দে কাটিয়েছি চাকরী জীবনও তাই। চাকরী করছি বলে মনেই হয়নি কখনও। কেউ ওপর থেকে খবরদারি করেনি কাজেই সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি বলেই এত আনন্দে কাজ করতে পেরেছি। ছাত্রদের এবং সহকর্মীদের সকলের সঙ্গেই যে আত্মীয়তা গড়ে উঠেছিল আজও তা মনের থেকে চলে যায়নি এতটুকু, যাবেও না কোনদিন। এ যেমন নিজের দিকটা বললাম তেমনি ছাত্রদের বেলাতেও দেখেছি একই ব্যাপার। শ্রীনিকেতন থেকে আজ বহুবছর চাকরীতে বদলি হয়ে বিনয়ভবনে চলে গিয়েও বহুবছর কাজ করেছি। এখন অবসর জীবন যাপন করছি। এখনও দেখতে পাই শিক্ষাসত্রের সেইসব ছেলেদের মধ্যে অনেকেই এখনও এসে দেখা করে যায়। তাদেরও বয়স হয়েছে কিন্তু তারা ভোলেনি। দেখা হলেই পুরানো দিনের সেইসব কথা কত আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করে করে বলে। তখনকার সমস্ত পরিবেশটাই এমন ঘরোয়া এবং অনুকূল ছিল শিক্ষার মধ্যে তাই ত সম্ভব হয়েছে এমন আত্মীয়তা! সেই শিক্ষাই তো আসল শিক্ষা যকে আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করা যায় চিরজীবন। এ জিনিস কলাভবনেও পেয়েছি নিজেদের ছাত্রজীবনে যা আনন্দের সঙ্গে মনে করে বেঁচে থাকব। এখনও মনে হয় এই ত সেদিন শান্তিনিকেতনে এসেছিলাম এমনই উজ্জ্বল হয়ে মনে গেঁথে রয়েছে সেইসব আমাদের সময়কার স্বর্ণযুগের শান্তিনিকেতনের কথা। আজও মনে পড়ে প্রথম যেদিন কলাভবনের হস্টেলে ভর্তি হয়েছিলাম সেই দিনকার ভোর রাত্রের বৈতালিকের স্বর্গীয় অনুভূতি। একেবারে লাফিয়ে উঠে বসেছিলাম বিছানার উপরে। একি অপূর্ব জিনিস! জীবনে কখনও শুনিনি। শালবীথি দিয়ে গেয়ে চলেছে বৈতালিকের দল;

ক্রমে দূরে মিলিয়ে গেল। তারপর কত বৈতালিক করেছি নিজেরা কিন্তু প্রথম সেই যে শুনেছিলাম সেই সুরের মধুর রেশ আজও একরকম স্বর্গীয় আনন্দ জাগায় মনে আর যেমন জাগায় আমার পাওয়া স্বর্ণযুগের শান্তিনিকেতনের দীর্ঘজীবনের পরমানন্দের পুরনো দিনগুলির স্মৃতিকথায়। স্বর্ণযুগের শান্তিনিকেতনের আবহাওয়া তৈরী হয়েছিল গুরুদেব থেকে আরম্ভ করে ৺ক্ষিতিমোহনবাবু, ৺জগদানন্দবাবু, ৺প্রভাতবাবু, ৺হরিবাবু, ৺প্রমোদবাবু, ৺নেপালবাবু ৺বিধুশেখর শাস্ত্রীমশাই, ৺নন্দবাবু প্রভৃতি দিক্‌পালদের ত্যাগ ও সাধনার ভিতর দিয়ে আর গড়ে উঠেছিল আশ্রমের প্রতিটি মানুষ, কি অন্যান্য সব মাস্টারমশাই ছাত্রছাত্রী এবং প্রাক্তনদের প্রবল ইচ্ছাশক্তি উৎসাহ উদ্দীপনার দ্বারা। সকলেরই এক চিন্তা এক ভাবনা "আমাদের শান্তিনিকেতন"।

আমার পুরানো দিনের কথা বলতে গিয়ে অনেকের কথাই বাদ পড়ে গেল। কিন্তু মনের স্মৃতিপট থেকে কারোকেই সরিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। যাঁদের কথা লেখা হল না তাঁদের সকলকেই শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সঙ্গে স্মরণ করি।

ছোটবেলাকার স্কুলের জেলখানার শিক্ষার আবহাওয়া থেকে আমাদের এই শান্তিনিকেতনে এসে এখানকার মুক্ত আকাশের তলে মুক্তি পেয়ে জীবন ধন্য হল। আরও ধন্য হলাম এখানকার শিক্ষামন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে। যাঁদের সান্নিধ্যে এসে আমার ভাগ্য অনুসন্ধানের পথ খুঁজে পেলাম, মন প্রফুল্ল হল, তাঁদের প্রণাম জানাই।

এলোমেলোভাবে আমার দেখা আমার পাওয়া শান্তিনিকেতনের কিছু কিছু কথা এবং ঘটনার স্মৃতিচারণ করলাম উৎসাহভরে কিন্তু সেই দিনগুলির যে আনন্দানুভূতি সে কি কারোকে বলে বোঝাবার ক্ষমতা আছে আমার? তাই গুরুদেবকে প্রণাম করে তাঁরই গান গেয়ে শেষ করি।

"কী পাইনি তারি হিসাব মিলাতে মন মোর নহে রাজি।
আজ হৃদয়ের ছায়াতে আলোতে বাঁশরি উঠেছে বাজি॥
ভালোবেসেছিনু এই ধরণীরে সেই স্মৃতি মনে আসে ফিরে ফিরে;
কত বসন্তে দখিণ সমীরে ভরেছে আমারই সাজি॥
নয়নের জল গভীর গহনে আছে হৃদয়ের স্তরে,
বেদনার রসে গোপনে গোপনে সাধনা সফল করে।
মাঝে মাঝে বটে ছিঁড়েছিল তার, তাই নিয়ে কেবা করে হাহাকার-
সুর তবু লেগেছিল বারে বার মনে পড়ে তাই আজি॥"

"আমি কেমন করিয়া জানাব, আমার জুড়ালো হৃদয় জুড়ালো
আমার জুড়ালো হৃদয় প্রভাতে।
আমি কেমন করিয়া জানাব আমার পরাণ কী নিধি কুড়ালো—
ডুবিয়া নিবিড় গভীর শোভাতে।
আজ গিয়েছি সবার মাঝারে, সেথায় দেখেছি আলোক-আসনে—
দেখেছি আমার হৃদয় রাজারে।
আমি দুয়েকটি কথা কয়েছি তা সনে, সে নীরব সভা-মাঝারে
দেখেছি চির জনমের রাজারে।
এই বাতাস আমারে হৃদয়ে লয়েছে, আলোক আমার তনুতে
কেমনে মিলে গেছে মোর তনুতে—
তাই এ গগন-ভরা প্রভাত পশিল আমার অনুতে অনুতে।
আজ ত্রিভুবন-জোড়া কাহার বক্ষে দেহমন মোর ফুরালো—
যেন রে নিঃশেষে আজি ফুরালো।
আজ যেখানে যা হেরি সকলেরই মাঝে জুড়ালো জীবন জুড়ালো
আমার আদি ও অন্ত জুড়ালো ॥"